ISSN 1813-0372

বর্ষ : ৯ সংখ্যা : ৩৫
জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১৩

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISSN 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৯ সংখ্যা : ৩৫

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল : **জুলাই-সেপ্টেম্বর** : ২০১৩

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০২-৯৫৭৬৭৬২
e-mail: islamiclaw_bd@yahoo.com
web: www.ilrcbd.org

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭-২২০৪৯৮
e-mail: islamiclaw_bd@yahoo.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২, মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail: islamiclaw_bd@yahoo.com

সংস্থার ব্যাংক একাউন্ট নং
MSA 11051
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি:
পুরানা পল্টন শাখা, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ : আন-নূর

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স
দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Advocate Muhammad Nazrul Islam. General Secretary. Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka, Price Tk. 100 US $ 5

সূচিপত্র

দৃষ্টি আকর্ষণ

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর সম্মানীত সদস্যবৃন্দ, লেখক ও গবেষকবৃন্দ, ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের গ্রাহক, এজেন্ট, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানানো যাচ্ছে যে, সংস্থার ফোন নাম্বার বদল হয়েছে। বর্তমান নাম্বার : ০২-৯৫৭৬৭৬২

সংস্থার ওয়েব সাইট খোলা হয়েছে web: www.ilrcbd.org ভিজিট করুন এবং মতামত দিন।

সম্পাদকীয়

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষ ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য। আর ইসলাম হলো মানবজীবনের সর্বদিক নিয়ন্ত্রণকারী একটি জীবন বিধান। মানবজীবনের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যার দিকনির্দেশনা ইসলামে বিদ্যমান নেই। মানুষ যদি তার সকল কথা, কাজ-কর্ম, আচার-আচরণ এই বিধানের আলোকে সম্পাদন করে, তবে তা সবই হবে ইবাদত। সালাত, সাওম, হজ্জ ইত্যাদি যেমন দৈহিক ইবাদত, তেমনি যাকাত, সাদাকাতুল ফিতর, দান-খয়রাত ইত্যাদি হলো আর্থিক ইবাদত। এ সকল ইবাদত আল্লাহ তা'আলা যেভাবে করতে বলেছেন এবং আল্লাহর রসূল স. যেভাবে তা করার জন্য শিখিয়েছেন সেভাবে করলেই কেবল তা ইবাদত হবে, নিজের ইচ্ছা মত করলে তা কোন ভাবেই ইবাদত হবে না।

কী পরিমাণ সম্পদ থাকলে কত পরিমাণ যাকাত হবে এবং কোথায় ও কাকে দিতে হবে, তা আল্লাহ ও তাঁর রসূল স. বলে দিয়েছেন। সে ভাবেই তা আদায় করতে হবে। যেমন : যাকাত আদায়ের খাত আল-কুরআনে আটটি বলা হয়েছে। এর প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। এর একটিকে আরেকটির মধ্যে ঢুকিয়ে তালগোল পাকানো চলবে না। সেই আটটি খাতের মধ্যে ফকীর, মিসকীন ও ফী সাবীলিল্লাহ এ তিনটিও রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত; এমনকি ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত অনেক ব্যক্তিও 'ফী সাবীলিল্লাহ'র অর্থ বুঝতে ভুল করনে। অনেকে 'ফী সাবীলিল্লাহ' বলতে ফকীর-মিসকীনকেই বুঝে থাকেন। আসলে তারা তিনটি ভিন্ন খাত দুটিতে পরিণত করেন।

অপর দিকে অনেকে 'ফী সাবীলিল্লাহ' বলতে বুঝে থাকনে কেবল বিধর্মীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে অর্থ ব্যয় করা। কিন্তু এই অর্থটি আংশিক সঠিক হলেও সর্বাংশে নয়। কারণ, বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কেবল সশস্ত্র নয়, বরং আরো নানাভাবে হয়ে থাকে এবং বর্তমানেও হচ্ছে। সেসকল ক্ষেত্রে খরচও 'ফী সাবীলিল্লাহ' তে পরিগণিত হবে।

আবার অনেকে আছেন যারা ব্যক্তি ফকীর-মিসকীনকে যাকাতের অর্থ না দিয়ে কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দান করে থাকেন এবং প্রতিষ্ঠানের

পক্ষ থেকে যারা সে অর্থ গ্রহণ করে, বিভিন্ন কৌশলের (হীলা) মাধ্যমে তারা তা অন্য খাতে ব্যয় করেন। কিন্তু তা যে একেবারেই অনৈতিক কাজ এবং এভাবে যে যাকাত আদায় হবে না, আমরা অনেকেই তা বুঝতে চেষ্টা করি না। "ইসলামের যাকাত ব্যবস্থায় 'ফী সাবীলিল্লাহ' খাতের ব্যাপ্তি" শিরোনামের প্রবন্ধে চমৎকারভাবে এসব বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে।

বর্তমান সময়ে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র যখন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সোচ্চার দাবী উত্থাপিত হচ্ছে তখন অনেক পশ্চিমা বুদ্ধিজীবী ও তাদের প্রাচ্যদেশীয় অব-শিষ্যরা ইসলামের বিরুদ্ধে নানা রকম আপত্তি ও অপবাদ উত্থাপনে লিপ্ত রয়েছেন। তাদের একটি বক্তব্য হলো, কোন দেশ ইসলামী রাষ্ট্র হলে সেখানকার অমুসলিম নাগরিকদের ভাগ্যে কী হবে? ইসলামী রাষ্ট্রে কি তারা সমঅধিকার নিয়ে বসবাস করতে পারবে? তারা এমনভাবে প্রচার প্রপাগাণ্ডা করে থাকেন যেন ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের কোন অধিকার ও নিরাপত্তা থাকবে না। অথচ তা সত্যের একেবারেই বিপরীত। কারণ, ইসলাম আল্লাহ্প্রদত্ত জীবন বিধান, যাতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। 'মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বহুজাতিক রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের অধিকার ও নিরাপত্তার স্বরূপ'-শিরোনামের প্রবন্ধে কুরআন-সুন্নাহ ও ইতিহাসের আলোকে বিষয়টি সুন্দর ভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

বর্তমান সময়ে রসূলুল্লাহর স.-এর অবমাননার বিষয়টি যেন ছেলেখেলা হয়ে দাড়িয়েছে। অতীতেও মানুষ নামধারী নরপশুরা আমাদের মহানবীকে অবমাননার চেষ্টা করেছে। আর বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির উন্নতির যুগে অতি আনাড়ি লোকেরাও ঘরে বসে এ দুষ্কর্মটি করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্য হলো, মানুষের অন্তর থেকে রসূলুল্লাহ স.-এর প্রতি-ভালোবাসা মুছে দিয়ে তাদের অন্তরে ঘৃণা বিদ্বেষ সৃষ্টি করা। কিন্তু তারা জানেনা, আল্লাহ তা'আলা যাকে অত্যুচ্চ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী করেছেন, তাকে হেয় ও অপমান করার ক্ষমতা দুনিয়ার কোন মানুষের নেই। অতীতেও যেমন এহেন অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বর্তমান ও ভবিষ্যতেও তেমনি ব্যর্থ হবে। কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই ঘোষণা করেছেন : "ওয়া রাফা'না লাকা যিকরাকা" অর্থাৎ আমি তোমার খ্যাতিকে উঁচু মর্যাদা দান করেছি। "রসূলুল্লাহ স. এর অবমাননা : পরিণাম ও শাস্তি" প্রবন্ধে বিষয়টি চমৎকারভাবে বিধৃত হয়েছে।

বিশ্বে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা বিদ্যমান না থাকায় ইসলামী অর্থনীতি বিলুপ্তির পর্যায়ে উপনীত হয় এবং মুসলিম বিশ্বসহ সারা বিশ্বে সুদী অর্থ ব্যবস্থা ছড়িয়ে পড়ে। গোটা মুসলিম বিশ্ব যখন সুদের অভিশাপে জর্জরিত তখন গত শতকের কয়েক জন ইসলামী চিন্তাবিদের গবেষণা ও দিকনির্দেশনায় ইসলামী অর্থব্যবস্থা আবার ঘুরে দাড়ানোর চেষ্টা করে। মুসলিম বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকের আত্মপ্রকাশ মূলত সেই চেষ্টারই অংশবিশেষ। এ ব্যাংক পদ্ধতি সুদের পরিবর্তে ইসলামী পদ্ধতিতে লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে সকল কাজ পরিচালনা করে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। এখন ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকের বয়স তিরিশ বছরের বেশি নয়। এরই মধ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ সকল সুদী ব্যাংককে টেক্কা দিয়ে এ দেশের সেরা ব্যাংকের মর্যাদা লাভ করেছে।

অতীতে আমরা কোন সুদী ব্যাংককে মানবকল্যাণমূলক কাজে সুদবিহীন কোন রকম বিনিয়োগ করতে দেখিনি। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ -এর মাধ্যমে আমরা দেখতে পেলাম, সুদের অভিশাপ থেকে বাঁচানোর জন্য ব্যাংক দরিদ্র ও অসহায় মানুষের পাশে এসে দাড়াচ্ছে। যেমন ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সারা দেশে অসহায় মানুষকে নানা রকম সেবা দিয়ে যাচ্ছে। তেমনিভাবে দারিদ্র্য বিমোচনেও এ ব্যাংক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ ব্যাংকের ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থাও একটি সেবা মূলক কার্যক্রম।

মাঠ জরিপ ও ডাটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থায় যে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন হচ্ছে তার একটি চিত্র "দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থা : একটি পর্যালোচনা শীর্ষক" প্রবন্ধে উপস্থাপন করা হয়েছে।

"নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যবস্থা" শিরোনামের প্রবন্ধটিতে বিভিন্ন ধর্মে, বিশেষত ইসলামে নারীদের অবস্থা ও অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। ধর্মীয়ভাবে তাদের প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতনের যে কোন সুযোগ নেই তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যারা বলেন, ধর্ম নারী জাতিকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে জুলুম নির্যাতনের শিকারে পরিণত করেছে, প্রবন্ধটি পাঠ করলে পাঠকগণ বুঝতে পারবেন, তাদের অভিযোগের সবই অসার ও অসত্য। তারা

জানতে পারবেন, ধর্মীয়ভাবে তাদের প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতনের কোন রকম সুযোগ নেই। বিশেষত ইসলামে নারীর প্রতি কোন প্রকার হিংস্রতা যে মোটেই প্রশ্রয় দেয়া হয়নি, প্রবন্ধটিতে তা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

শিশুর ওপর নির্ভরশীল মানব সভ্যতার ভবিষ্যত। আর এ বোধ ও বিশ্বাস থেকেই আজ গোটা বিশ্ব শিশু অধিকার নিয়ে সোচ্চার। শিশুকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বে গড়ে ওঠেছে বিভিন্ন নামে অসংখ্য সংগঠন ও সংস্থা। কিন্তু মুশকিল হলো শিশু কারা? শিশুর বয়সসীমা নিয়ে সারা বিশ্ব কি একমত? শিশুর বয়সসীমা নির্ধারণে বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন আইন ও মত রয়েছে। এক দেশে শিশুদের যে বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, অন্য দেশে তারা হয়তো কিশোর অথবা যুবক। যে মেয়েটিকে অন্যরা শিশু বলছে, আমাদের সমাজে সে বয়সের একটি মেয়ে আরেকটি শিশু সন্তানের মা। সুতরাং শিশুর বয়সসীমা নির্ধারণে একটা প্রকট জটিলতা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিদ্যমান রয়েছে। "শিশুর বয়সসীমা নির্ধারণে প্রচলিত আইনী জটিলতা : ইসলামী সমাধান"-শীর্ষক প্রবন্ধটিতে বিভিন্ন দেশের বিদ্যমান আইন পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং তার পাশাপাশি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিও তুলে ধরা হয়েছে।

সবশেষে 'বাংলাদেশে ইসলামী বীমার সমস্যা ও সম্ভাবনা : প্রেক্ষিত বীমা আইন-২০১০'- শীর্ষক প্রবন্ধটিতে ইসলামী জীবন বিধানে বীমার স্বীকৃতি ও তার স্বরূপ কেমন তা ব্যাখ্যার পাশাপাশি বাংলাদেশে ইসলামী বীমার সমস্যা ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রবন্ধকার বাংলাদেশে বিদ্যমান বীমা আইনের ত্রুটি-বিচ্যুতি পর্যালোচনা করে কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করেছেন।

ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের বর্তমান সংখ্যায় মোট সাতটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে। সবগুলো প্রবন্ধ গবেষণাধর্মী, বিশ্লেষণাত্মক ও সময়োপযোগী। লেখকগণ আধুনিক গবেষণারীতি অনুসরণ করে সংক্ষিপ্ত টীকা ও তথ্যসূত্র যথাযথভাবে উপস্থাপন করেছেন। এ সংখ্যার প্রবন্ধগুলো পাঠ করে পাঠক-পাঠিকাগণ উপকৃত হবেন বলে আমরা আশা করি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সহায় হোন।

-ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৯ সংখ্যা : ৩৫
জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১৩

ইসলামের যাকাত ব্যবস্থায় 'ফী সাবীলিল্লাহ' খাতের ব্যাপ্তি

ড. আ.ছ.ম. তরীকুল ইসলাম*

[**সারসংক্ষেপ :** *যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে তৃতীয়। শরীয়াহ নির্ধারিত নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ কারো নিকট এক বছর সময়কাল অতিবাহিত হলে অথবা নির্ধারিত পরিমাণ শস্য ক্ষেতে উৎপাদন হলে তার মালিকের উপর যাকাত প্রদান করা ফরয হয়। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আটটি খাতকে সীমাবদ্ধ করে যাকাত বণ্টন করার নির্দেশ এসেছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, 'ফী সাবীলিল্লাহ' (في سبيل الله) খাত। 'ফী সাবীলিল্লাহ' পরিভাষা দ্বারা কী বুঝায় তা নিয়ে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। নিরপেক্ষ মানদণ্ডে এ পরিভাষা দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে, অনেকের কাছে তা স্পষ্ট না হওয়ায়, নিয়ে আমাদের সমাজে যথেষ্ট বিভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়। যাকাত যেহেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরয ইবাদত যা সঠিক খাতে ব্যয় না করলে অনিবার্য শাস্তির দণ্ডে দণ্ডিত হতে হবে, সেজন্য 'ফী সাবীলিল্লাহ' খাত বলতে কী বুঝায় তা আমাদের নিকট স্পষ্ট হওয়া অপরিহার্য। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে 'ফী সাবীলিল্লাহ' খাত ও এর ব্যাপ্তি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়াই এ প্রবন্ধের লক্ষ্য।*]

'ফী সাবীলিল্লাহ' এর অর্থ

'আস-সাবীল' অর্থ পথ। 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর অর্থ : ঐ পথ যা বিশ্বাস ও বাস্তব কর্মের দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে পৌঁছে দেয়। ইবনুল আছীর র. বলেন, "আসলে আস-সাবীল অর্থ পথ। সাধারণত 'সাবীলিল্লাহ' ঐ ঐকান্তিক আমলকে বুঝায় যা ফরয বা নফল তথা বিভিন্ন প্রকারের অতিরিক্ত আমলের মাধ্যমে মহান আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার পথ দেখায়। সাধারণত 'ফী সাবীলিল্লাহ' দ্বারা জিহাদকে বুঝায়, এমনকি জিহাদ অর্থে এই পরিভাষাটি বেশি বেশি ব্যবহার হওয়ায়, 'ফী সাবীলিল্লাহ' বলতে শুধু জিহাদকেই বুঝানো হয়"।[১] তবে সকল মনীষীর নিকট 'ফী সাবীলিল্লাহ' বলতে শুধু জিহাদকে বুঝানো হয় না।

---

* অধ্যাপক, দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

১. ইবনুল আছীর, *আন-নিহায়াহ ফী গারীবিল হাদীস ওয়াল আছার*, বৈরূত : আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, ১৩৯৯হি. ১৯৭৯ খ্রি., খ. ২, পৃ. ১৫৬।

"السبيل في الأصل: الطريق. و"سبيل الله" عام، يقع على كل عمل خالص سُلِكَ به طريق التقرب إلى الله عز وجل، بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات. وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد، حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه".

আল-কুরআনে 'ফী সাবীলিল্লাহ' পরিভাষার ব্যবহার

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ৪৩টি স্থানে 'ফী সাবীলিল্লাহ' পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা আল-বাকারায় ১৫৪, ১৯০, ১৯৫, ২১৮, ২৪৪, ২৪৬, ২৬১, ২৬২, ২৭৩; আল ইমরানে ১৩, ১৪৬, ১৫৭, ১৬৭, ১৬৯; আন-নিসায় ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৮৪, ৮৯, ৯৪, ৯৫, ১০০; আল-মায়িদায় ৫৪; আল-আনফালে ৬০, ৭২, ৭৪; আত-তাওবায় ১৯, ২০, ৩৪, ৩৮, ৪১, ৬০, ৮১, ১১১, ১২০; আল-হাজ্জের ৫৮; আন-নূরের ২২; মুহাম্মাদের ৪, ৩৮; আল-হুজরাতের ১৫; আল-হাদীদের ১০, আস-সাফফের ১১; আল-মুযযাম্মিলের ২০ নম্বর আয়াত।

তন্মধ্যে সূরা আন-নিসার ৮৯, ১০০, আল-হাজ্জের ৫৮; আন-নূরের ২২ নম্বর আয়াতে হিজরতের কর্মকাণ্ডকে সম্পৃক্ত করে পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এ আয়াতগুলোতে 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর অর্থ হচ্ছে হিজরাত। 'ফী সাবীলিল্লায়' পরিভাষাটি সূরা আল-বাকারার ২৬১, ২৬২; সূরা আত-তাওবার ৩৪, ৬০; মুহাম্মাদের ৩৮ নম্বর আয়াতসমূহে কোন কিছুর সাথে সম্পৃক্ত না করেই ব্যবহার করা হয়েছে। আল-কুরআনে ব্যবহৃত অবশিষ্ট ৩৪টি স্থানে পরিভাষাটি জিহাদ অথবা কিতাল (সশস্ত্র যুদ্ধ) এর সাথে সম্পৃক্ত করেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ আয়াতগুলিতে 'ফী সাবীলিল্লাহ' বলতে জিহাদ ও সশস্ত্র যুদ্ধ ছাড়া অন্য কিছুকে বোঝানোর অবকাশ নেই।

এসব আয়াতে উল্লিখিত 'ফী সাবীলিল্লায়' পরিভাষাটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে-
(১) অনেক আয়াতে 'ফী সাবীলিল্লাহ' হিজরাতের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে উল্লেখ হয়েছে, সেখানে 'ফী সাবীলিল্লাহ' বলতে হিজরাতকে বুঝানো হয়েছে। যেমন-

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا .

"তারা কামনা করে, যদি তোমরা কুফরী করতে যেভাবে তারা কুফরী করেছে। অতঃপর তোমরা সমান হয়ে যেতে। সুতরাং 'ফী সাবীলিল্লাহ' হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের মধ্য থেকে কাউকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। অতএব তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং তাদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর। আর তাদের মধ্য হতে কাউকেও বন্ধু ও সহায় রূপে গ্রহণ করবে না।"[২]

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ .

---

[২] আল-কুরআন, ৪ : ৮৯।

"আর যারা 'ফী সাবীলিল্লায়' হিজরত করে, অতঃপর নিহত হয় কিংবা মারা যায়, তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ উত্তম রিয্ক দান করবেন। আর নিশ্চয়ই আল্লাহই সর্বোৎকৃষ্ট রিয্কদাতা।" [৩]

(২) অনেক আয়াতে 'আল্লাহর পথে' জিহাদ বা সশস্ত্র যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে উল্লেখ হয়েছে, সেখানে 'ফী সাবীলিল্লাহ' বলতে জিহাদ বা সশস্ত্র যুদ্ধকে বুঝানো হয়েছে। যেমন-

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ.

"যারা 'ফী সাবীলিল্লাহ'য় নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পার না।"[৪]

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ.

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে দু'টি দলের মধ্যে, যারা পরস্পর মুখোমুখি হয়েছিল। একটি দল লড়াই করছিল 'ফী সাবীলিল্লায়' এবং অপর দলটি কাফির। তারা বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাদেরকে ওদের দ্বিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ নিজ সাহায্য দ্বারা যাকে চান শক্তিশালী করেন। নিশ্চয় এতে রয়েছে চক্ষুষ্মানদের জন্য শিক্ষা"। [৫]

(৩) কোন কোন আয়াতে 'ফী সাবীলিল্লাহ' কোন কিছুর সাথে সংশ্লিষ্ট না হয়ে সাধারণভাবে উল্লেখ হয়েছে, সেখানে 'ফী সাবীলিল্লাহ' বলতে কী বুঝানো হয়েছে তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। যেমন-

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

"যারা 'ফী সাবীলিল্লায়' তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি বীজের মত, যা উৎপন্ন করল সাতটি শীষ, প্রতিটি শীষে রয়েছে একশ' দানা। আর আল্লাহ যাকে চান তার জন্য বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।" [৬]

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

---

[৩] আল-কুরআন, ২২ : ৫৮।
[৪] আল-কুরআন, ২ : ১৫৪।
[৫] আল-কুরআন, ৩ : ১৩।
[৬] আল-কুরআন, ২ : ২৬১।

"নিশ্চয়ই যাকাত হচ্ছে, ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য; দাস মুক্ত করার ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, 'ফী সাবীলিল্লাহ' এবং মুসাফিরদের মধ্যে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।"[৭]

এখানে যে আয়াত কয়টিতে কোন কিছুর সাথে সম্পৃক্ত না করে এ পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা ব্যাখ্যার দাবি রাখে। অর্থাৎ এ সকল আয়াতে 'ফী সাবীলিল্লাহ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে তা আরো স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমাদের আলোচিত যাকাতের খাত সম্পর্কে উল্লিখিত সূরা আত-তাওবা এর উপরোল্লিখিত ৬০ নম্বর আয়াতটির 'ফী সাবীলিল্লাহ' পরিভাষাটিও ব্যাখ্যার দাবি রাখা আয়াতসমূহেরই অন্তর্ভুক্ত। সেই কারণে এ আয়াতে উল্লিখিত 'ফী সাবীলিল্লাহ' পরিভাষাটি সম্পর্কে আলিমগণের বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয়েছে।

আল-হাদীসে 'ফী সাবীলিল্লাহ' পরিভাষা

বেশ কিছু বিশুদ্ধ হাদীসে পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, আনাস ইবনে মালিক রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : "অবশ্যই 'ফী সাবীলিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল ও একটি রাত হাঁটা দুনিয়া এবং তন্মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা থেকে উত্তম।"[৮]

এখানে 'ফী সাবীলিল্লাহ' বলতে আল্লাহর রাস্তায় সশস্ত্র যুদ্ধকে বুঝানো হয়েছে তা স্পষ্ট। অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে- যায়িদ ইবনে আসলাম তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি উমর রা. কে বলতে শুনেছি : আমার একটি ঘোড়া ফী সাবীলিল্লাহ দান করলাম, যার নিকট ঘোড়াটি ছিল সে এর হক আদায় করতে পারল না, এখন আমি তা ক্রয় করতে চাইলাম এবং আমার ধারণা ছিল যে, সে সেটি কম মূল্যে বিক্রয় করবে। এ প্রসঙ্গে আমি রসূলুল্লাহ স. কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, "তুমি তা ক্রয় করবে না এবং তোমার সাদকা এক দিরহামের বিনিময়ে দিলেও তা ফিরিয়ে নিবে না। কেননা যে ব্যক্তি নিজের সাদকা ফিরিয়ে নেয় সে যেন আপন বমি পুনরায় ভক্ষণ করে।"[৯]

---

[৭] আল-কুরআন, ৯ : ৬০।

[৮] ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-জিহাদ ওয়াস সিয়ার, অনুচ্ছেদ : আলগুদওয়াতু ওয়ার রওহাতু ফী সাবীলিল্লাহ ..., বৈরূত : দারু ইবনু কাছীর, ১৪০৭হি. ১৯৮৭খ্রি., খ. ৩, হাদীস নং-২৬৩৯।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– لَغَدْوَةٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

[৯] ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : হাল ইয়াশতারী সদাকতাহু ..., প্রাগুক্ত, খ. ২, হাদীস নং-১৪১৯।

ঘোড়া যেহেতু সে সময়ে যুদ্ধে ব্যবহৃত হত সে আলোকে এখানে 'ফী সাবীলিল্লাহ' বলতে যুদ্ধকে বুঝানো হয়েছে তা স্পষ্ট। এছাড়াও অনেক হাদীসে 'ফী সাবীলিল্লাহ' পরিষ্কারভাবে জিহাদ ও কিতাল (সশস্ত্র যুদ্ধ) এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় সে সব হাদীসে 'ফী সাবীলিল্লাহ' বলতে জিহাদ ও কিতালকেই যে বুঝানো হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যেমন বর্ণিত হয়েছে-

আবু হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন কাজ আল্লাহর পথে জিহাদ করার সমান মর্যাদা সম্পন্ন হতে পারে? তিনি বললেন, কোনো কাজই জিহাদের সমান মর্যাদা সম্পন্ন হতে পারে না। বর্ণনাকারী বলেন, লোকেরা দুই বা তিনবার এ প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করলো। আর তিনি প্রত্যেকবারই বললেন, এর সমান মর্যাদা সম্পন্ন কোন কাজ নেই। তৃতীয়বারে তিনি বললেন, 'ফী সাবীলিল্লাহ' জিহাদকারী এমন এক ব্যক্তির সমতুল্য, যে অবিরাম সিয়াম পালন করে এবং আল্লাহর কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে নিষ্ঠার সাথে নফল সালাত আদায়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে এবং ফী সাবীলিল্লাহতে জিহাদকারী ফিরে না না আসা পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি সিয়াম থেকে বিরত হয় না।"[১০] অর্থাৎ সে জিহাদে থাকা সময়কালে সিয়াম পালনকারী ও রাতে সালাতুত তাহাজ্জুদের সাওয়াব পেতে থাকে। এখানেও 'ফী সাবীলিল্লাহ' বলতে যুদ্ধকেই বোঝানো হয়েছে। রসূলুল্লাহ স. বেশ কিছু হাদীসে সশস্ত্র যুদ্ধকে 'ফী সাবীলিল্লাহ' বলেছেন। বর্ণিত হয়েছে-

---

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَشْتَرِي وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ.

১০. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ইমারাহ, অনুচ্ছেদ : ফাযলুশ শাহাদাতি ফী সাবীলিল্লাহি তাআলা, বৈরূত : দারুল জাইল ও দারুল আফাক আল-জাদীদাহ, তা.বি., খ. ৬, পৃ. ৩৫, হাদীস নং-৪৯৭৭।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ « لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ ». قَالَ فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ « لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ ». وَقَالَ فِى الثَّالِثَةِ « مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللَّهِ لاَ يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلاَ صَلاَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى ».

আবু মূসা রা. সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন : "আল্লাহর বাণী উচ্চকিত করার জন্য যে সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালিত হলো, সেটি 'ফী সাবীলিল্লাহ' বলে গণ্য।"[১১] এ হাদীছগুলোতে 'ফী সাবীলিল্লাহ' বলতে জিহাদ বা সশস্ত্র যুদ্ধকে বুঝানো হয়েছে। অন্য একটি হাদীস 'ফী সাবীলিল্লাহ' বলতে যে যুদ্ধ বুঝায় তা আরো স্পষ্ট করেছে। বর্ণিত হয়েছে-

আতা ইবনে ইয়াসার রা. সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : "যাকাত পাঁচ প্রকারের ধনী ব্যতীত কারো জন্য নেয়া বৈধ নয়। ফী সাবীলিল্লাহ'তে যুদ্ধরত...।"[১২] অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে-

আবূ হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান ও তার প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাস রেখে ফী সাবীলিল্লাহ-এ জিহাদের জন্য ঘোড়া প্রস্তুত রাখে কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির পাল্লায় ঘোড়ার খাদ্য, পানীয়, গোবর ও পেশাব ওজন করা হবে।"[১৩] অর্থাৎ সেগুলোর পরিমাণ অনুযায়ী তার সাওয়াব দেয়া হবে। আরো বর্ণিত হয়েছে- আবূ সা'ঈদ খুদরী রা. সূত্রে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন : "কোনো বান্দা 'ফী সাবীলিল্লাহ' একদিন সাওম আদায় করলে এই দিনের বিনিময়ে আল্লাহ্ তার চেহারাকে আগুন হতে সত্তর বছর দূরে সরিয়ে রাখবেন"।[১৪]

---

[১১] ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-ইলম, অনুচ্ছেদ : মান সাআলা ওয়াহুয়া কায়িমুন আলিমান জালিসান, প্রাগুক্ত, খ. ১, হাদীস নং-১২৩।

عَنْ أَبِي مُوسَى ...قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

[১২] ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : মাই-ইয়াজুযু লাহু আখযুস সদাকাতি ওয়াহুয়া গানিইয়ুন, বৈরূত : দারুল কিতাবিল আবাবিয়্যি, খ. ২, পৃ. ৩৮; হাদীস নং-১৬৩৭।

عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ : لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ...

[১৩] ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-জিহাদ ওয়াস সিয়ার, অনুচ্ছেদ : মান ইহতাবাসা ফারসান, প্রাগুক্ত, খ. ৩ হাদীস নং-২৬৯৮।

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

[১৪] ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আস-সিয়াম, অনুচ্ছেদ : ফাযলুস সিয়ামি ফী সাবীলিল্লাহ লিমান ইউতীকুহু..., প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৫৮, হাদীস নং-২৭৬৭।

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ – رضى الله عنه – قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِى سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا.

আন-নাবাভী র. বলেন, এখানে এমন অবস্থার সিয়ামকে বুঝানো হয়েছে যা দ্বারা সশস্ত্র যুদ্ধের কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্ত হয় না।[১৫] জিহাদ অধ্যায় আরো বর্ণিত হয়েছে-

খুরায়ম ইবনে ফাতিকিল আসাদিয়্যি রা. সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন 'ফী সাবীলিল্লাহ' যে খরচ করে তার ৭০০ গুণ লিখে রাখা হয়"।[১৬] আরো বর্ণিত হয়েছে-আব্দুর রহমান ইবনে জাবর রা. সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "কোন বান্দার দুটি পা 'ফী সাবীলিল্লাহ' তে ধূলিধূসরিত হলে তা আগুন স্পর্শ করবে না।"[১৭] মূলত এসব হাদীছ ব্যতীত আরো অসংখ্য হাদীস রয়েছে যেখানে আল কুরআনের অধিকাংশ স্থানের মতই 'ফী সাবীলিল্লাহ' বলতে জিহাদ তথা সশস্ত্র যুদ্ধকে বুঝানো হয়েছে।

অপর এক হাদীসে হজ্জকে 'ফী সাবীলিল্লাহ' বলা হয়েছে বলেও প্রমাণ পাওয়া যায়। উম্মু মাকাল আল-আসাদী রা. রসূলুল্লাহ স. এর সাথে হজ্জে যেতে পারেন নি। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন, আমার একটি বাহন ছিল যা আমি বাহন হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম, আমার স্বামী আবূ মাকাল তা 'ফী সাবীলিল্লাহ' তে দান করার অছিয়ত করেছিলেন। সেজন্য তা ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। তখন রসূলুল্লাহ স. বললেন- "তুমি তাকে বাহনে করে কেন বের হলে না, কেননা হজ্জও ফী সাবীলিল্লাহ।"[১৮] আলোচ্য বিষয়ের 'ফী সাবীলিল্লাহ' পরিভাষাটি যাকাতের খাত হিসেবে এসেছে। বায়তুল্লাহ পর্যন্ত যাতায়াত ও আনুসঙ্গিক খরচ করার সামর্থ্যবান হলেই তার জন্য হজ্জ ফরয হয়। সুতরাং তার জন্য যাকাত নিয়ে হজ্জ করার প্রশ্নই অপ্রাসঙ্গিক। তবে স্বল্প সংখ্যক হলেও কিছু কিছু হাদীসে 'ফী সাবীলিল্লাহ' বলতে জিহাদ বা সশস্ত্র যুদ্ধ না বুঝানোরও প্রমাণ রয়েছে। বর্ণিত হয়েছে-

---

১৫. ইমাম নাবাভী, *শারহে মুসলিম*, বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবিয়্যি, ১৪০৭ হি. ১৯৮৭ খ্রি., খ. ১৭, পৃ. ৩৩।

১৬. ইমাম নাসায়ী, *আস-সুনানুল কুবরা*, অধ্যায় : আল-জিহাদ, অনুচ্ছেদ : ফাযলুন নাফাকাতি ফী সাবীলিল্লাহ, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১১হি./১৯৯১ খ্রি., খ. ৩, পৃ. ৩৩, হাদীস নং-২৬৫৬।
عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ الأَسَدِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَتْ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ.

১৭. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-জিহাদ ওয়াস সিয়ার, অনুচ্ছেদ : মানিগ বাররাত কদামাহু ফী সাবীলিল্লাহ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং-২৬৫৬।
عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَبْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ.

১৮. ইমাম ইবনু খুযাইমাহ, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : আর-রুখসাতু ফী ইতা-ই মাইয়া হুজ্জা মিন সাহমি সাবীলিল্লাহ ...., বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৩৯০হি./ ১৯৭০খ্রি., খ. ৪, পৃ. ৭২, হাদীস নং-২৩৭৬। فَهَلاَّ خَرَجْتِ عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّ الْحَجَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন : 'ফী সাবীলিল্লাহ' যে ব্যক্তি দু স্ত্রীর জন্য খরচ করে, জান্নাতে ঘোষণা করা হয়, হে আল্লাহর বান্দা! এটি উত্তম।[১৯] এখানে 'ফী সাবীলিল্লাহ' বলতে জিহাদ বা সশস্ত্র যুদ্ধ বুঝানো হয়নি। অন্য হাদীসে 'ফী সাবীলিল্লাহ' বলতে জিহাদের সাথে হজ্জ উমরা এবং একটি হাদীসে শুধু হজ্জকে বুঝানো হয়েছে। যেমন রসূলুল্লাহ স. বললেন- "তুমি তাকে বাহনে করে কেন বের হলে না, কেননা হজ্জও ফী সাবীলিল্লাহ।"[২০] আরো বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন- "নিশ্চয় হজ্জ ও উমরা সাবীলিল্লাহর অন্তর্ভুক্ত।"[২১]

বিদগ্ধ মনীষীদের দৃষ্টিতে 'ফী সাবীলিল্লাহ'

ক. ইবনে জারীর আত-তাবারী র. এর মতে, 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর দীন, তাঁর পথ ও তার শরীয়ত যা তিনি বান্দাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তার সাহায্যার্থে খরচ করা। আর সেটি হচ্ছে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।[২২]

খ. আবূ আব্দুল্লাহ আল-কুরতুবী র. এর মতে, 'ফী সাবীলিল্লাহ' বলতে যোদ্ধা ও যুদ্ধের কাজে নিয়োজিতগণকে যা দেয়া হয় এবং যুদ্ধে যা খরচ করা হয় তাকে বুঝায়।[২৩]

গ. ইবনুল আরাবি র. নিজের কোন মত প্রকাশ না করে ইমাম মালিক র. এর মত উপস্থাপন করেছেন। ইমাম মালিক র. বলেন, 'ফী সাবীলিল্লাহ' বলতে আল-গাজউ (সশস্ত্র যুদ্ধ) কে বুঝানো হয়েছে। এরপর ইবনুল আরাবি যারা এ দ্বারা হজ্জকে বুঝিয়েছেন তাদের যুক্তিকে খণ্ডন করেছেন।[২৪] এ দ্বারা তিনি মূলত 'ফী সাবীলিল্লাহ' বলতে 'যুদ্ধরত মুজাহিদ' হওয়ার পক্ষই অবলম্বন করেছেন।

---

১৯. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : মান জামাআস সদাকাতা ওয়া আমালাল বিররি, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৯১, হাদীস নং-২৪১৮।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ نُودِىَ فِى الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ.

২০. ইমাম ইবনু খুযাইমাহ, প্রাগুক্ত। فَهَلَّا خَرَجْتَ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ الْحَجَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

২১. ইমাম আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক*, বৈরূত : দারুল মারিফা, তা.বি., খ. ১, পৃ. ৪৮২।

إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مِنْ سَبِيلِ الله.

২২. ইমাম আবু জাফার আত-তাবারী, *জামিউল বায়ান ফী তাভীলিল কুরআন*, বৈরূত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২০হি./২০০০খ্রি., খ. ১৪, পৃ. ৩১৯।

وأما قوله:(وفي سبيل الله)، فإنه يعني: وفي النفقة في نصرة دين الله وطريقه وشريعته التي شرعها لعباده، بقتال أعدائه، وذلك هو غزو الكفار.

২৩. ইমাম আল-কুরতুবী, *আল-জামি লি আহকামিল কুরআন*, রিয়াদ : দারু আলামিল কুতুব, ১৪২৩ হি./২০০৩খ্রি., খ. ৮, পৃ. ১৮৫।

وهم الغزاة وموضع الرباط، يعطون ما ينفقون في غزوهم كانوا أغنياء أو فقراء.

২৪. ইবনুল আরাবি, *আহকামুল কুরআন*, তা.বি., খ. ৪, পৃ. ৩৩৭।

ঘ. আবূ বাকর আল-জাসসাস র. কোনো কোনো ধনীদের জন্য যাকাত গ্রহণ বৈধ বিষয়ে বর্ণিত হাদীছ[২৫] প্রসঙ্গে মুজাহিদদের মধ্যে যারা ধনী ও হজ্জের সফরে সম্পদহীন হয়ে পড়া হাজীরা যাকাত গ্রহণ করতে পারবে কিনা সে বিষয়ে ফকীহদের মতামত দলীলসহ উপস্থাপন করেছেন।[২৬] তিনি তার অবস্থান স্পষ্ট না করলেও তিনি যাকাত দানের ক্ষেত্রে 'ফী সাবীলিল্লাহ' বলতে যুদ্ধরত মুজাহিদ ও সফরে সম্পদহীন হয়ে পড়া হাজী উভয়কেই বুঝিয়েছেন বলে তার বক্তব্য দ্বারা প্রতীয়মান হয়।

ঙ. জালাল উদ্দিন আস-সুয়ূতী র., ইবনে আবী হাতিমের একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে 'ফী সাবীলিল্লাহ' বলতে যুদ্ধরত সৈনিককেই বুঝিয়েছেন।[২৭]

চ. মুহাম্মদ ইবন 'আলী আশ-শাওকানী র. এর মতে, এ খাত হচ্ছে, যোদ্ধা ও যুদ্ধের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ। তাদের যুদ্ধের ব্যয়ভারের জন্য তাদেরকে ধনী হলেও যাকাত দেয়া বৈধ। এটি হচ্ছে তার ভাষায়, অধিকাংশ আলিমের মত।[২৮]

ছ. ইবনে হাজার আল আসকালানী র. বলেন, "সাবীলিল্লাহ" সম্পর্কে অধিকাংশের মত হচ্ছে, যোদ্ধা, চাই সে ধনী হোক অথবা দরিদ্র হোক। তবে আবূ হানীফা র. মুখাপেক্ষী যোদ্ধাকে বুঝিয়েছেন। আহমাদ ও ইসহাক র. হজ্জকেও সাবীলিল্লাহ-এর অন্তর্ভুক্ত মনে করেছেন।[২৯]

জ. বদরুদ্দীন আল-আয়নী র., আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ, আবূ হানীফা, মালিক, আশ-শাফিঈ ও আন-নাওয়াভী র. দের মতামত দলীলসহ উপস্থাপন করেছেন। সেখানে মূলত যোদ্ধা ও সম্পদহারা হাজ্জীকে 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর খাত বলে তুলে ধরা হয়েছে।[৩০]

---

[২৫] ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : মাই-ইয়াজুযু লাহু আখযুস সাদাকাহ ওয়াহুয়া গানিয়্যুন, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৯, হাদীস নং-১৬৩৯।

[২৬] আবূ বাকর আল-জাসসাস, *আহকামুল কুরআন*, বৈরূত, ১৪০৫ হি., খ. ৪, পৃ. ৩২৯।

[২৭] জালাল উদ্দিন আস সুয়ূতী, *আদদুররুল মানছূর ফীত তাফসীর বিল মাছূর*, মিশর, ১৪২৪ হি., খ. ৭, পৃ. ৪১৮।

[২৮] মুহাম্মাদ ইবনু আলী আশ-শাওকানী, *ফাতহুল কাদীর*, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি., খ. ২, পৃ. ৩৭৩।

هم الغزاة والمرابطون ، يعطون من الصدقة ما ينفقون في غزوهم ومرابطتهم وإن كانوا أغنياء ، وهذا قول أكثر العلماء

[২৯] ইবনু হাজার আল-আসকলানী, *ফাতহুল বারী*, বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৩৭৯ হি., খ. ৩, পৃ. ৩৩২।

وأما سبيل الله فالأكثر على أنه يختص بالغازي غنيا كان لو فقيرا إلا أن أبا حنيفة قال يختص بالغازي المحتاج وعن أحمد وإسحاق الحج من سبيل الله.

[৩০] বদরুদ্দীন আল-আয়নী, *'উমদাতুল কারী শারহু ছাহীহিল বুখারী*, ১৪২৭ হি. খ. ১৩, পৃ. ৪৮১।

ঝ. আব্দুর রহমান ইবন কুদামাহ আল-মাকদিসি র. বলেন, "এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই যে, এরা হচ্ছে যোদ্ধা। কেননা সাধারণত সাবীলিল্লাহ বলতে যুদ্ধকেই বুঝায়"।[৩১]

ঞ. আহমাদ মুছতাফা আল মারাগী র. লিখেছেন, "আসলে 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর খাত হচ্ছে, যদি অর্থ প্রাপ্তির অন্য কোনো মাধ্যম না থাকে তাহলে দীন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় কোন এক ব্যক্তির জন্য নয় বরং সাধারণ সকল মুসলিমের জন্য কল্যাণকর কর্মকাণ্ড যেমন হজ্জের রাস্তাকে নিরাপদ করা, পানি ও খাদ্যের সহজলভ্যতা, হাজ্জীদের স্বাস্থ্য রক্ষা প্রভৃতি কাজে খরচ করা। কোনো একক ব্যক্তির হজ্জের জন্য এ খাত থেকে খরচ করা বৈধ হবে না। কেননা হজ্জ হচ্ছে হাজ্জীর সামর্থ্যের কারণেই অত্যাবশ্যক হয়।"[৩২] আল-কাসানী আল্লাহকে নিকটবর্তী করবে এমন সকল আনুগত্যকেই 'ফী সাবীলিল্লাহ' বলেছেন।[৩৩]

ট. আশ-শায়খ মুসতাফা আল 'উলুভী র. বলেন, "ঐ পথ যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌঁছে দেয় তাকে সাবীলিল্লাহ বলে। এখানে এর অর্থ হচ্ছে, ঐ কাজ প্রত্যেক কর্মী যার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে"।[৩৪]

আসলে ইসলামের অসংখ্য বিদগ্ধ মনীষী এ পরিভাষাটির ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। প্রবন্ধটিকে সংক্ষিপ্ত করার বাধ্যবাধকতা থাকায় এখানে স্বল্পসংখ্যক মনীষীর মন্তব্য উপস্থাপন করা হলো। এখানে উপস্থাপিত বক্তব্যসমূহকে বিশ্লেষণ করলে 'ফী সাবীলিল্লাহ' সম্পর্কে তাদের যে মতামত পাওয়া গেছে তা নিম্নরূপ :
মূলত এখানে মনীষীদের তিনটি মতামত পাওয়া গেছে। সেগুলো হচ্ছে :

---

৩১. ইবনু কুদামাহ, *আশ-শারহুল কাবীর আলা মাতানিল মুকাননা*, বৈরূত, ১৪০৫ হি. খ. ৭, পৃ. ৩২৬।
ولا خلاف في أنهم الغزاة لان سبيل الله عند الاطلاق هو الغزو.

৩২. আল মারাগী, *তাফসীরুল মারাগী*, মিশর, খ. ১০, পৃ. ১৪৫।
والحق أن المراد بسبيل الله مصالح المسلمين العامة التي بها قوام أمر الدين والدولة دون الأفراد كتأمين طرق الحج وتوفير الماء والغذاء وأسباب الصحة للحجاج وإن لم يوجد مصرف آخر ، وليس منها حج الأفراد لأنه واجب على المستطيع فحسب.

৩৩. আল-কাসানী, *বাদায়িউস সানায়ি ফী তারতীবিশ শারায়ি*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৬হি./১৯৮৬ খ্রি., খ. ২, পৃ. ৪৫।

৩৪. মুহাম্মাদ ইউসুফ জীরী, সরফুয যাকাতি লি-সালিহী সুনদুকিত তাযামুনিল ইসলামী, *মাজাল্লাতু মাজমাঈল ফিকহিল ইসলামী*, জেদ্দা : মুনাযযামাতুল মুতামারিল ইসলামী, খ. ৪, পৃ. ৪১৮।
سبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته سبحانه وتعالى والقصد به هنا كل عمل من شأنه أن يكسب صاحبه رضى الله سبحانه.

(ক) আল্লাহর পথে যোদ্ধাগণ ও তদসংশ্লিষ্ট অনুসঙ্গ :

মুফাসসির, ফকীহ, মুহাদ্দিসগণের বিপুলসংখ্যক (জমহূর) আলিমদের মত এটাই। আল-কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসে শুধু দু'একটি জায়গা ব্যতীত অধিকাংশ জায়গাতেই 'ফী সাবীলিল্লাহ' বলতেই জিহাদ 'ফী সাবীলিল্লাহ'কেই বুঝানো হয়েছে। কোথাও কোথাও 'কিতাল' শব্দের সাথে 'ফী সাবীলিল্লাহ' পরিভাষাটিকে সংযুক্ত করে এর অর্থ যে সশস্ত্র যুদ্ধ তাও স্পষ্ট করা হয়েছে। সুতরাং 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর অর্থ জিহাদ 'ফী সাবীলিল্লাহ', কিতাল 'ফী সাবীলিল্লাহ' ও এর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ। পরবর্তীতে এ মতটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে-

১. দরিদ্র যোদ্ধা। অর্থাৎ শুধু 'ফী সাবীলিল্লাহ' বলতে দরিদ্র যোদ্ধা বুঝায়। আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ র. এর মত এটাই। তাদের দলীল- রসূলুল্লাহ স. মু'আয ইবনে জাবাল রা. কে ইয়ামানে প্রেরণের সময় বলেছিলেন,

"এবং তাদেরকে শিক্ষা দিবে যে, আল্লাহ তাদের সম্পদে তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের থেকে নিয়ে তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হবে"।[৩৫] এখানে যাকাত মূলত দরিদ্রদের জন্য বলেই উল্লেখ হয়েছে। সুতরাং যোদ্ধা দরিদ্র হলেই শুধু তাদের জন্য যাকাত গ্রহণ বৈধ, অন্যথায় নয়। সুতরাং 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর খাত হচ্ছে, শুধু দরিদ্র যোদ্ধাদের জন্য। তাদের অন্য দলীল, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন- "যাকাত ধনীদের জন্য হালাল নয়"।[৩৬]

তাদের এ দলীল দু'টি সমালোচনাযোগ্য। কেননা একটি হাদীছে পাঁচ শ্রেণির ধনীদের জন্যও যাকাত গ্রহণকে বৈধ করা হয়েছে। তন্মধ্যে আল্লাহর রাস্তায় যোদ্ধাদের কথাও উল্লেখ হয়েছে।[৩৭] সুতরাং এখানে উল্লিখিত হাদীসে সাধারণত যাকাত শুধু দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণের কথা থাকলেও বিশেষ পরিস্থিতিতে ধনীদের মধ্যেও যাকাত দেয়া যাবে বলে উক্ত হাদীস অনুমোদন করছে। অন্যদিকে যাকাতের খাতসমূহের মধ্যে দরিদ্ররা যে একটি খাত তারও উল্লেখ হয়েছে। পক্ষান্তরে বাকী ছয়টি খাতে অর্থাৎ ফকীর ও মিসকীনদের খাত বাদে অন্য খাতের প্রাপকদের জন্য দরিদ্র হওয়ার শর্ত না দেয়ায় এ ছয়টি খাতের যাকাত গ্রহীতাগণ ধনী হলেও যাকাত গ্রহণ করতে পারবেন

---

৩৫. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : উজূবুয যাকাত, প্রাগুক্ত, খ. ২, হাদীস নং-১৩৩১।

فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ.

৩৬. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : মাই-ইউতা মিনাস সদাকাতি ওয়া হাদ্দিল গিনা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৭ হাদীস নং-১৬৩৬। لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ

৩৭. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ ; মাই-ইয়াজূযু লাহু আখযুস সদাকাতি ওয়াহুয়া গানিয়্যুন, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৮, হাদীস নং-১৬৩৭।

বলে প্রতীয়মান হয়। যদি যোদ্ধাকে দরিদ্র হওয়া শর্ত করা হয় তাহলে 'ফী সাবীলিল্লাহ' যাকাতের একটি ভিন্ন খাত হিসেবে গণ্য হওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তখন তো এটি দরিদ্রদের খাত হিসেবেই ধর্তব্য হয়। তাহলে 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর কোন স্বতন্ত্র খাত থাকে না। সুতরাং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা যায়, যোদ্ধারা ধনী হলেও যাকাত গ্রহণ করতে পারবেন।

২. সকল যোদ্ধা এমনকি ধনী হলেও 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর খাতে অন্তর্ভুক্ত হবে। ইমাম মালিক, আহমাদ, ইবনে হাম্বল, আশ-শাফিঈ র. সহ অধিকাংশের মত এটাই। তাদের দলীল হচ্ছে, 'আতা' ইবন ইয়াসার রা. সূত্রে বর্ণিত হাদীস, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন-

"পাঁচ শ্রেণির ধনী ব্যতিত অন্য কোনো ধনীদের জন্য যাকাত বৈধ নয়। আল্লাহর পথের যোদ্ধা...।"[৩৮] সুতরাং স্পষ্ট হাদীস দ্বারাই আল্লাহর পথের যোদ্ধাদের ধনী হলেও যাকাত গ্রহণের অনুমোদন রয়েছে। আসলে দ্বিতীয় মতটিকে বেশী গ্রহণযোগ্য বলে আমরা মনে করি।

(খ) যোদ্ধা, হাজ্জী ও উমরাকারীগণ :

এটি হচ্ছে কিছু সংখ্যক আলিমদের মত। তারা দরিদ্রকে যাকাতের অর্থ দিয়ে হজ্জে পাঠানোকেও বৈধ বলেছেন, তাদের দলীল হচ্ছে :

"উম্মু মাকিল রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. যখন বিদায় হজ্জ করেন তখন আমাদের একটা উট ছিল। আবূ মাকিল সেটি 'ফী সাবীলিল্লাহ' দিয়ে দিতে মনস্থ করেছিলেন। আমরা রোগাক্রান্ত হলাম আর তিনি মারা গেলেন। রসূলুল্লাহ স. হজ্জে গেলেন। ফিরে আসলে আমিও তার নিকট গেলাম। তিনি বললেন, হে উম্মু মাকিল, কে তোমাকে আমার সাথে বের হতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল? আমি বললাম, আমি প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। আবূ মাকিল মৃত্যুবরণ করলেন। আমরা যে উট দিয়ে হজ্জ করতে চেয়েছিলাম তা তিনি ফী সাবীলিল্লাহতে দেয়ার ওসিয়ত করেন। রসূলুল্লাহ স. বললেন, তুমি তার উপর সওয়ার হতে পারতে। কেননা- হজ্জ তো ফী সাবীলিল্লাহরই অংশ"।[৩৯] সুতরাং ফী সাবীলিল্লাহর মধ্যে হজ্জও অন্তর্ভুক্ত। অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- রসূলুল্লাহ স. বলেছেন- "নিশ্চয়ই হাজ্জ ও 'উমরা সাবীলিল্লাহর অন্তর্ভুক্ত।"[৪০]

---

[৩৮] প্রাগুক্ত।

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِىٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ....

[৩৯] ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-মানাসিক, অনুচ্ছেদ : আল-উমরাহ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৫০, হাদীস নং-১৯৯১।

যেহেতু হাজ্জ ও উমরাহ সাবীলিল্লাহর অন্তর্ভুক্ত আর যাকাত ফী সাবীলিল্লাহর খাতে ব্যয় করা বৈধ, সেহেতু হজ্জ ও উমরা পালনের জন্য যাকাত প্রদান বৈধ।

আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, আসলে যাকাত অভাব-অনটন ও প্রয়োজন পূরণের জন্য। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ফকীর, মিসকীন, দাসমুক্তি, ঋণ আদায়ের খাতে যাকাতকে বৈধ করা হয়েছে। অপরদিকে মুসলিম উম্মাহর যারা প্রয়োজন পূরণ করে থাকেন এবং মুসলিম উম্মাহর সেবায় ব্রত রয়েছেন, তাদের খাতেও যাকাত প্রদানের বিধান রয়েছে। যেমন-যাকাত সংশ্লিষ্ট কর্মচারী, কর্মকর্তা, যোদ্ধা প্রভৃতি। আর হজ্জ ও উমরার মাধ্যমে মূলত এই দু'টি উদ্দেশ্যের কোনটিই পূরণ হয় না। তাছাড়াও হজ্জ ফরয হওয়ার শর্ত হচ্ছে, কাবাগৃহ পর্যন্ত যাওয়া-আসার খরচের সামর্থ্যবান হওয়া। সেক্ষেত্রে যাকাতের টাকা নিয়ে হজ্জ সমাপন শরী'য়ত সম্মত নয়। এদ্বারা ফরয হজ্জ আদায় করার কোনো সুযোগ নেই। এছাড়াও উম্মু মাকিলের হাদীসটি মুদাল্লাস হাদীছের শ্রেণিভুক্ত, সেজন্য তা দলীল হতে পারে না।[৪১] সুতরাং হজ্জ ফী সাবীলিল্লাহর মধ্যে গণ্য হবে না।

(গ) সকল উত্তম কাজ :

এটিও কিছুসংখ্যক আলিমের মত। তাদের মতে, যেহেতু 'ফী সাবীলিল্লাহ' পরিভাষাটি আয়াতে কোনো কিছুকে নির্দিষ্ট না করে সাধারণভাবে ব্যবহার হয়েছে, সেহেতু একে কোনো বিশেষ ভালো কাজের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করা ঠিক নয়। সেজন্য মৃত ব্যক্তির কাফন, দুর্গ তৈরি, মসজিদ নির্মাণেও যাকাত দেয়া বৈধ।[৪২] বিশুদ্ধ হাদীসে হজ্জ ও উমরাকে 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে, তাহলে 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর ব্যাপ্তি আরো বিস্তৃত। সহীহ আল-বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ স. খায়বারে নিহত ব্যক্তির রক্তপণ যাকাতের উট থেকে দিয়েছিলেন।[৪৩] সুতরাং 'ফী সাবীলিল্লাহ'

أَمّ مَعقِلٍ قَالَتْ لَمَّا حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَجَّةَ الْوَدَاعِ وكَانَ لَنَا جَمَلٌ فَجَعَلَهُ أَبُو مَعقِلٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَأَصَابَنَا مَرَضٌ وَهَلَكَ أَبُو مَعقِلٍ وَخَرَجَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ جِئْتُهُ فَقَالَ « يَا أُمَّ مَعقِلٍ مَا مَنَعَكِ أَنْ تَخْرُجِى مَعَنَا ». قَالَتْ لَقَدْ تَهَيَّأْنَا فَهَلَكَ أَبُو مَعقِلٍ وكَانَ لَنَا جَمَلٌ هُوَ الَّذِى نَحُجُّ عَلَيْهِ فَأَوْصَى بِهِ أَبُو مَعقِلٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ. قَالَ « فَهَلاَّ خَرَجْتِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْحَجَّ فِى سَبِيلِ اللَّهِ.

৪০. ইমাম আল-হাকিম, প্রাগুক্ত। .إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مِنْ سَبِيلِ الله

৪১. আন-নাবাভী, *আল-মাজমূ শারহিল মুহাযযাব*, খ. ৬, পৃ. ২২৬।

৪২. ইমাম আর-রাযী, *মাফাতীহুল গাইব*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪২১ হি./২০০০ খ্রি., খ. ১৬, পৃ. ৯০।

৪৩. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আদ-দিয়্যাত, অনুচ্ছেদ : আল-কাসামাহ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, হাদীস নং-৬৫০২।

এর খাতেই তিনি এ কাজটি করেছিলেন। তাহলে বুঝা যাচ্ছে, 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর মধ্যে যে কোনো উত্তম কাজই অন্তর্ভুক্ত।

আসলে তৃতীয় এ মতটি অনেকেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। আবুল হাসান মুবারকপুরী এ প্রসঙ্গে বলেন, তৃতীয় এ মতটি অগ্রহণযোগ্য। কেননা আল-কুরআন, বিশুদ্ধ হাদীস এমনকি যঈফ হাদীস, ইজমা ও কোনো সাহাবী এ মতের পক্ষে নেই।[৪৪] রসূলুল্লাহ স.-এর পক্ষ থেকে যাকাতের উট দ্বারা রক্তপণ দেয়ার হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক অন্য একটি হাদীসও সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ স. উক্ত রক্তপণ নিজের পক্ষ থেকে দিয়ে দিয়েছিলেন।[৪৫] উভয় হাদীসের মধ্যে পরস্পর বিরোধী অভিমত নিষ্পত্তির জন্য মুহাদ্দিসগণ বলেন, যাকাত গ্রহিতাদের নিকট থেকে উক্ত উট ক্রয় করে তা দ্বারা তিনি উক্ত নিহত ব্যক্তির রক্তপণ দিয়েছিলেন।[৪৬] সুতরাং 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর খাত ধরে নিয়ে তিনি যাকাতের উট দ্বারা মুক্তিপণ আদায় করেছেন বলে এ পক্ষের দলীল হিসেবে উপস্থাপিত হাদীসটি অকাট্য নয়। ফী সাবীলিল্লাহকে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে ড. ইউসুফ আল-কারদাভীর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ যাকাতের খাতকে আটটিতে সীমাবদ্ধ করেছেন। 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর খাতকে সম্প্রসারণ করলে এটি আর আটটি খাতে সীমাবদ্ধ থাকবে না, যা হবে মূলত আটটিতে নির্দিষ্ট করার বক্তব্য বিরোধী। সুতরাং 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর সাধারণ অর্থ এখানে না হওয়াটাই বেশি গ্রহণীয়।[৪৭]

'ফী সাবীলিল্লাহ' সম্পর্কে আমাদের অভিমত

সুতরাং এখানে 'ফী সাবীলিল্লাহ' সম্পর্কে যে তিনটি অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে প্রথম মতটি অর্থাৎ যোদ্ধা ও তাদের অনুসঙ্গ বিষয়টি যুক্তিতর্ক, দলীল-প্রমাণাদি ও অধিকাংশ আলিমের মতামত অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য বিধায় সেটিই আমাদের মত। সৌদি আরবের বিদগ্ধ আলিমদের সংস্থাও গবেষণা শেষে এই মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছে। তাদের ভাষায়-কেউ কেউ 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর গণ্ডিকে সম্প্রসারণ করে আল্লাহর পথে স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধাদের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও জীবন যাপনের উপজীব্যের সাথে, মসজিদ তৈরিতে, পুল বানানো, বিদ্যা শিক্ষা, দা'ঈদের কর্মতৎপরতার খরচকেও সংযুক্ত করেছেন। বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনান্তে সংস্থা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে-

---

৪৪. আবুল হাসান উবায়দুল্লাহ আল-মুবারকপুরী, *মির'আতুল মাফাতীহ*, তাবি, খ. ৬, পৃ. ৪৭৯।

أما القول الثالث : فهو أبعد الأقوال لأنه لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة صحيحة او سقيمة ولا من إجماع ، ولا من رأى صحابي.

৪৫. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৩২।

৪৬. ইবনু হাজার আল-আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬।

৪৭. ড. ইউসুফ আল-কারদাভী, *ফিকহুয যাকাত*, তা. বি. পৃ. ১১৩।

"মহান আল্লাহর বাণীতে উল্লিখিত 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর অর্থ হচ্ছে, স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধা এবং তাদের প্রস্তুতির জন্য যা প্রয়োজন তার সবকিছুই।"[৪৮] সুতরাং 'ফী সাবীলিল্লাহ' বলতে সকল প্রকার কল্যাণমুখী কর্মকে বুঝিয়ে মসজিদ, মাদরাসা, রাস্তা, ঘাট, পুল তৈরি ও ইলম আহরণে রত ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদানে যাকাত দেয়া বৈধ নয়। তবে 'ফী সাবীলিল্লাহ' বলতে যেহেতু আল্লাহর দীনকে উচ্চকিত করার যুদ্ধে খরচ করার ব্যাপারকে আমরা সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য মত বলে প্রাধান্য দিয়েছি, সেহেতু এই যুদ্ধ বলতে কোন যুদ্ধকে বুঝায় এবং আধুনিক যুগে এ যুদ্ধের কোন কোন খাতে যাকাত ব্যয় করা যাবে সে বিষয়ে আলোকপাত করা জরুরী।

যুদ্ধ, যুদ্ধের সরঞ্জাম, যুদ্ধ কৌশল, যুদ্ধ পদ্ধতি এক যুগ থেকে অন্য যুগে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পার্থক্য হওয়াটাই স্বাভাবিক। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে ধ্বংস করার জন্য বর্তমানে ইসলাম বিদ্বেষীগণ বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ পরিচালনা করছে যা সশস্ত্র ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। যার অনিবার্য পরিণতিতে এই ভয়াবহ যুদ্ধের উপযোগী প্রতিপক্ষ হিসেবে মুসলিমদেরকে তৈরি করাও আধুনিক যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তরবারি, বিভিন্ন মারণাস্ত্র, পারমাণবিক বোমা, যুদ্ধ জাহাজ প্রভৃতি তৈরিতে যেমন যাকাত দেয়া বৈধ একইভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধে নিয়োজিত সৈনিক কলম সৈনিক, কণ্ঠ সৈনিকদের প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম তৈরি ও সরবরাহের ক্ষেত্রেও যাকাত ব্যয় করা বৈধ। আর এ খাতটি সন্দেহাতীতভাবে 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর খাত বলেই গণ্য হবে।

ফকীর-মিসকীন ও 'ফী সাবীলিল্লাহ' খাতের মধ্যে পার্থক্য

ব্যক্তি অথবা বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কর্মে নিয়োজিত সংস্থাসমূহ দরিদ্র, নিগৃহীত, নির্যাতিত, ফকীর-মিসকীনদের খাদ্য দান, বাসস্থানের ব্যবস্থা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, বস্ত্র সরবরাহ, কর্মসংস্থানের উপায়-উপকরণ সরবরাহ প্রভৃতি কাজে যাকাতের অর্থ খরচ করে 'ফী সাবীলিল্লাহ' খাতে খরচ করা হয়েছে বলে মনে করে। প্রকৃত পক্ষে এ সকল কার্যক্রম 'ফী সাবীলিল্লাহ' খাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এগুলো যাকাত সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত আটটি খাতের[৪৯] প্রথম দুটি খাত তথা ফকীর ও মিসকীনদের খাত বলেই স্পষ্ট উল্লেখ হয়েছে। সুতরাং এ দুটি খাত 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর খাত থেকে ভিন্ন। এ প্রসঙ্গে ড. ইউসুফ আল কারদাভী বলেন-

---

[৪৮] ০৫/০৮/১৩৯৪ হতে ২২/০৮/১৩৯৪ হি. পর্যন্ত তায়িফে অনুষ্ঠিত সেমিনারে উপস্থাপিত বিষয়াদির ২১/০৮/১৩৯৪ হি. তারিখে আলোচিত বিষয়সমূহের ২৪নং সিদ্ধান্ত।

[৪৯] সূরা আত তাওবার ৬০ নম্বর আয়াত অনুযায়ী খাতগুলো হচ্ছে, ফকীর, মিসকীন, তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীবৃন্দ, যাদের চিত্ত আকৃষ্ট করতে হয় তারা, দাসমুক্তি, ঋণভারাক্রান্ত, ফী সাবীলিল্লাহ ও মুসাফিরগণ।

'ফী সাবীলিল্লাহ' এর সম্প্রসারিত সাধারণ অর্থ গ্রহণ করলে খাতটি আরো অনেক কিছুকে যুক্ত করবে, যা মূলত যাকাত প্রদানের নির্ধারিত আটটি খাতের সাথে সাংঘর্ষিক হবে। কেননা মহান আল্লাহ খাতগুলোকে আটটিতে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। এই আটটি খাতের বাইরে অন্য কোথাও যাকাত দেয়া সঠিক নয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর এমন বিশেষ অর্থই গ্রহণ করা অপরিহার্য, যা মূলত ফকীর-মিসকীন নামে চিহ্নিত খাত দুটি হতে এটি যে ভিন্ন খাত তা স্পষ্ট হয়।[৫০] সুতরাং 'ফী সাবীলিল্লাহ' খাত ফকীর ও মিসকীনের খাত থেকে স্বতন্ত্র।

'ফী সাবীলিল্লাহ' সম্পর্কে বিভ্রান্তি ও তার অপনোদন

যাকাত আদায় হওয়ার অনিবার্য শর্ত হচ্ছে উক্ত সম্পদে গ্রহীতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া। প্রথম চারটি খাতে মালিকানা প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য, যা যাকাতের খাতসমূহে বর্ণিত আয়াতের "লিলফুকারায়ি" শব্দের লাম এর উপর আতফ। আর লাম অর্থ মালিকানা।[৫১] 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর খাত মনে করে আমাদের দেশের অনেক মাদরাসা ও এগুলোর লিল্লাহ বোর্ডিং, এতিমখানা নামক প্রতিষ্ঠানগুলোতে যাকাত দেয়াকে বৈধ মনে করা হয়। পূর্বের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, এগুলো কোনভাবেই 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর খাত নয়। এগুলোকে ফকীর ও মিসকিনের খাত মনে করারও কোন সুযোগ নেই। এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীগণ ফকীর অথবা মিসকীন হলেও এভাবে প্রতিষ্ঠানকে যাকাত দিলে এ অর্থের তারা ব্যক্তিগত মালিক হয় না। সে জন্য এ প্রক্রিয়ায় যাকাত আদায় বৈধ নয়। আর কোন প্রতিষ্ঠানকে যাকাতের অর্থের মালিক বানিয়ে দিলে কেন যাকাত আদায় হবে না, প্রশ্ন তুলে যারা এ পদ্ধতিতে যাকাত আদায় হয়েছে বলে ফাতওয়া দেন, তাদের ফাতওয়াও সঠিক নয়। কেননা কোন প্রতিষ্ঠান যতই অর্থাভাবে থাকুক না কেনো তারা ফকীর অথবা মিসকীন হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয় না। সেজন্য তাদেরকে ফকীর ও মিসকিনের খাত থেকে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হবে না। আর 'ফী সাবীলিল্লাহ' খাত থেকে যে তাদের যাকাত দেয়ার সুযোগ নেই তা তো পূর্বেই বলা হয়েছে।

আমাদের সমাজে অনেকটা হিলা বা কৌশলের প্রশ্রয় নিয়ে গ্রহীতা যাকাতের মালিক হয়েছে প্রমাণের জন্য মাদরাসা অথবা এতিমখানার কোন ছাত্রকে যাকাতের অর্থ দিয়ে তাকে উক্ত অর্থ উক্ত মাদরাসা বা এতিমখানাকে দিতে বাধ্য করা হয়। মূলত এ অবস্থায় যাকাত মূলত উক্ত ছাত্র পায় না, প্রতিষ্ঠানই পায়। এ পদ্ধতিতে ছাত্রকে

---

৫০. ড. ইউসুফ আল কারদাভী, *ফিকহুয যাকাত*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৯২।

৫১. ড. ওয়াহবাতুয যুহাইলী, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, দামেস্ক : দারুল ফিকর, তা.বি., খ. ৩, পৃ. ৩৩৫।

পরবর্তীতে যাকাত প্রদান করে যাকাত আদায় হওয়াকে হালাল করার জন্য মাধ্যম বানানো হয় মাত্র। এটি হিলাল মুহাররমা বা অবৈধ কৌশল বা অবৈধ ছল চাতুরী বৈ কিছু নয়। এ কৌশলের মাধ্যমে অবলম্বনকৃত পদ্ধতিকে অনেকেই 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর খাত মনে করে থাকে, যা মোটেও 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর খাত নয়।

সমাজকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত সংস্থাকে যাকাত দেয়ার ব্যাপারে আরব বিশ্বের বিখ্যাত আলিম মুহাম্মাদ আল-উছায়মীনকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি সেখানে যাকাত দিলে আদায় হবে না মর্মে মত দেন।[৫২] দাওয়াতী সংস্থার দা'ঈকে যাকাত থেকে বেতন দেয়াকেও তিনি বৈধ মনে করেন নি।[৫৩] সুতরাং এ দু'টি খাত 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে তিনি ইলম অর্জনকারী ছাত্র উপার্জন করার সামর্থ্যবান হলেও তাকে যাকাত দেয়াকে বৈধ বলেছেন, কেননা তিনি ইলম অর্জনকে জিহাদের অংশ মনে করেন, যা মূলত 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর অন্তর্ভুক্ত।[৫৪] আসলে এ ধরনের তালিবে ইলমকে মিসকীন মনে করেও তো যাকাত দেয়া বৈধ। 'ফী সাবীলিল্লাহ', যেহেতু একটি বিশেষ খাত সেহেতু এ খাত থেকে দেয়ার যৌক্তিকতা নেই।

আসলে মহান আল্লাহর দীনকে উচ্চকিত করার সকল প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা তথা জিহাদ ও কিতাল বা সশস্ত্র যুদ্ধ ও এর দু'টির অনুসঙ্গ সকল কিছুই 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর অন্তর্ভুক্ত এবং যা কিছু এর সঙ্গে সম্পৃক্ততা রাখবে তাও এ খাতের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। সেই মাপকাঠিতে মুজাহিদদের প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষক, তাদের পরিবার পরিচালনা, বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধের সৈনিকদের শত্রুপক্ষের সাথে লড়াই করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সবকিছুর ব্যবস্থা করাও 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর অংশ হিসেবে বিবেচিত। তবে ই'লায়ি কালিমাতিল্লাহ যা আল্লাহর দীনকে উচ্চকিত করার জিহাদকে অপব্যাখ্যা করে জিহাদের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন কোন কিছুকে জিহাদের অন্তর্ভুক্ত করে সে সমস্ত ব্যয়ের স্থলকে 'ফী সাবীলিল্লাহ' মনে করে যাতে যাকাতের অর্থ প্রদানের পথ শরীয়াহ-এর দৃষ্টিভঙ্গী বহির্ভূত খরচের জন্য উন্মুক্ত না হয় সে বিষয়ে আলিমদেরকে সতর্ক হতে হবে। দীনের সকল কাজকে 'ফী সাবীলিল্লাহ' মনে করে যাকাত দিয়েই সম্পাদন হতে হবে এ ধারণা বর্জন করা উচিত। যাকাত নির্ধারিত খাতে প্রদান না করলে যাকাত আদায় হবে না। আর যে কোন টালবাহানা ও কুট কৌশল করে 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর খাতকে অপব্যাখ্যা দিয়ে যে কোন কাজকে 'ফী সাবীলিল্লাহ' মনে

---

[৫২] আল'উছায়মীন, পৃ. ১৪৩-১৪৪।
[৫৩] প্রাগুক্ত, খ. ১৮, পৃ. ২৬১।
[৫৪] প্রাগুক্ত, খ. ১৮, পৃ. ২৬৩।

করে যাকাতের অর্থ খরচ করলে তা যদি সত্যিকারের অর্থে 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর খাত না হয়ে থাকে তাহলে যাকাত আদায় তো হবেই না বরং যাকাত না দেয়ার পাপে পাপিষ্ট হয়ে যাকাত দাতার জাহান্নামে যাওয়ার পথ সুগম হবে। সেজন্য সচেতনতার সাথে, গোড়ামী বর্জন করে, গুরুত্বপূর্ণ এ দীনি বিষয়কে অবমূল্যায়ন করা থেকে বিরত থেকে নিরপেক্ষভাবে 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর খাত কুরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নাহর আলোকে 'ফী সাবীলিল্লাহ' হিসেবেই যাতে অনুসৃত হয় সে বিষয়ে আমাদের দেশের সকল আলিম, গবেষক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে সজাগ দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানাচ্ছি।

উপসংহার

যাকাতের খাতের মধ্যে 'ফী সাবীলিল্লাহ' একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। ইসলামকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যেসব সশস্ত্র যুদ্ধ, মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ, বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ, কলমের যুদ্ধ, বাকযুদ্ধ প্রভৃতি পরিচালিত হয় তার যে কোনো খরচ 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর খাত হিসেবে যাকাত থেকে প্রদান করা যাবে। এ ক্ষেত্রে যাতে 'ফী সাবীলিল্লাহ' এর খাতকে অপব্যাখ্যা করে এর অর্থ অপব্যবহার না হয় সেদিকে আমাদের সবাইকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। যাকাতের 'ফী সাবীলিল্লাহ' খাত সঠিকভাবে চিহ্নিত করে এখাতে যাকাত প্রদানের মাধ্যমে যাতে আমরা আমাদের যাকাতকে যোগ্য পাত্রে দিতে পারি সে লক্ষ্যে চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৯ সংখ্যা : ৩৫
জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১৩

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বহুজাতিক রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের অধিকার ও নিরাপত্তার স্বরূপ

ড. মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন*

[**সারসংক্ষেপ** : *ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানব জীবনের এমন কোনো দিক নেই যার সুস্পষ্ট নির্দেশনা এতে নেই। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্যের নির্দেশনা ইসলামে বিদ্যমান। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বহুজাতিক রাষ্ট্রে বসবাসরত বিভিন্ন ধর্মের মানুষ মুসলিমদের থেকে কী ধরনের আচরণ লাভের অধিকারী তারও বিবরণ রয়েছে এ জীবন বিধানে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বহুজাতিক রাষ্ট্রে বসবাসরত সংখ্যালঘুদেরকে ইসলাম স্বাধীন বিশ্বাসের নিশ্চয়তা, উপাসনালয়ের নিরাপত্তা বিধান, উপাসনা করার সুযোগ, সুসম্পর্ক ও সহানুভূতিমূলক ব্যবহারের নিশ্চয়তা, সুবিচার লাভ ও অত্যাচার-নিপীড়ন থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার এবং সামাজিক সংহতি বজায় রাখার নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। মূলত সংখ্যালঘুদের অধিকার এবং খুলাফায়ে রাশেদীন ও মুসালিম শাসনামলে সংখ্যালঘুরা কেমন ছিলেন তার কিঞ্চিৎ চিত্র উপস্থাপন করে ইসলাম যে পরধর্মসহিষ্ণু, তা প্রমাণ করাই আলোচ্য প্রবন্ধের লক্ষ্য।*]

ভূমিকা

সমগ্র বিশ্বে সাতশ' কোটির অধিক মানুষের বসবাস। এরা হিন্দু, খ্রিস্টান, ইহুদী, বৌদ্ধ, মুসলিম, শিখ ইত্যাদি ধর্মের অনুসারী। এরা বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বসবাস করছে। এর মধ্যে মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্র সংখ্যা অর্ধশতাধিক হলেও এগুলোর অধিবাসীরা নিরঙ্কুশভাবে মুসলিম নয়। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় বসবাসরত সংখ্যালঘুদের সাথে কী আচরণ করতে হবে তার বাস্তব নমুনা মহানবী স. ও খুলাফায়ে রাশেদীন রেখে গেছেন। মহানবী স. মদীনার স্থানীয় ইহুদী, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে 'মদীনার সনদ' চুক্তির মাধ্যমে পরধর্মসহিষ্ণুতার মানদণ্ড নির্ধারণ করে একটি আদর্শ সমাজব্যবস্থার রূপরেখা রেখে গেছেন। খুলাফায়ে রাশেদীন সংখ্যালঘুদের প্রতি অত্যন্ত উদারনীতি অবলম্বন করেছেন। মুসলিম দেশের সংখ্যালঘু নাগরিকদের কী কী অধিকার এবং রসূলুল্লাহ স.-এর পরবর্তীযুগের মুসলিম শাসকগণ তাদের অধিকার বাস্তবায়নে কী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তা বিশ্লেষণ করলে ইসলাম প্রদত্ত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার স্বরূপ উন্মোচিত হয়।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মুসলিম সমাজে বসবাসরত সংখ্যালঘুদের অধিকারসমূহ

মুসলিম সমাজে বসবাসরত সংখ্যালঘুদেরকে ইসলাম কতিপয় বিষয়ের অধিকার ও নিশ্চয়তা প্রদান করে। মহান আল্লাহ্ কুরআন মাজীদে এ অধিকারগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য মুসলিমদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। নবী মুহাম্মদ স.ও সংখ্যালঘুদের কতিপয় অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এ নিশ্চয়তার লক্ষ-উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, তাদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করা এবং তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। তাদের অধিকারগুলো হচ্ছে:

১. স্বাধীন বিশ্বাসের নিশ্চয়তা প্রদান

ইসলামের মূল বিষয় হলো তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাস। এ তিনটি বিষয় মেনে নেয়ার পর অন্য যে কোন শরীয়ত (যেহেতু রহিত হয়ে গেছে) মেনে নেয়ার সুযোগ নেই। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রসূলের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন শরীয়ত প্রদান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বড় করুণা। তাই পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে,

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَـٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

"আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরীয়ত ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি। ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন কিন্তু তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তা দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করতে চান"।[১]

এ আয়াতটিতে আসমানী কিতাবের অনুসারী অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের নিজ নিজ ধর্মের বিধান পালনের ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে এবং একত্ববাদের অধীনে আল্লাহ্ যে বিভিন্ন শরীয়ত বা পথ পাঠিয়েছেন তার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। শরীয়তের এই ভিন্নতা মহান আল্লাহ্র অলৌকিক বিষয়।

মহান আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ্ মানুষের মধ্যে এমন সব গুণ দান করেছেন যার মাধ্যমে সে সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। আর এ কারণে আল্লাহ্ মানুষকে ইচ্ছার স্বাধীনতা ও পছন্দ-অপছন্দের স্বাধীনতা দিয়েছেন। এ গুণের কারণেই সে স্বেচ্ছায় ইসলামে দীক্ষিত হবে, তাকে জোর করে ইসলামে দীক্ষিত করার প্রয়োজন নেই। আর এ কারণেই মহান আল্লাহ্ বলেছেন: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ 'দীনের ব্যাপারে কোনো জোর জবরদস্তি নেই।'[২] অর্থাৎ কাউকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করা যাবে না।

১. আল-কুরআন, ৫ : ৪৮
২. আল-কুরআন, ২ : ২৫৬

স্বাধীনভাবে ধর্ম বা বিশ্বাস ধারণের অধিকার ইসলামে স্বীকৃত। ইসলাম মূলত পরধর্ম সহিষ্ণু। মুসলিম সমাজে বসবাসরত সংখ্যালঘু নাগরিক যদি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ না করে, তাকে জোর করে মুসলিম বানানোর অধিকার কোনো ব্যক্তি বা সরকারের নেই। তবে ইসলামের সৌন্দর্য তাদের সামনে তুলে ধরা যাবে। আল-কুরআনে বলা হয়েছেঃ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ 'তুমি কি মানুষদেরকে মুমিন হওয়ার জন্য জবরদস্তি করবে?'[৩] তিনি আরো বলেন :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

'আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তারা যাদের ডাকে, তোমরা তাদেরকে গালি দিও না। তাহলে তারা সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্‌কেও গালি দিবে।'[৪]

উমর রা. জনৈক খ্রিস্টান বৃদ্ধা মহিলাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলে সে মহিলা উত্তরে বলেছিল 'আমি মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়ানো এক বৃদ্ধা। শেষ জীবনে নিজের ধর্ম কেন ত্যাগ করবো? উমর রা. এ কথা শুনেও তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেননি বরং لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ 'ধর্মের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই'[৫] এ আয়াতটি পাঠ করে তার বিশ্বাসের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেন। কারণ ঈমান বা বিশ্বাসের সম্পর্ক বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে নয়। জিহাদ বা কিতাল কিংবা শক্তি প্রয়োগ দ্বারা বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভাবিত হয়।[৬] সুতরাং মুসলিম সমাজে বসবাসরত সংখ্যালঘুরা তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালনে স্বাধীন। এতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারো নেই।

২. উপাসনালয়ের নিরাপত্তা বিধান

উপাসনা অর্থ প্রার্থনা, আরাধনা, পূজা, ভগবৎ চিন্তা, উপকার প্রত্যাশায় অপরের সেবা বা মনোতুষ্টি সাধনা-চেষ্টা। উপাসনালয় অর্থ আরাধনা-পূজা-প্রার্থনার স্থান। বিশ্বে যেমন বিভিন্ন ধর্ম রয়েছে তেমনি বিভিন্ন উপাসনালয়ও রয়েছে। যেমন, মুসলিমদের মসজিদ, হিন্দুদের মন্দির বা টেম্পল, খ্রিস্টানদের গির্জা, বৌদ্ধদের প্যাগোডা ও ইহুদীদের সিনাগগ্।

ইসলাম যেভাবে অন্য ধর্মের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয়; তেমনি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় অন্য ধর্মের উপাসনালয়ের অবস্থিতিও স্বীকার করে। মুসলিম অধ্যুষিত দেশে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের বসবাস যেমন ইসলামে স্বীকৃত তেমনি নিজস্ব

---

৩. আল-কুরআন, ১০ : ৯৯।

৪. আল-কুরআন, ৬ : ১০৮।

৫. আল-কুরআন, ২ : ২৫৬।

৬. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (অনুবাদক), *পবিত্র কোরআনুল করীম* (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর), খাদেমুল-হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প-১৪১৩ হি. পৃ. ১৩৯।

উপাসনালয়ে উপাসনা করার নিরংকুশ অধিকারও স্বীকৃত। ইসলাম তাদের উপাসনালয়ের নিরাপত্তা বিধানেও বদ্ধপরিকর। তাই কুরআনে বলা হয়েছে :

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

"আল্লাহ্ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে বিধ্বস্থ হয়ে যেত খ্রিস্টান সংসারবিরাগীদের উপাসনাস্থান, গির্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ-যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহ্র নাম।'[৭] সুতরাং মুসলিম দেশে বসবাসরত ভিন্ন ধর্মের মানুষ তাদের ধর্ম পালনের জন্য ধর্মীয় উপাসনালয় তৈরি ও তা সংরক্ষণ করার অধিকার লাভ করে। এ ক্ষেত্রে মুসলিমদের বা সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে তাদের ধর্মীয় উপাসনালয় সংরক্ষণের যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৩. উপাসনা করার সুযোগ প্রদান

মুসলিম সমাজের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের ধর্ম অনুযায়ী উপাসনা করার পূর্ণ অধিকার লাভ করে। তাদের ধর্মে যে সব বিধি-বিধান স্বীকৃত সে সব পালন করার নিশ্চয়তা ইসলাম তাদেরকে প্রদান করে।

সায়্যিদ আমীর আলী বলেন: "By the laws of Islam, liberty of conscience and freedom of worship were allowed and guaranteed to the followers of every other creed under Moslem dominion."[৮]

একদল মুসলিম দার্শনিক মুসলিম দেশে বসবাসরত সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্বাধীনতার সীমা-পরিসীমা নির্ধারণ করতে গিয়ে অভিমত দিয়েছেন যে, তারা শুকরের মাংস, মদ এবং তাদের ধর্মে এ ধরনের যা কিছু বৈধ তা পান ও ভক্ষণ করতে পারবে। মুসলিম সরকার তাদেরকে এগুলো ভক্ষণ ও পান করতে বাধা দান করার অধিকারী নয়। মুসলিম দার্শনিকগণ সংখ্যালঘুদের এ ধর্মীয় স্বাধীনতা তখন দিয়েছিলেন যখন বিশ্বের অর্ধেক জুড়ে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল, মুসলিম শাসক ও গভর্নরগণ তাদের ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত সংখ্যালঘুদের জন্য এ নির্দেশনা দিয়েছিলেন। আর

---

৭. আল-কুরআন ২২ : ৪০।

৮. Syed Amer Ali, *The Spirit of Islam* (reprint), Delhi : Low price publications, 1990, p.212.

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের পূর্ণ ধর্মীয় অধিকার লাভ করেছিল।[৯] ইসলামের এ অসাম্প্রদায়িক চেতনার দ্বারা বিশ্বের অনেক জাতিই প্রভাবিত হয়ে আরবদেরকে স্বাগত জানায়। যেমন নিকট প্রাচ্য তুরস্ক ও তার আশে-পাশের ইহুদীগণ তৎকালীন মুসলমানদেরকে তাদের দেশে স্বাগত জানিয়েছিল, মুসলমানরা তাদেরকে পূর্ববর্তী শাসকদের অত্যাচার থেকে মুক্তি দিয়েছিল। তাই চিন্তাবিদ Duran বলেন :

"Jews in the nearest East Welcomed the Arabs Who liberated them from the oppression of their previous rulers. Under the authority of the Arabs, they become enjoy complete freedom in their lives and practicing their religious rituals. Furthermore, Christians were free in celebrating their festivals openly and the Christians pilgrims used to come in multitudes to visit the Christian shrines in Palestine. Rather, the Christians who do not belong to the church of the Byzantine state who used to suffer from many forms of oppression on the hands of patriarchs of Constantine, Jerusalem, Alexandria and Antakya, become now free and safe under the authority of Muslims."[১০]

মোটকথা তৎকালীন বিভিন্ন জাতি তাদের ধর্ম-কর্ম পালনে মুসলিমদের থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছিল।

৪. সুসম্পর্ক ও সহানুভূতিশীল ব্যবহারের নিশ্চয়তা

মহান আল্লাহ্ সংখ্যালঘুদের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি ও তা বজায় রাখার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন। সংখ্যালঘুদের নারী-পুরুষ, শিশু, শ্রমিক, বৃদ্ধ, দুর্বল, রুগ্ন ও প্রতিবন্ধী মানুষ যারা মুসলিমদের জন্য ক্ষতিকারক নয়, ইসলাম তাদের প্রতি মানবিক ও ন্যায় আচরণের অনুপ্রেরণা যোগায়। কুরআনে বলা হয়েছে:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

---

৯. Abdel Wadoud Moustafa Moursi El-Seoudi, *Rights of non-Muslims in the Muslims Society*, The Social Science 7(6), *Medwell Journals,* Malaysia 2012, p. 793.

১০. Ibid, p.793.

'যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি, তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।'[১১] এ নির্দেশনা রসূলুল্লাহ স. ও তাঁর অনুসারীগণ বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন।

ভিন্নধর্মের মানুষদের সাথে মুহাম্মদ স. সহানুভূতিশীল ব্যবহার করতেন এবং সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। ভিন্নধর্মের কোন প্রতিবেশী অসুস্থ হলে তিনি তাকে দেখতে যেতেন এবং তার মাথার কাছে যেয়ে বসতেন।[১২] কোনো ইহুদী আমন্ত্রণ জানালেও তিনি তার আমন্ত্রণে সাড়া দিতেন। তিনি ভিন্নধর্মের অনুসারীকে উপহার দিতেন এবং তাদের কাছ থেকে উপহার গ্রহণ করতেন। আলেকজান্দ্রিয়ার গভর্নর এবং মিসরে বায়জান্টাইন সম্রাটের ভাইসরয় মুকাওকিস কর্তৃক প্রেরিত দু'জন তরুণী, কিছু কাপড় ও সওয়ারীর জন্য একটি খচ্চর উপহার হিসেবে গ্রহণ তাঁর আন্তঃধর্মীয় সুসম্পর্ক সৃষ্টির উজ্জ্বল প্রমাণ। তরুণীদের একজন হলেন মারিয়ায়ে কিবতীয়া এবং অপরজন হলেন শিরিন। খচ্চরটির নাম দুলদুল। হুনায়েনের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ স. এটির উপর আসীন ছিলেন।

৫. সুবিচার লাভের অধিকার ও অত্যাচার-নিপীড়ন থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার

মুসলিম দেশে সংখ্যালঘু নাগরিকরা ন্যায়বিচার লাভের অধিকারী। এ অধিকার তাদেরকে মহান আল্লাহ্ প্রদান করেছেন। মুসলিম রাষ্ট্রে তারা ন্যায়বিচার লাভ করতে পারে দুটো উপায়ে। তারা বিচার পেতে পারে মুসলিম দেশে প্রচলিত ইসলামী আইনের আওতায়, যদি ইসলামী আইন চালু থাকে অথবা তাদের স্ব স্ব ধর্মের আইন অনুযায়ী। বর্তমানে মুসলিম দেশে যদি সংখ্যালঘুদের ব্যক্তিগত বিষয়ের মোকাদ্দমা উপস্থিত হয় তবে মুসলিম সরকার তাদের ধর্ম অনুযায়ী তা ফায়সালা করার ব্যবস্থা করবেন। যেমন মহানবী স. মদ্য পান ও শুকরের মাংস ভক্ষণ মুসলমানদের জন্য হারাম করে শাস্তি নির্ধারণ করেছিলেন; কিন্তু সংখ্যালঘুদেরকে এ ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তিনি বিয়ের মত অন্যান্য ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনও হস্তক্ষেপ করেননি। তাদের ধর্ম অনুযায়ী যে বিয়ে বৈধ ছিল তা তিনি বহাল রেখেছিলেন।

৬. সামাজিক সংহতি বজায় রাখার নিশ্চয়তা

কোনো জাতি বা দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সামাজিক সংহতি অপরিহার্য। মহানবী স. মদীনায় হিজরতের পর সেখানে সামাজিক সংহতি স্থাপন ও তা সংরক্ষণে অনন্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি মদীনার বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের মানুষদেরকে

---

১১. আল-কুরআন, ৬০ : ৮

১২. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আল-জানায়িয, অনুচ্ছেদ : ফী ইয়াদাতিয্‌যিম্মী, বৈরূত : দারুল কুতুবিল আরাবী, তা. বি., খ. ৩, হাদীস নং-৩০৯৭।

নিয়ে এক সাধারণ জাতি গঠন করেন। সেখানে সব ধর্ম-বর্ণের মানুষ তাদের মৌলিক অধিকার পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করেছিল। তিনি তৎকালীন সমাজের মানুষদের মাঝে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূর করার জন্য যাকাত ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ 'এবং তাদের (সম্পদশালীদের) ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের হক।'[১৩]

আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

'যাকাত কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী, যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন (মুআল্লাফাতুল কুলূব) তাদের হক এবং তা দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীদের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য।'[১৪]

এ আয়াতে 'ফকীর' বলতে দরিদ্র ও 'মিসকীন' বলতে অভাবী শ্রেণিকে বুঝানো হয়েছে। আর 'মুআল্লাফাতুল কুলূব' বা যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন দ্বারা কিছু মুসলমান আর কিছু ভিন্নধর্মের মানুষকে বুঝানো হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে কিছু ছিল চরম অভাবী ও নও মুসলিম। এদের চিত্তাকর্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয় ইসলামী বিশ্বাস পাকাপোক্ত হওয়ার জন্য। আর ভিন্নধর্মের মানুষকে দেয়া হতো তাদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য। মোটকথা 'মুআল্লাফাতুল কুলূব' পরিভাষায় মুসলিম ও ভিন্নধর্মের মানুষ উভয় শ্রেণিই অন্তর্ভুক্ত। মহানবী স. চরম অভাবী মুসলিম ও নও মুসলিমকে এবং ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য অন্যান্য ধর্মের মানুষকে 'মুআল্লাফাতুল কুলূব' খাতের মাধ্যমে যাকাত দিতেন। কিন্তু তাঁর ইনতিকালের পর ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় এ খাতটির প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায়। তাই উমর রা., হাসান বসরী, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক র.-এর মতে, উল্লিখিত প্রেক্ষাপটে 'মুআল্লাফাতুল কুলূব' এর মাধ্যমে যাকাত পাওয়ার খাতটি রহিত হয়ে যায়। কিন্তু ইমাম আয-যুহরী, কাযী আবদুল ওহাব ইব্ন আরাবী, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের মতে হুকুমটি রহিত নয়; বরং আবূ বকর ও উমর রা.-এর শাসনামলে এ খাতটির প্রয়োজন ছিল না বলে বন্ধ করে দেয়া হয়। ভবিষ্যতে যখনই প্রয়োজন হবে তখনই উল্লিখিত খাতের মাধ্যমে যাকাত দেয়া যাবে।[১৫]

ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির জীবন বিধান হিসেবে সামাজিক সংহতির নিশ্চয়তা বিধানের জন্য নিজের মতো অন্যকে ভালোবাসতে এবং অপরের কল্যাণে ত্যাগ

---

১৩. আল-কুরআন, ৫১ : ১৯।

১৪. আল-কুরআন, ০৯ : ৬০।

১৫. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৮।

স্বীকারে প্রেরণা যোগায়। ইসলাম সংখ্যালঘুদের সাথেও সদাচরণ ও শিষ্টাচারের নির্দেশনা দেয়। রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো যিম্মী (অমুসলিম)কে কষ্ট দিবে আমি কিয়ামতের দিন তার প্রতিপক্ষ হবো"।[১৬]

রসূলুল্লাহ্ স. এর চরিত্রে কুরআনের দিক-নির্দেশনার প্রভাব এমনভাবে পড়েছে যে, তিনি কেবল মানুষ কেন, বরং সকল প্রাণির সাথেও সদ্ব্যবহার করেছেন এবং সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, "সকল সৃষ্টি আল্লাহ্র পরিবার। সে-ই আল্লাহ্র অধিক প্রিয় যে আল্লাহ্র পরিবারকে ভালোবাসে"।[১৭] তিনি আরো বলেন: 'মানুষের জন্য তা-ই ভালবাসবে যা নিজের জন্য ভালোবাস, তবেই মুসলিম হবে।'[১৮] তিনি অন্যত্র বলেন, 'পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া কর, তবে আসমানে যিনি আছেন তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের উপর দয়া করবেন।'[১৯] ইসলাম দয়া-মায়া, ভালোবাসা, স্নেহ-শ্রদ্ধা, কল্যাণ কামনা, সহমর্মিতা, পরোপকার, জনসেবা, দানশীলতাসহ মানবকল্যাণমুখী সব ইতিবাচক কর্ম-কাণ্ডের মাধ্যমে সামাজিক সংহতির অনুপ্রেরণা যোগায়।

ইসলাম উপরোক্ত নিয়মনীতি ছাড়াও আরো এমন কতগুলো নীতি দিয়েছে যা বহুজাতিক রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের মানবিক অধিকার নিশ্চিত করতে পারে। নীতিগুলো হচ্ছে, সামাজিক সাম্য, বৈষম্যের বিলোপ সাধন, বেঁচে থাকার অধিকার, নির্যাতন ও অমানবিক আচরণ থেকে মুক্তির নির্দেশনা, অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ

---

১৬. আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী, *কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফআল*, অধ্যায় : আল-জিহাদ মিন কিসমিল আকওয়াল ওয়া ফীহি সিত্তাতু আবওয়াব, আল-ফাসলুল আউয়াল ফীল আমান ওয়াল মু'আহদাহ ওয়াস সুলহ ওয়াল ওয়াফা ফিল আহাদ, বৈরুত : মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৯, হাদীস নং-১০৯১৩;، من آذى ذميًّا فأناخصمه হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف), মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, *যঈফুল জামি আস-সাগীর ওয়া যিয়াদাতুহ*, বৈরুত ; আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৮হি., হাদীস নং-৫৩১৪।

১৭. আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী, *কানযুল উম্মাল*, অধ্যায় : আয-যাকাত, অনুচ্ছেদ : তাতিম্মাতুল ইকমাল, মিনাত তারগীবি ফিয যাকাত, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৬১৭১; হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف), মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, *মিশকাতুল মাসাবীহ তাহকীক, বৈরুত* : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৫ খ্রি., ১৪০৫ হি., হাদীস নং-৪৯৯৯।

১৮. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : মিনালঈমানি আন্ ইউহিব্বা লিআখীহি মা ইউহিব্বু লিনাফসিহি। বৈরূত : দারু ইবনু কাছীর, ১৯৮৭ খ্রি./ ১৪০৭হি., হাদীস নং-১৩।

১৯. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-বিররু ওয়াস্সিলা, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী রাহমাতিল মুসলিমীনা, বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, তা. বি., হাদীস নং-১৯২৪। হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح)।

বিবেচিত হওয়ার অধিকার, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, সুরক্ষা, মান-সম্মান ও খ্যাতি রক্ষার অধিকার, স্বাধীনভাবে চলাচল ও বসবাসের অধিকার, পরিবার গঠনের অধিকার, ধন-সম্পদ অর্জন ও রক্ষার অধিকার, বাক স্বাধীনতার অধিকার, সংগঠনের স্বাধীনতা, অভাবী, বঞ্চিত ও অক্ষমদের সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার এবং শিক্ষার অধিকার।[২০]

খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসন আমলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

উমর রা. সকল ধর্মের মানুষকে সহানভূতির চোখে দেখতেন। সংখ্যালঘুরা জিযিয়া কর দিয়ে নিরাপত্তা লাভ করতেন। খলীফা যদি তাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হতেন তবে তাদের কর ফেরত দিতেন। যুদ্ধের শুরুতে উপাসনালয়, গির্জা, শিশু, বৃদ্ধা ইত্যাদির উপর আক্রমণ করতে নিষেধ করতেন।[২১] তাছাড়া তিনি গরীব-দুঃখি, বিকলাঙ্গ, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ এবং সংসারত্যাগী ধর্মযাজকদেরকে জিযিয়া কর থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। জিযিয়া আদায়ের ক্ষেত্রে নির্দেশনা ছিল যেন কারো সাধ্যের বাইরে কোনরূপ জোর-জবরদস্তি না করা হয়।[২২] ইমাম আবূ ইউসুফ র. সংখ্যালঘু প্রজার অধিকার বর্ণনা করতে গিয়ে উমর রা.-এর ৩ টি মূলনীতি বারবার বর্ণনা করেনঃ ১. তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করা অপরিহার্য; ২. রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব তাদের নয়, বরং মুসলমানদের এবং ৩. সাধ্যের বাইরে তাদের উপর জিযিয়া এবং আয়করের বোঝা আরোপ করা যাবে না।[২৩]

তিনি আরো বলেন, মিসকীন, অন্ধ, বৃদ্ধ, ধর্মজাযক, উপাসনালয়ের কর্মচারী, স্ত্রী ও শিশুদেরকে জিযিয়া কর থেকে রেহাই দিতে হবে। যিম্মীদের সম্পত্তি এবং পশুপালনের উপর কোন যাকাত ধার্য করা যাবে না। যিম্মীদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করার ব্যাপারে মারপিট বা দৈহিক নির্যাতন জায়েয নেই। জিযিয়া দানে অস্বীকৃতির শাস্তি হিসেবে বড় জোর শুধু আটক করা যেতে পারে। নির্ধারিত জিযিয়ার অতিরিক্ত কিছু তাদের কাছ থেকে আদায় করা হারাম। অচল-অক্ষম এবং অভাবী যিম্মীদের লালন-পালন সরকারী ভাণ্ডার থেকে করা উচিত।[২৪]

উমর রা. কে কতিপয় মুসলিম প্রতিবেশী চার্চে ঘন্টা বাজানো বন্ধ করার ব্যবস্থা করার জন্য আবেদন জানালে তৎক্ষণাত তিনি বলেছিলেন, 'মসজিদে মুসলমানদের ইবাদত

---

২০. Professor Aminul Islam, *The Dhaka University Studies,* Journal of the Faculty of Arts, Vol. 62, No. 1, June- 2005, p.79-80.

২১. অধ্যাপক কে. আলী, *ইসলামের ইতিহাস,* ঢাকা : আলী পাবলিকেশনস, ১৯৮৬, পৃ. ১৭৭।

২২. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৭।

২৩. ইমাম আবূ ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ,* মিসর : আল-মাতবা'আতুস সালাফিয়্যাহ্, ১৩৫২ হি., পৃ. ১৪, ৩৭, ১২।

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২-১২৬।

করার যতটুকু অধিকার আছে, তদ্রূপ চার্চে খ্রিস্টানদের উপাসনা করারও অধিকার আছে। কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ হবে কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী। পরে প্রতিবেশী খ্রিস্টানদেরকে উমর রা. বন্ধুত্বসুলভ আচরণের মাধ্যমে মুসলমানদের নামাযের সময় ঘণ্টা না বাজানোর অনুরোধ করেন। তাঁর অনুরোধে তারা সাড়া দেন।[২৫]

খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে দরিদ্র ও সহায়-সম্পদহীন সংখ্যালঘুগণ বায়তুলমাল হতে নিয়মিত ভাতা ও সাহায্য পেতেন।[২৬] তারা স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের অধিকার ও আইন-আদালতে ন্যায়বিচার প্রার্থনার সুযোগ পেতেন। মুসলিম আইনের বাইরে তারা তাদের নিজস্ব বিধানের সুযোগ গ্রহণ করতে পারতেন এবং সে সব ক্ষেত্রে তাদের স্ব স্ব ধর্মীয় প্রধানগণ তাদের বিচার করতেন। তারা স্বাধীনভাবে স্বীয় সম্পত্তি ভোগ করতেন। মোটকথা তারা সর্বক্ষেত্রে মুসলিমদের ন্যায় সমঅধিকার লাভ করেছিলেন।

উমাইয়া ও আব্বাসীয়(৭৫০-১২৫৮) যুগে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

উমাইয়া খলীফা মুয়াবিয়া রা. সংখ্যালঘুদের প্রতি অত্যন্ত উদার ছিলেন। তাঁর চিকিৎসক, অর্থ সচিব ও সভাকবি ছিল খ্রিস্টান। সমগ্র উমাইয়া সাম্রাজ্যে তারা মোটামুটি সুখ-সাচ্ছন্দে বসবাস করেছিল। এ সময় অনেক গীর্জা, মন্দির ও উপাসনালয় সংস্কার করা হয়েছিল। যোগ্য সংখ্যালঘুদের রাজকার্যের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল।[২৭]

উমর ইবনে আব্দুল আযীয র. তাঁর শাসন আমলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করেছিলেন। তিনি তাদের অধিকারসমূহ যথাযথভাবে আদায় করেছিলেন।[২৮] তিনি তাদের অধিকার রক্ষায় কতিপয় পন্থা গ্রহণ করেছিলেন। পন্থাগুলো হচ্ছে :

ক. মুসলমানদের অনুরূপ তাদের জান-মালের নিরাপত্তাদান;

খ. তাদের ধর্মে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করা এবং তাদের ধর্মীয় স্থাপনা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা;

গ. জিযিয়া কর আদায়ে কোনরূপ অত্যাচার না করা এবং

ঘ. মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে তাদের উপর মুসলমানদের কোনরূপ অগ্রাধিকার না দেয়া।[২৯]

---

২৫. Dr. N. K. SINGH, *PEACE THROUGH NON-VIOLENT ACTION IN ISLAM*, Delhi : ADAM PUBLISHERS & DISTRIBUTORS, 1996, p. 77.

২৬. ইমাম আবূ ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, বৈরুত : দারুল মা'রিফা, ১৯৭৯, পৃ. ১৪৪।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০০।

২৮. ড. নাদীয়া হাসানী সাকার, *সিয়াসাতু ওমর ইবন আব্দিল আযীয*, সউদী আরব : আল-মাকতাবাতুল ফায়সালিয়া, তা.বি., পৃ. ১৯।

২৯. মাওলানা আব্দুস সালাম নাদভী, *হযরত ওমর ইবন আবদুল আযীয*, (অনুবাদ-মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ জহীরুল হক), ঢাকা : এমদাদীয়া পুস্তকালয়, ২০০১, পৃ. ১৪৩।

পূর্ববর্তী শাসকরা মুসলমান কিংবা যিম্মিদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে যে সব সম্পদ কুক্ষিগত করেছিল তিনি তা ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। তারা বেঁচে না থাকলে তাদের উত্তরাধিকারের মাঝে তা ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।[৩০] যেমন খলীফা ওয়ালিদ দামেস্কের ইউহান্না গীর্জা ধ্বংস করে লব্ধ জমি মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তাঁর শাসন আমলে এ গীর্জার ব্যাপারে অভিযোগ আসলে উমর ইবনে আব্দুল আযীয তাঁর অধীন শাসনকর্তাকে যে পরিমাণ জমি মসজিদে বৃদ্ধি করা হয়েছিল তা খ্রিস্টানদের ফেরত দানের ব্যবস্থা করেন।[৩১] একবার কোন এক মুসলমান কোন এক যিম্মীকে হত্যা করে। উমর ইবনে আব্দুল আযীয র. হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের নিকট সমর্পণ করার জন্য সেখানকার গভর্নরকে নির্দেশ দেন, যাতে তারা ইচ্ছে করলে ক্ষমা করে দিতে পারে কিংবা হত্যা করতে পারে। পরিশেষে তারা তাকে হত্যা করে।[৩২] তাদের সাথে সব ধরনের সৌজন্য প্রদর্শনের জন্য তিনি স্বীয় কর্মকর্তাদের প্রতি নির্দেশ দিতেন। তিনি যিম্মীদের সাথে নম্র ব্যবহার করতে এবং তাদের বয়স্ক অসহায়দের ব্যয়ভার বহন করতে কিংবা তার আত্মীয়-স্বজন থাকলে তাদেরকে ব্যয়ভার গ্রহণের নির্দেশ দেয়ার জন্য একবার ইরাকের শাসনকর্তা আদী ইবন আরতাতকে আদেশ দিয়েছিলেন।[৩৩] উমর ইবনে আব্দুল আযীযের নির্দেশনামা ছিল :

"যিম্মী অমুসলিমদের প্রতি মনোযোগ দাও এবং তাদের সাথে নম্র আচরণ করো। তাদের মধ্য থেকে যে সব লোক বয়োবৃদ্ধ এবং কর্মক্ষমতাহীন হয়ে পড়েছে এবং উপার্জন-উপায় কিছুই নেই, তুমি তাদের প্রয়োজন মত অর্থ রাষ্ট্রীয় বায়তুলমাল থেকে তাদের দাও। আর যদি তার কোনো আত্মীয়-স্বজন থাকে, তবে তাকে নির্দেশ দাও যেন সে তার ব্যয়ভার বহন করে। যেমন তোমার কোন গোলাম বয়স্ক হয়ে গেলে মৃত্যু পর্যন্ত অথবা মুক্ত হওয়া পর্যন্ত ব্যয়ভার বহন করতে।"[৩৪]

---

৩০. ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল-কুবরা*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি. খ. ৫, পৃ. ২৬৪।

৩১. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৯, খ. ৬, পৃ. ৪ ; আল-বালাযুরী, ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন জাবির, আবুল আব্বাস আহমাদ, *ফুতুহুল বুলদান*, Lugduni Batavorum, EJ.BRILI-1968, পৃ. ১২৫।

৩২. রশীদ আখতার নাদভী, *'উমর ইব্ন 'আবদুল 'আজীজ ও ইসলামী শাসনের বাস্তব চিত্র*, (অনুবাদ : মাওলানা আব্দুল মান্নান ছূফী), ঢাকা : আধুনিক লাইব্রেরী, ১৯৯৬, পৃ.১৭৪।

৩৩. ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬।

৩৪. প্রাগুক্ত।

فانظر اهل الذمة فارفق بهم' واذا كبر الرجل منهم و ليس له مال فانفق عليه' فان كان له حميم فمر نميمه ينفق عليه' وفاصه من جراحة كما لوكان لك عبد فكبرت سنة لم يكن لك بد من ام تنفق عليه حتى يموت أو يعتق–

আব্বাসীয় শাসক খলীফা মামুন সকল সম্প্রদায়কে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেছিলেন। ১১০০০ খ্রিস্টান গীর্জা, ইহুদী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অনেক উপাসনালয় তাঁর সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিদ্যমান ছিল।[৩৫] আর এ আমলে বিজিত অঞ্চলের সংখ্যালঘুরা মুসলিম প্রশাসন থেকে নিরাপত্তামূলক সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা লাভ করত।

স্পেন

তারিক বিন যিয়াদ ৭১১ খ্রিস্টাব্দে স্পেন জয় করেন। তারপর প্রায় ৮ শতাব্দী এ অঞ্চল মুসলিম কর্তৃক শাসিত হয়। কুচক্রীদের বিচ্ছিন্ন কিছু অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা ছাড়া দীর্ঘকাল স্পেন ছিল শান্তি ও সমৃদ্ধির দেশ। দেশটি সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের সেতুবন্ধন রচনা করেছিল। এখানে রোমান ইহুদী, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের অবস্থান ছিল, ছিল মসজিদ, চার্চ ও সিনাগগের মত অনেক উপাসনালয়। স্পেনের মুসলিম শাসনামলে মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদীদের সহাবস্থান ছিল। এ সময় মুসলিমদের নিকট ইহুদী-খ্রিস্টান ধর্ম কোন ভিনদেশী জোরপূর্বক অনুপ্রবিষ্ট ধর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়নি। অপর দিকে ইহুদী-খ্রিস্টানগণ মুসলিম শাসনের শুরুতে ইসলামকে বিড়ম্বনার কারণ মনে করতো। অন্যান্য ধর্ম ও বর্ণের যারাই মুসলিমদের সংস্পর্শে এসেছে তাদের সাথে মুসলিমগণ সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করেছে। তাদের জীবন-যাত্রার মান কোন অবস্থাই অমুসলিম শাসন আমলের চেয়ে খারাপ ছিল না। মুসলিম শাসনের অধীনে তারা তাদের ব্যক্তিগত কার্যাবলী ও ধর্ম-কর্ম অব্যাহত রাখতে পেরেছিল। খ্রিস্টান সম্প্রদায় তাদের ধর্ম-কর্ম স্বাধীনভাবে তাদের উপাসনালয়ে করতে পারত। এ শাসনামলে টলেডোর প্রাচীন সিনাগগে ধর্মীয় কার্যাবলি অব্যাহত ছিল।[৩৬]

খ্রিস্টানগণ তাদের যুবকদেরকে এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে তাদের ছেলে-মেয়েদেরকে স্বাধীনভাবে ধর্মীয় শিক্ষাদীক্ষা দিতে পারত।[৩৭] স্পেনের তৎকালীন এ ধর্মীয় সহিষ্ণু পরিবেশ আফ্রিকা, ইরাক, সিরিয়া ও অন্যান্য দেশের অধিবাসীদেরকে স্পেনে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। যার ফলে পরবর্তীতে স্পেন ইউরোপের একমাত্র ইহুদী সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে পরিণত হয়। নতুন নতুন শহরে অসংখ্য চার্চ ও সিনাগগ স্থাপিত হয়। সাধারণ ইহুদী-খ্রিস্টানরা নিরাপত্তা কর জিযিয়া দিত, কিন্তু তাদের ধর্মগুরুদেরকে জিযিয়া–খারাজ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল। তাদের স্ব স্ব ধর্ম অনুযায়ী পৃথক বিচারব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। তাদের নিজস্ব ধর্মগুরু বা ধর্মযাজক ছিল

---

৩৫. অধ্যাপক কে. আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৪।

৩৬. S.M. Imamuddin, *Some Aspects of Socio-Economic and Cultural History of Muslim Spain (711-1492 A.D.),* L edin, E.J. Brill, 1965, p.1.

৩৭. Ibid, p. 41.

যারা স্পেনের মুসলিম সরকারে প্রতিনিধিত্ব করতো। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কার্যাবলি যেমন বিয়ে, তালাক, খাদ্যভক্ষণ, সম্পদ বণ্টন ইত্যাকার কার্যাবলি তাদের স্ব স্ব ধর্মানুযায়ী প্রতিপালন করার সুযোগ তারা পেয়েছিল।[৩৮]

আন্দালুসের (স্পেনের) সংখ্যালঘুরা মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য স্থানে অবস্থানরত সংখ্যালঘুর মতই যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছিল। তারা সেখানকার মুসলিম সমাজের প্রধান ধারায় এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে, তাদেরকে পৃথক করা কষ্টসাধ্য হতো। তারা কুরআন-সুন্নাহ্র নির্দেশনা অনুযায়ী সর্বক্ষেত্রে সার্বিক নিরাপত্তা লাভ করেছিল।[৩৯] সংখ্যালঘুদের অনুকূল এ পরিবেশ মুসলিম বিজয় থেকে শুরু করে প্রায় ১১শ শতাব্দী পর্যন্ত বিরাজ করেছিল। মোটকথা স্পেনের মুসলিম শাসন আমলে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ তাদের ধর্ম-কর্ম পালনে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছিলো।

ভারত

মুহাম্মদ ইবনে কাসিম ৭১১ খ্রিস্টাব্দে ভারতের সিন্ধু জয় করেন। এ বিজয়ের মাধ্যমে ভারত প্রত্যক্ষ মুসলিম শাসনাধীনে আসে। ৭১১-৭১৩ খ্রি. পর্যন্ত মাত্র দু' বছরে সিন্ধু ও মুলতানের সব এলাকা মুসলিম শাসক মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের অধীনে চলে আসে। ৭১১-৭১৪ পর্যন্ত প্রায় তিন বছরেরও অধিককাল তিনি এ অঞ্চল শাসন করেন। তিনি যখন এ অঞ্চল বিজয় করেন তখন বসবাসরত বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের সম্পর্কে নতুন রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে এ নিয়ে সমস্যায় পড়েন। কারণ এর অধিবাসীরা ছিল সিন্ধি অথবা হিন্দু কিংবা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। মিসর ও সিরিয়ার মত আহলে কিতাব কেউ ছিলো না। তাছাড়া স্থানীয় বাসিন্দারা মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে যাতে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরগুলো পুনরায় মেরামত করতে পারে এবং উপাসনা করতে পারে। মুহাম্মদ ইবনে কাসিম হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিকট এ সমস্যার সমাধান চেয়ে চিঠি লিখেন। জবাবে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ লিখেন,

'তোমার পত্রখানা পেলাম। বর্ণিত ঘটনাবলি সম্পর্কে অবগত হয়েছি। লোকেরা তাদের মন্দির মেরামতের জন্য স্বীয় সম্প্রদায়ের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে। তারা যখন আমাদের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে এবং খিলাফতের কর প্রদানের স্বীকারোক্তি ও দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, তখন তাদের উপর আমাদের আর অতিরিক্ত কোন চাহিদা থাকে না। কেননা তারা এখন যিম্মীর মর্যাদায়। তাদের জানমালের উপর আমাদের কোনো হঠকারিতা চলে না, এ জন্য তাদের অনুমতি দেয়া যেতে পারে যে, তারা স্বীয়

---

৩৮. Anwar G. Chejne, *Muslim Spain Its History and Culture*, Minneapolis : The University of Minnesota Press, 1974, p. 115.

৩৯. Ibid.

দেবতার উপাসনা করতে পারে এবং কোনো লোকের পক্ষে তাদের ধর্ম সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন ও বিরোধিতা করা সঙ্গত হবে না। এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতেই তারা তাদের বাড়ি-ঘরে স্বীয় ইচ্ছামাফিক বসবাস করবে।'[৪০]

মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের শাসন আমলে ভিন্নধর্মের মানুষ আহলে কিতাবের মত অনেক সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছিল। বিজয়ী ইবনে কাসিম বিজিতদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করতেন। কর আদায়ে তাদের পূর্বের রীতি চালু রেখেছিলেন এবং পুরাতন কর্মচারীদের কাউকে তিনি চাকুরীচ্যুত করেননি। হিন্দু সম্প্রদায় নিজ নিজ মন্দির-উপাসনালয়ে স্বাধীনভাবে উপাসনা করতে পেরেছিলো। ভূমি মালিকগণ পুরোহিত ও মন্দিরসমূহকে পূর্বের মতই ট্যাক্স দিতে পারতেন।[৪১] সংখ্যালঘুদের উপর নামেমাত্র জিযিয়া ধার্য ছিলো। অপর দিকে মুসলমানদের উপর ধার্য ছিল যাকাত-সাদকা। তাঁর রাষ্ট্রীয় কোষাগারে মুসলমানদেরকে তাদের সম্পদের শতকরা আড়াইভাগের অধিক, কোনো কোনো সময় সাড়ে পাঁচ ভাগ পর্যন্ত জমা দিতে হতো। অপর দিকে সংখ্যালঘুদেরকে সেখানে দিতে হত মাত্র পাঁচ দিনার। এ ছাড়া সামরিক কর্মকাণ্ড থেকে সংখ্যালঘুদেরকে অব্যহতি দেয়া হয়েছিল অথচ মুসলমানদের জন্য তাতে অংশগ্রহণ করা অপরিহার্য ছিলো। প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ বাদেও সংখ্যালঘুদের হাতে ন্যস্ত ছিলো। মুসলিম শাসকগণ কেবল সামরিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করতেন। মুসলমানদের মামলা-মোকাদ্দমার ফয়সালা করতেন বিচারকগণ। তবে শক্তিতে দুর্বল সংখ্যালঘুদের মামলা-মোকাদ্দমার কাজ সম্পাদনের জন্য পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু ছিলো। মুহাম্মদ ইবনে কাসিম এর নীতি ও ন্যায়পরায়ণতায় অনুপ্রাণিত হয়ে কয়েকটি শহর ও জনপদের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। তার আমলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এতই ব্যাপক ছিল যে, তিনি যখন বন্দী হয়ে ইরাক প্রেরিত হন তখন হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষ তার জন্য ক্রন্দন করেছে।[৪২] ভারত থেকে মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের ফিরে আসার পরও অন্যান্য মুসলিম শাসকদের সময়ও সংখ্যালঘুদের মর্যাদা অক্ষুন্ন ছিলো। সুলতান মাহমুদ মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন। সুলতান মাহমুদের সৈন্যবাহিনীতে হিন্দু ব্যাটালিয়ান ছিল এবং আমীর মাসউদের কয়েকজন হিন্দু জেনারেলের নাম পাওয়া যায়।[৪৩]

---

৪০. প্রফেসর মুহাম্মদ ইকরাম, (অনুবাদ-মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী), *উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির ইতিহাস,* ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ৯৯-১০০।

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০।

৪২.. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ.১০০।

সুলতানী আমলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

ভারতের সুলতানী আমলের (১২০৬-১৫২৬) মুসলিম শাসকগণ তাদের রাজ্যে বসবাসরত অন্যান্য জাতি হতে মাথাপিছু জিযিয়া কর আদায় করে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতেন। মুসলিম সামরিক বাহিনীতে স্বেচ্ছায় যোগদান কিংবা যুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অন্য ধর্মের অনুসারীগণ এক বছরের জিযিয়া কর দেয়া হতে অব্যাহতি পেতেন। এমনকি দেশ জয় করার পর বিজিত অঞ্চলের ভিন্নধর্মের অনুসারীদের যতদিন পর্যন্ত জান-মালের নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত করা না হতো ততদিন পর্যন্ত মুসলিম শাসকগণ তাদের উপর জিযিয়া আরোপ করতেন না। সংখ্যালঘু মহিলা, শিশু ও সব ধর্মের বৃদ্ধ, পঙ্গু, অন্ধ এবং যারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করে কিন্তু এ কর দিতে অসমর্থ তাদের জন্য এ কর মওকুফ ছিলো। এমনকি মঠধারী সন্ন্যাসী, পুরোহিত, ধর্মযাজক যারা জীবিকা অর্জন না করে শুধু আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন থাকতেন তাদেরকে এ কর থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল।[৪৪] মুসলমানদের পৈত্রিক সম্পত্তি, উত্তরাধিকার, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদের মত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়ের বিচারের কাজ মুসলিম আইন অনুযায়ী এবং অন্যান্য ধর্মের উক্ত বিষয়াদি তাদের স্ব স্ব ধর্মের আইন অনুযায়ী সম্পাদন করা হতো। ফৌজদারী ও সাক্ষ্য প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে মুসলিম আইন সব সম্প্রদায়ের উপর প্রজোয্য ছিল। মুসলিম ও অন্যান্যদের মধ্যে মোকাদ্দমার বিচার নিরপেক্ষতার নীতি অনুসারে পরিচালিত হতো। গ্রাম্য পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় হিন্দু সম্প্রদায়ের বেশির ভাগ মামলার সুরাহা হতো। তাদের খুব কম সংখ্যক মামলা আদালতে বিচারের জন্য প্রেরিত হতো। এ গ্রাম্য পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বৃটিশ আমল পর্যন্ত চালু ছিলো।[৪৫]

মোগল আমলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

ভারতে মোগল সরকার (১৫২৬-১৮৫৭) ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলো। শাসন প্রণালীতে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রাধান্য পাওয়ায় সম্রাটগণ বিভেদনীতি পরিহার করে জনসাধারণের সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন। নীতির দিক থেকে মোগল শাসনাধীন সকল সম্প্রদায়ের লোক আইনের চোখে সমান ছিলো। মুসলিম ছাড়াও অন্যান্য জাতির মানুষ সরকারী গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ লাভ করতেন। সরকারী রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় হিন্দুরা নিয়োগ পেতেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে সার্বিক রাজস্ব ব্যবস্থা সনাতন হিন্দু রীতিনীতি ও ইসলামী পদ্ধতির উপকরণের সংমিশ্রণে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। সম্রাট আকবর জিযিয়া কর বিলোপ করেন এবং বহুসংখ্যক সংখ্যালঘুকে সামরিক-

---

৪৪. এ.কে.এম আবদুল আলীম, *ভারতে মুসলিম শাসন ব্যবস্থার ইতিহাস*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯, পৃ. ৪৮-৫০।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১-৯২।

বেসামরিক পদে নিয়োগ দান করে প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেন।[৪৬] তাছাড়া তিনি সংখ্যালঘুদের উপর তীর্থকর উচ্ছেদ করেন এবং তাদেরকে নতুন নতুন উপাসনালয় তৈরি করার অনুমতি দেন। সম্রাট আওরঙ্গযেব কখনো সংখ্যালঘুদের ধর্ম-কর্ম পালনে হস্তক্ষেপ করেননি। আকবর ও তাঁর পরবর্তী শাসকগণও জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মকর্ম পালনে কখনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেননি।[৪৭]

মোগল আমলে বাংলার সমাজ ধর্মীয় ভিত্তিতে মুসলমান ও হিন্দু এ দু'ভাগে বিভক্ত ছিলো। হিন্দু আইন অনুসারে হিন্দু সমাজ এবং মুসলিম আইন অনুসারে মুসলিম সমাজ শাসিত হতো। মোগল সুবাদার বা নবাবগণ উভয় সমাজের জন্য কোনো সাধারণ আইন চাপিয়ে দেননি। তাই উভয় সমাজের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়গুলো স্ব স্ব ধর্মের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো। বর্তমানকালের ভারতের মত উভয় জাতির মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না। সে যুগে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার কথাও কোন ইতিহাসে পাওয়া যায় না।[৪৮] হিন্দু সম্প্রদায় তাদের ধর্মীয় ও সামজিক অধিকার পূর্ণমাত্রায় ভোগ করতো। মুসলিম শাসকগণ তাতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতেন না। এ প্রসঙ্গে ডক্টর এম.এ. রহিম বলেন, "মুসলমান শাসনকর্তাগণ হিন্দুদের ধর্মীয় ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করার নীতি অনুসরণ করেন। ফলে হিন্দুরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি উদযাপনে, শিক্ষায় ও ধর্মপ্রচারে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে সক্ষম হয়। সমসাময়িক বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণগণ বৈষ্ণবগুরু শ্রীচৈতন্যের বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারার প্রতি খুবই বিরূপ ছিলেন। তার ধর্ম প্রচারের কার্য থেকে তাকে নিরস্ত করার জন্যে রাষ্ট্রীয় সাহায্য লাভের অভিপ্রায়ে সুলতান শাহের নিকট বৈষ্ণবগুরুর বিরুদ্ধে নালিশ করেন। বিচক্ষণ সুলতান শ্রীচৈতন্যের কার্যাবলি সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করে বুঝতে পারেন যে, চৈতন্যের বৈষ্ণব চিন্তাধারা হিন্দুদের কোনো ক্ষতিসাধন করছে না, বরং হিন্দু সমাজের উন্নতি বিধান করাই তার চিন্তাধারা ও প্রচারণার লক্ষ্য। হিন্দুদের সামাজিক জীবনে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম প্রচারের গুরুত্বের কথা উপলব্ধি করে হোসেন শাহ তার ধর্ম প্রচার কার্যে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করেননি।"[৪৯]

---

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯-১১০।

৪৭. প্রাগুক্ত।

৪৮. কে. এম. রইছউদ্দিন, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*, ঢাকা : খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৯৩, পৃ. ৫৫৬।

৪৯. ডক্টর এম.এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৮, পৃ. ২৪৭।

ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে বাংলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর সমগ্র বাংলায় ইংরেজ আধিপত্য সৃষ্টি হয়। তখন এ দেশের সব শ্রেণির মানুষ তাদের স্বাধীনতা হারায়। ইংরেজদের শোষণমূলক রাজস্বনীতি, চিরাচরিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন, বিচারব্যবস্থায় অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ, দেশীয় রীতিনীতি বিরোধী কার্যকলাপ জনগণকে অতীষ্ঠ করে তুলে।[৫০] এর ফলে বিভিন্ন বিদ্রোহ দেখা দেয়। তাদের অন্যায় হস্তক্ষেপের কারণে উপজাতি চাকমারা পর্যন্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়।

উল্লেখ্য যে, এ দেশে ইংরেজদের আগমনের পূর্বে চাকমারা ছিল স্বাধীন। মোগল সরকারের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল সৌহার্দপূর্ণ। মোগল সরকারকে নামে মাত্র কর দিয়ে তারা স্বাধীনভাবে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করতো। চট্টগ্রামে তখন মুদ্রার প্রচলন ছিল না বিধায় কর পরিশোধ করত কার্পাস তুলায়। ইংরেজ শাসকগণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই বারবার রাজস্বের পরিমাণ বাড়াতে থাকে। তা ছাড়া চাকমা রাজাকে মুদ্রার মাধ্যমে কর পরিশোধ করতে বাধ্য করা হয়। ফলে তারা বিদ্রোহ করে।[৫১]

এ শাসনামলে বাংলার সংস্কৃতি ও ধর্মীয় অবস্থা আত্মবিস্মৃতিতে পরিণত হয়। সংস্কৃতি ও ধর্মীয় জীবনে নানা কুসংস্কার প্রবেশ করে। মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কার্যাবলিতে কুরআন-সুন্নাহ্ পরিপন্থি কর্মকাণ্ড বিস্তার লাভ করে। বাংলায় ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর এ সব কর্মকাণ্ড আরো বহু গুণে বেড়ে যায়। সুযোগ-সুবিধা লাভের দিক দিয়ে মুসলমানরা পিছিয়ে পড়ে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি শূন্যের কোঠায় পৌঁছে যায়।[৫২] সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুনরুদ্ধারের জন্য এ দেশের অনেক রাজনীতিক প্রচেষ্টা চালায়। কেউ কেউ কিছুটা সফল হয়; আবার অনেকে ব্যর্থ হয়। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের পর হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটলে ব্রিটিশ প্রশাসন ভারতের শাসন ক্ষমতা এ দেশের মানুষের কাছে হস্তান্তরের ইচ্ছে পোষণ করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৪ ও ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে যথাক্রমে পাকিস্তান এবং ভারত নামে দু'টি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়।[৫৩]

পাকিস্তান শাসন আমলে সমগ্র পাকিস্তান পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান নামে বিভক্ত ছিলো। কিন্তু অবস্থানগত দিক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ব্যবধান ছিল প্রায় ১৬০০ কি.মি.। এ দুই অঞ্চলের মধ্যে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য ছিল লক্ষণীয়। পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ

---

৫০. অধ্যাপক কে. আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৫।

৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৩।

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৬-৬৪০।

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫৭-৬৭৫।

সম্পর্ক বজায় থাকলেও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে তা ছিল শুণ্যের কোঠায়। আর পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু-মুসলিমের সম্প্রীতিমূলক পরিবেশকে পাকিস্তান সরকার কখনো ভাল চোখে দেখেনি। তাই তারা বরাবরই হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে তেমন সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করেনি। তাদের এ আচরণ তৎকালীন শিক্ষা-সংস্কৃতিতেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। হিন্দু-সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে প্রতিহত করার জন্য তাদের তৎপরতা লক্ষণীয় ছিলো।

তাই Khalid B. Sayeed লিখেছেন: "Governor Monem Khan attempted during the Ayub era to ban broadcast of Tagore's songs or poems over Dacca radio and to prevent the import of Bengali books from Calcutta."[৫৪]

মোটকথা পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের যেমন সুসম্পর্ক ছিল না; তেমনি পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু সম্প্রদায়েরও পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক-প্রশাসক ও জনসাধারণের সাথে সৌহার্দমূলক সম্পর্ক ছিল না।

স্বাধীনতাত্তোরকালে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়

স্বাধীনতাত্তোরকালে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপিত হয়। এ দেশের জনগণের শতকরা ৮৬.৬০% মুসলমান, ১২.১%হিন্দু, ০.৬% বৌদ্ধ এবং .৩% খৃষ্টান ও অন্যান্য।[৫৫] অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছে উপজাতি সম্প্রদায়। বাংলাদেশে দুই মিলিয়নের অধিক উপজাতি দেশের বিভিন্ন জেলায় বসবাস করছে। এ সব উপজাতি প্রধানত তিনটি ধর্মের অনুসারী। বুদ্ধিস্ট (৪৩.৭ ভাগ), হিন্দু (২৪.১ ভাগ), খ্রিস্টান (১৩.২) এবং ১৯ ভাগ অন্যান্য ধর্মের অনুসারী। ১৯৯১ সালের আদম শুমারীর হিসেব অনুযায়ী এ দেশে ২৭ শ্রেণির উপজাতি রয়েছে।[৫৬] এ উপজাতিসহ সব শ্রেণির নাগরিকের জন্য ১৯৭২ সালের সংবিধান ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সমঅধিকারের নিশ্চয়তা দিয়েছে।[৫৭] বাংলাদেশের পারিবারিক আইন পরিচালিত হয় প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্ব স্ব আইন দ্বারা। এতে মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান, বুদ্ধিস্ট এবং

---

৫৪. Khalid B. Sayeed, *Politics in Pakistan,* New York : Praeger Publishers, 1980, p. 67.

৫৫. মোঃ শাসসুল কবীর খান, *বাংলাদেশের অর্থনীতি,* ঢাকা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০০৪, পৃ. ৫০।

৫৬. South Asians for Human Rights, *South Asians for Human Rights Annual Minority Report,* Status of Minorities in Bangladesh – 2011, p.3.

৫৭. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান,* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৯৯৮ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত, অনুচ্ছেদ-২৭, পৃ. ৮।

উপজাতির জন্য পৃথক পারিবারিক আইন সংবিধান স্বীকৃত।[৫৮] চার দশকের অধিকাংশ সময় তারা তাদের সংবিধান স্বীকৃত অধিকার ভোগ করছে। ফলে স্বাধীনাত্তোরকাল থেকেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রয়েছে। অপরাজনীতির প্রভাব, উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার অভাবে দলে দলে বিভক্তি, বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মাঝে অস্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করছে।[৫৯] বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় উপাসনালয়সমূহ মাঝে মাঝে আক্রান্ত হয়। ধর্মের ছোট-খাট বিষয়কে কেন্দ্র করে মুসলিমদের মধ্যে অনৈক্য প্রকট আকার ধারণ করে। এক মুসলিম অপর মুসলিমকে অপবাদ দিতে দ্বিধা করে না। ফলে সাম্প্রদায়িকতার উন্মাদনাও দেখা দেয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য আল-কুরআন বর্ণিত নির্দেশনা এবং মহানবী স. তাঁর সময়ে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তায় যে সব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তার প্রয়োগ প্রয়োজন। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তায় কুরআন-হাদীসের দিক-নির্দেশনা যদি সত্যিকারভাবে সমাজে বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে বিভিন্ন সম্প্রদায় তাদের স্ব স্ব অধিকারগুলো বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে; সাম্প্রদায়িকতার মূলোৎপাটন ঘটবে ও সমাজ থেকে অশান্তি দূরীভূত হবে।

বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা

মহান আল্লাহ্ মুসলিম-অমুসলিম সকলের প্রতিপালক। সারা বিশ্বের মানুষ মুহাম্মদ স. এর উম্মত। তিনি বিশ্ববাসীর জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। তাই আবদেল অদূদ মুস্তফা মুরসী বলেন:

"The Noble Quran has commanded observing justice with those who adopt another religion; seventhly, guaranty of the social solidarity. The most important assurance that Islam provides to the non Muslim Who live in the Muslim society is including them within the system of Islamic Social Solidarity."[৬০]

মুহাম্মদ স. সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক ছিলেন। তিনি ইসলামী আদর্শ বিকাশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে গেছেন। তিনি একদিকে গোত্রীয় বা সাম্প্রদায়িক আভিজাত্য, গোত্রীয় শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ধর্ম-বর্ণের অহমিকা ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে প্রাধান্য দেয়ার

---

৫৮. Muslim Personal Law (Shariat) Application Act 1937, Act No. XXVI of 1937; Hossain, Kamrul, In Search of Equality: Marriage Related Laws for Muslim Women, *Journal of International Women's Studies*, Vol. 5 #1, Nov 2003, p. 96.

৫৯. *দৈনিক যুগান্তর*, ১৭ মে-২০১৩, ইসলাম ও জীবন, বিচ্ছিন্ন মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করাই ধর্মের লক্ষ্য, পৃ. ৫।

৬০. Abdel Wadoud Moustafa Moursi El-Seoudi, Rights of non-Muslims in the Muslims Society, of.cit. p.796.

রীতিনীতি পরিহার করেন, অপর দিকে সেখানকার স্থানীয় ইহুদী, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে 'মদীনার সনদ' চুক্তির মাধ্যমে সহাবস্থান ও কতিপয় অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করেন।

দশ বছর মক্কায় অবস্থানের পর মুহাম্মদ স. মদীনায় হিজরত করে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হলে তিনি বিভিন্ন ধর্মের লোকদেরকে নিয়ে সন্ধি স্থাপন করেন। সন্ধি ভঙ্গ করলে মুহাম্মদ স. তাদের উপর আত্মরক্ষামূলক শক্তি প্রয়োগ করতেন। যুদ্ধ শুরুর পূর্বে মুহাম্মদ স. এর নির্দেশনা ছিল, প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবে। তাতে তারা সাড়া না দিলে আত্মসমর্পণ বা জিযিয়া দিতে আহ্বান জানাবে। তাতেও সাড়া না দিলে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, তবে সীমালজ্ঘন করবে না। খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও একই নীতি অনুসৃত হয়। মুহাম্মদ স. ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে মুসলিম রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের বসবাস ছিলো। তারা কুর'আন-সুন্নাহ অনুযায়ী বিভিন্ন অধিকার লাভ করেছিলেন। মুসলিমরাও সংখ্যালঘুদের উপর কোন প্রকার যুল্ম-অত্যাচার করেননি; বরং তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করতেন; তাদের অধিকারের প্রতি তারা ছিলেন সর্বদা যত্নবান। এক কথায় মুহাম্মদ স. ও সাহাবীগণ সমাজে বসবাসরত মুসলিম-অমুসলিমদের মাঝে শান্তি, সংহতি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। মুসলিম শাসকরা তাদের সাথে অত্যন্ত উদার ব্যবহার করেছিলেন। অষ্টাদশ শতকের দিকে মুসলিম শাসনের পতন ঘটায় এবং মানুষের মধ্যে প্রকৃত ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয় হওয়ায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির অবনতি ঘটতে শুরু করে। বর্তমানে দিনের পর দিন নিত্য নতুন আঙিকে এর অবনতি ঘটছে।

উপসংহার

সাম্য-মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি, সংহতি স্থাপন করাই ছিল কুরআন নির্দেশিত মুহাম্মদ স. এর আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার লক্ষ্য। তিনি মক্কা-মদীনাকে কেন্দ্র করে আদর্শ সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম সেই রূপরেখা সম্প্রসারণ করেছেন। কালক্রমে এ সমাজব্যবস্থার মডেল আরব বিশ্বসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমান মুসলিম দেশসমূহের রাষ্ট্রীয় সংবিধান পুরোপুরি কুরআন-সুন্নাহ মুতাবিক না হলেও এর সমাজব্যবস্থা অনেকটাই কুরআন-সুন্নাহ্র প্রভাবে প্রভাবিত। তাই মুসলিম সমাজের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়াবলি কিছুটা কুরআন-সুন্নাহ্র দিক-নির্দেশনায় পরিচালিত হয়। প্রবন্ধে মুসলিম সমাজ বা রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিমদের অধিকারগুলোও কুরআন-সুন্নাহের আলোকে বিবৃত হয়েছে। এই সব অধিকার সম্পর্কে যদি মুসলিম ও অমুসলিমদেরকে অধিকতর সচেতন করা যায়, তবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসরত বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠির মধ্যে সংহতি ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে। এবং পৃথিবীর কোনো জনপদে খুলাফায়ে রাশেদীনের আদলে কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ- নির্বিশেষে সকলে ন্যায্য অধিকার লাভ করবে।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৯ সংখ্যা : ৩৫
জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১৩

রসূলুল্লাহ্ স.-এর অবমাননা : পরিণাম ও শাস্তি

হাবীবুল্লাহ মুহাম্মাদ ইকবাল*

[**সারসংক্ষেপ :** *আল্লাহ তাআলা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে পৃথিবীতে অসংখ্য নবী ও রসূল প্রেরণ করেছেন। আর নবী ও রসূল প্রেরণের এ ধারাবাহিকতা আদম আ.-এর প্রেরণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল এবং মুহাম্মদ স.-এর প্রেরণের মাধ্যমে এর সমাপ্তি ঘটেছে। মুহাম্মদ স. হলেন সকল নবী ও রসূলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তাআলা বহু উপায়ে তাঁর মর্যাদা সমুন্নত করেছেন। তিনি হলেন সর্বপ্রকারের পাপ ও অন্যায় থেকে মুক্ত সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাঁর আদর্শের অনুকরণ করা এবং তাঁর নির্দেশসমূহ মেনে চলা প্রত্যেক মুমিনের প্রতি তার ঈমানের একান্ত দাবি। কিন্তু বর্তমানে এক শ্রেণির অমুসলিম পণ্ডিত ও তাদের ভাবশিষ্য মুসলিম বুদ্ধিজীবীরাও রসূলুল্লাহ স.-এর বিরুদ্ধে নানা কল্প-কাহিনী তৈরি করে বিভিন্নরূপ কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছে এবং এভাবে তারা তাঁর সুমহান চরিত্র ও সীরাতের ওপর বিভিন্নরূপ কলঙ্ক লেপনের অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। এর পেছনে তাদের উদ্দেশ্য হলো, নতুন প্রজন্মের অন্তর থেকে আল্লাহর প্রতি ঈমান, রসূলুল্লাহ স.-এর প্রতি ভালোবাসা এবং ইসলামের বিধানের প্রতি আনুগত্যের বিষয়গুলোকে মুছে দিয়ে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করা। তাই এ সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহকে সচেতন করা এবং নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য। অত্র প্রবন্ধে কুরআন ও হাদীসের আলোকে রসূল স.-এর মর্যাদা, রসূল স.-এর অবমাননার সংজ্ঞা, যুগে যুগে রসূলুল্লাহ স.-এর প্রতি অবমাননা ও কটূক্তির ধরন, ইসলামী আইনে রসূলুল্লাহ স.-এর অবমাননার শাস্তি প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।]*

আল-কুরআন ও আল-হাদীসের আলোকে রসূলুল্লাহ্ স.-এর মর্যাদা

রসূলুল্লাহ্ স. ছিলেন আল্লাহ্ তাআলার সর্বশেষ রসূল এবং তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দাহ ও সর্বোত্তম মানব। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে সর্বোচ্চ মানবীয় মূল্যবোধ ও মননশীলতার সুমহান আধার করে সৃষ্টি করেছেন। তাঁকে দান করেছেন উন্নত ও পবিত্র চরিত্র এবং সুস্থ রুচিবোধ। তদুপরি শৈশব কাল থেকেই তিনি সর্বক্ষণ আল্লাহ্ তাআলার রহমত ও হিফাযত দ্বারা পরিচালিত হন। তাঁর সকল আচার-আচরণ, গতিবিধি ও কথাবার্তা- তথা সকল কিছুই ছিল আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক সুনিয়ন্ত্রিত। মোটকথা, তিনি সব ধরনের পাপ, অন্যায় ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মাসূম ছিলেন।

---

* চেয়ারম্যান, তানযীমুল উম্মাহ ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

আল্লাহ তাআলা নিজেই তাঁর এ অনুপম চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. "নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত।"[১] অন্য এক আয়াতে তিনি বলেন, إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ. "নিশ্চয়ই আপনি সঠিক হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছেন।"[২]

মুহাম্মদ স.-এর সম্মান ও মর্যাদা মহান আল্লাহই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। বিরুদ্ধবাদীরা নবীকে নিয়ে যতই কটূক্তি এবং অবমাননাকর কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকুক না কেন তাঁর মর্যাদা কেউ কমাতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ . "আর আমরা আপনার খ্যাতিকে সমুন্নত করেছি।"[৩]

তদুপরি রসূলুল্লাহ স. হলেন বিশ্ববাসীর জন্য একটি অনুপম আদর্শ। তাঁর প্রত্যেকটি কথা, কাজ ও আচরণ সকলের জন্য একান্তই অনুকরণীয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ "তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মাঝেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।"[৪] এ কারণেই কুরআনের অজস্র জায়গায় তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ অপরিহার্য হবার কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ।

রসূলুল্লাহ স.-এর একটি উল্লেখযোগ্য মর্যাদা হলো যে, তাঁর ওপর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ কুরআন নাযিল করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ

"আর যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে এবং মুহাম্মদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, আর তা তাদের রবের পক্ষ থেকে (প্রেরিত) সত্য। তিনি তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের থেকে দূর করে দেবেন এবং তিনি তাদের অবস্থা সংশোধন করে দেবেন।"[৫]

মহান আল্লাহ তাঁর মর্যাদাকে সমুন্নত করার জন্য তাঁর প্রতি সালাত ও সালাম পাঠের নির্দেশ প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

"হে মুমিনগণ, তোমরাও নবীর ওপর দরূদ পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।"[৬]

---

১. আল-কুরআন, ৬৮ : ৪।
২. আল-কুরআন, ২২ : ৬৭।
৩. আল-কুরআন, ৯৪ : ৪।
৪. আল-কুরআন, ৩৩ : ২১।
৫. আল-কুরআন, ৪৭ : ০২।
৬. আল-কুরআন, ৩৩ : ৫৬। এ প্রসঙ্গে আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত। নবী কারীম সা. বলেছেন:

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَحُطَّتْ عَنْهُ بِهَا عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ.

যুগে যুগে যেসব নবী ও রসূল আগমন করেছেন তাঁদের ওপর মুহাম্মদ স. কে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, আবূ হুরায়রা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "ছয়টি দিক থেকে সকল নবীর ওপর আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। আমাকে সংক্ষেপে ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক কথা বলার যোগ্যতা দেয়া হয়েছে, আমাকে ভীতিপ্রদ গাম্ভীর্য দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে, গনীমতের মাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) আমার জন্যে বৈধ করা হয়েছে, আমার জন্য যমীনকে পবিত্র ও সিজদার ক্ষেত্রে পরিণত করা হয়েছে, আমি সমগ্র সৃষ্টির নিকট প্রেরিত হয়েছি এবং আমার মাধ্যমে নবুওয়ত-পরম্পরা শেষ করা হয়েছে।"[৭]

রসূলুল্লাহ স.-এর অপর একটি মর্যাদা হলো, তাঁকে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসা ঈমানের দাবি। যে ব্যক্তির মধ্যে রসূলের ভালোবাসা থাকবে না, সে মুমিন হতে পারবে না, এমনকি তাঁর প্রতি নিজের জীবনের চেয়েও অধিক অনুরাগ থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে, النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ "নবী মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়েও ঘনিষ্ঠতর।"[৮]

আনাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা সন্তান ও সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হবো।"[৯]

সাহাবীদের চোখে রসূলুল্লাহ স. ছিলেন যাবতীয় মানবীয় ও নৈতিক গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এক অনুপম ব্যক্তিত্ব। সা'দ ইবনু হিশাম ইব্‌ন আমির রা. বলেন, "আমি

"যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার ওপর দশটি রহমত নাযিল করবেন, তার দশটি গুনাহ মুছে দিবেন এবং তাকে দশটি মর্যাদায় উন্নীত করবেন।"
- ইমাম আন-সানাঈ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : সিফাতুস সলাত, অনুচ্ছেদ : আল-ফাদলু ফিসসলাতি আলান-নাবিয়্যি সঃ, হালব : মাকতাবাতুল মাতবু'আতিল ইসলামিয়া, ১৪০৬ হি., খ. ১, পৃ. ৩৮৫, হাদীস নং-১২২০, আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী এর মতে হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح) *সহীহ ও যঈফ সুনানুন নাসাঈ*, হাদীস নং-১২৯৭।

৭. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মাসাজিদ ও মাওয়াদিউস সলাত, কায়রো : মাকাতাবাহ আল-কুদসী, ১৩৬৭ হি., খ. ২, পৃ. ৬৪, হাদীস নং-১১৯৫।
فُضِّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ

৮. আল-কুরআন, ৩৩ : ৬।

৯. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : হুব্বুর রসূলি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মিনাল ঈমান, বৈরূত : দারু ইব্‌ন কাছীর, ১৪০৭হি., খ. ১, পৃ. ১০, হাদীস নং-১৫।
عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

আয়িশা রা.-এর কাছে এসে বললাম, আমাকে রসূলুল্লাহ স.-এর চরিত্র সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, তাঁর চরিত্র তো আল-কুরআনই। তুমি কি আল্লাহর এই বাণী পড়নি- "আর নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত।"[১০] সাধারণত একজন মানুষের চরিত্র সম্পর্কে তার স্ত্রী-ই সর্বাধিক ভালো জানেন। নিজের আসল চরিত্র অন্যদের কাছে গোপন রাখা সম্ভব হলেও স্ত্রীর কাছে গোপন থাকে না। সে কারণেই হয়তো ঐ ব্যক্তি আয়িশা রা.-কে প্রশ্ন করেছিলেন। উত্তরে আয়িশা রা. বিষয়টি এমনভাবে উপস্থাপন করলেন যে, যার দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল। তাঁর অনুপম চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে একবার 'আয়িশা রা. বললেন, "তিনি কখনো কোনো সেবককে প্রহার করেননি এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ব্যতীত তিনি কখনো স্বীয় হাত দ্বারা কাউকে প্রহার করেননি।"[১১]

আনাস ইবন মালিক রা. বলেন, "আমি দশ বছর রসূলুল্লাহ স.-এর খিদমত করেছি। আল্লাহর শপথ। এই সময়ের মধ্যে তিনি কখনো 'উহ' (বিরক্তিসূচক শব্দ) করেন নি। কোনো কাজের জন্য কখনো তিনি বলেননি, এই কাজটি কেন করোনি অথবা এই কাজটি কেন করেছো।"[১২]

অবমাননার অর্থ

'অবমাননা' শব্দের অর্থ হলো হেয় করা, অবজ্ঞা করা, অপমান করা, লাঞ্ছনা করা, তুচ্ছ করা, অসম্মান করা ইত্যাদি। আরবীতে এর প্রতিশব্দ হলো- إهانة, تحقير, تعيير , إساءة ইত্যাদি।[১৩] আর এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Defame, Disrespect, Libel ইত্যাদি।[১৪]

---

১০. ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, কায়রো : মু'আস্সাসাতু কুরতুবাহ, তা.বি., খ. ৬, পৃ. ১১১, হাদীস নং-২৪৮৪৪।

عن سعد بن هشام بن عامر قال أتيت عائشة فقلت يا أم المؤمنين أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه و سلم قالت : كان خلقه القرآن أما تقرأ القرآن قول الله عز و جل : وإنك لعلى خلق عظيم.

১১. ইমাম আদ-দারিমী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, অনুচ্ছেদ : ফিল-নাহয়ি আন-যারবিন নিসা, বৈরূত : দারু ইহয়ায়িস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ, তা.বি., খ. ২, পৃ. ১৯৮, হাদীস নং-২২১৮। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ (صحيح) বলেছেন, *আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ*, হাদীস নং-৫০৭।

عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم خادما قط ولا ضرب بيده شيئا قط الا ان يجاهد في سبيل الله.

১২. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ফাযায়িল, অনুচ্ছেদ : কানা রসূলুল্লাহি স. আহসানান নাসি খুলুকান, খ. ৭, পৃ. ৭৩, হাদীস নং-৬১৫১।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ سِنِينَ وَاللَّهِ مَا قَالَ لِى أُفًّا. قَطُّ وَلاَ قَالَ لِى لِشَىْءٍ لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَهَلاَّ فَعَلْتَ كَذَا

১৩. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী]*, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৫, পৃ. ১৫২ ও ২১৩।

অবমাননার বিভিন্ন রূপ

সাধারণত লোকেরা একজন অন্যজনকে বিভিন্ন মন্তব্য ও কর্মের মাধ্যমে অবমাননা করে থাকে। যেমন :

ক. **দৈহিক কাঠামো বর্ণনার মাধ্যমে অবমাননা :** কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তাকে বেঁটে, কুৎসিত, নাক লম্বা, কানে শোনে না, চোখে দেখে না ইত্যাদি দৈহিক ত্রুটির কথা উল্লেখ করে অপমান করা।

খ. **পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে অযাচিত মন্তব্যের মাধ্যমে অবমাননা :** পোশাক-পরিচ্ছদের ত্রুটি (যেমন ছেঁড়া, ঢিলেঢালা, বেঁটে, আঁটসাঁট ও রুচিহীন প্রভৃতি) উল্লেখ করেও অনেক ক্ষেত্রে একে অপরকে অপমান করতে পারে।

গ. **বংশ সম্পর্কে বিভিন্ন কটূক্তির মাধ্যমে অবমাননা :** কেউ যদি কাউকে তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বলে, অমুকের বংশ নীচ বা ইতর অথবা অমুক অজ্ঞাত বংশের, তবে এটাও সম্মান নষ্ট করার শামিল। কারণ ইসলামে নিজেকে উচ্চ বংশীয় এবং অন্যকে নিম্ন বংশীয় ভাবা জায়িয নেই।

ঘ. **বদ অভ্যাসের কথা উল্লেখ করে অবমাননা :** কেউ যদি কারো কোনো বদ-অভ্যাস ও আচার-আচরণের কথা উল্লেখ করে বলে, অমুক কাপুরুষ, ভীরু, অলস, পেটুক, নির্বোধ, স্ত্রীর কথায় উঠে বসে, পরিণামের কথা ভেবে কাজ করে না ইত্যাদিও মানহানির অন্তর্ভুক্ত।

ঙ. **ইবাদতের ত্রুটি বর্ণনা করে অবমাননা :** কেউ যদি কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার মানসে তার ইবাদতের সমালোচনা করে বলে যে, 'সে ভালো করে নামায পড়তে জানে না' অথবা বলে যে, 'তার হজ্জ হয়নি' ইত্যাদিও অপমান ও অবমাননার পর্যায়ে পড়ে।[১৫]

চ. **পাপের কথা উল্লেখ করে অবমাননা :** যেমন কারো সম্পর্কে বলা যে, অমুক ব্যাভিচারী, অমুক পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, অমুক মদ্যপায়ী, অমুক চোর, অমুকের অন্তর খারাপ ইত্যাদি। এ সকল কথা বলেও একজন অন্যজনের সুনাম ও মর্যাদা বিনষ্ট করতে পারে।[১৬]

ছ. **আচরণ নকল ও অভিনয় করার মাধ্যমে :** কাউকে হেয় করার জন্য তার আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ডের নকল ও অভিনয় করে প্রকাশ করাও অবমাননার পর্যায়ে পড়ে।

---

১৪. Zillur Rahman Siddiqui edited, *Bangla Academy English-Bengali Dictionary,* Editor, , Dhaka : Bangla Accademy, 2004, P. 366; *Oxford Advnced Learner's Dictionary,* English-Bengali-English ,: Oxford Press & Publications, 2009, p. 567.

১৫. সাইয়েদ আব্দুল হাই লাখনোবী, *গীবত,* দিল্লী : তাজ কোম্পানী, তা.বি., পৃ. ৭১।

১৬. প্রাগুক্ত।

জ. **লেখনীর মাধ্যমে অবমাননা :** লেখনী তথা সাংবাদিকতার মাধ্যমে বিভিন্ন অবমাননাকর কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। যেমন কেউ যদি কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সংবাদপত্রে রিপোর্ট প্রকাশ করে কিংবা বই পুস্তকে অপরের দোষ-ত্রুটি তুলে ধরে, তবে তাতেও অবমাননা হয়। কেননা এর দ্বারা অপরের সম্মান ও মর্যাদা বিনষ্ট হয়।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো ছাড়া নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো অবমাননা বলে গণ্য হয় না। যেমন :

১. জনকল্যাণের জন্য সত্য দোষারোপ করা।
২. জনগণের প্রতি সরকারী কর্মচারীর আচরণ সম্পর্কে সৎবিশ্বাসে অভিমত প্রকাশ করা।
৩. যে কোনো জনসমস্যা সম্বন্ধে কোনো ব্যক্তির আচরণ সম্পর্কে সৎবিশ্বাসে অভিমত প্রকাশ করা।
৪. আদালতসমূহের কার্যবিবরণী রিপোর্ট আকারে প্রকাশ করা।
৫. গণ-অনুষ্ঠানের গুণাবলী সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করা।
৬. কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট সৎবিশ্বাসে কারো ভর্ৎসনা করা।
৭. কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট সৎবিশ্বাসে কাউকে অভিযুক্ত করা।
৮. নিজের বা অন্য কারো স্বার্থ রক্ষার্থে সৎবিশ্বাসে কারো প্রতি দোষারোপ করা।
৯. সতর্ককৃত ব্যক্তির কল্যাণার্থে বা গণ-কল্যাণার্থে সতর্কতা অবলম্বন করা।[১৭]

যুগে যুগে রসূলুল্লাহ স.- এর প্রতি অবমাননা ও কটূক্তির ধরন

ইসলাম বিদ্বেষী মুশরিক, ধর্মদ্রোহী ও নাস্তিকরা বিভিন্ন সময়ে মহানবী স. সম্পর্কে কটূক্তি করেছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে রসূলুল্লাহ স. সম্পর্কে কটূক্তিকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ইবনু খাতাল ও ইবনু আবী সারহ্ প্রমুখ। তবে ইবনু আবী সারহ্ পরবর্তীকালে তাওবা করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। অধুনা এ ক্ষেত্রে সোমালীয় বংশোদ্ভূত নারী 'আয়ান হারসি' এবং ইরানের অধিবাসী ইহসান জাম প্রমুখের ভূমিকা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। তা ছাড়া তাদের মতো আরো অনেক ইসলাম বিদ্বেষী ব্যক্তি ও গোষ্ঠী এ হীন কাজে লিপ্ত রয়েছে। যখন-ই তারা নিজেদেরকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে মনে করে এবং যে কোনো প্রতিশোধ ও প্রতিবাদ থেকে নিরাপদ মনে করে, তখন তারা এ ক্ষেত্রে চরম ধৃষ্টতা ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে। উল্লেখ্য যে, তাদের এ প্রগল্‌ভতা ও জঘন্য মিথ্যাচার বর্তমানে মিডিয়ার সুবাদে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ ধৃষ্টতার একটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো।

রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে ধৃষ্টতা প্রদর্শনের রীতি অনেক পুরানো, যার ধারাবাহিকতা অদ্যাবধি বিদ্যমান। নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থসমূহ থেকে জানা যায়, আরবের

---

১৭. গাজী শামসুর রহমান, *মানহানি*, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ২০০৬, পৃ. ১৯ ।

বাইরের কতিপয় লোক রসূলুল্লাহ স.-এর দেহ মোবারক তাঁর রাওযা থেকে তুলে নেয়ার জন্য বারংবার মদীনায় গুপ্ত অভিযান পরিচালনা করেছিল। তাদের পরিকল্পনা ছিল, এ অভিযানে সফলতার মাধ্যমে মুসলমানদের একটি তীর্থস্থানের মালিক হওয়ার স্বপ্নপূরণ করা। ইমাম আয-যাহাবী রহ.(১২৭৫-১৩৪৭ খ্রি.) 'তারিখুল ইসলাম' নামক গ্রন্থে বলেন, সালাহুদ্দীন আল-আইয়ূবী (১১৩৭-১১৯৩ খ্রি.) এমন একটি ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার জন্য প্রাণপণ শপথ নিলেন। তিনি মিসরের গভর্নর সাইফুদ্দৌলা বিন মুনকিজ (১১৩২-১১৯৩ খ্রি.) কে লিখে পাঠালেন, তুমি লুলু আল-হাজিবকে প্রস্তুত করো। তিনি তার সাথে পরামর্শ করলেন। লুলু আল-হাজিব বললো, ঠিক আছে, তাদের সংখ্যা কতো? তিনি বললেন, তিন'শর ওপরে। তবে তারা সকলেই বীরযোদ্ধা। সে তাদের সংখ্যা অনুপাতে রশি নিলো। ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে কতিপয় ধর্মত্যাগী আরব ব্যক্তিও সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিল। মাদীনা থেকে তাদের দূরত্ব ছিল মাত্র একদিনের, এরূপ অবস্থায় লুলু তাদের পেয়ে গেল। তিনি আত্মসমর্পণের জন্য তাদেরকে সম্পদের অফার দিলেন, এতেই কাজ হলো। স্বর্ণের লোভে ধর্মত্যাগী আরব ব্যক্তিরা তার প্রস্তাবে সাড়া দিলো। বিদেশীরা একটি পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নিলো। লুলু নয়জন লোকসহ পায়ে হেঁটে তাদের পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। এর ফলে অভিশপ্তদের বাহুবল ভেঙে যায় আর লুলুর মনোবল বৃদ্ধি পায়। অতঃপর সকলে লুলুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। লুলু তাদেরকে পাকড়াও করে রশিতে বেঁধে কায়রোতে নিয়ে আসেন। অবশেষে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।[১৮]

রসূলুল্লাহ স.-এর অবমাননার বিধান

রসূলুল্লাহ স.-এর কোনো কথা, কাজ বা আচরণ সম্পর্কে অযাচিত মন্তব্য করা, তাঁকে গালমন্দ করা, তাঁকে কোনো খারাপ উপাধি ও নামে (যেমন- প্রতারক, মিথ্যুক, ভণ্ড, সন্ত্রাসী প্রভৃতি) অভিহিত করা, তাঁর প্রদর্শিত দীন বা তাঁর কোনো বাণী নিয়ে উপহাস করা এবং তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক কোনো তুলনা দেয়া বা ছবি নির্মাণ করা প্রভৃতি কুফরী কাজ। যে কোনো মুসলিম এরূপ কাজ করবে, সে মুরতাদ হয়ে যাবে। যদিও সে নিয়মিত সালাত ও সাওম ইত্যাদি আদায় করে থাকে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন,

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ . وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ.

"মুনাফিকরা ভয় করে যে, তাদের বিষয়ে এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হবে, যা তাদের অন্তরের বিষয়গুলো জানিয়ে দেবে। বলো, তোমরা উপহাস করতে থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ বের করবেন, তোমরা যা ভয় করছো। আর যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন করো,

---

১৮. শামসুদ্দীন মুহাম্মদ, আয-যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম,* বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরবী, ১৯৮৭, খ. ৪২, পৃ. ৩৬৪।

অবশ্যই তারা বলবে, আমরা আলাপ ও খেল-তামাশাই করছিলাম। বলো, তা হলে তোমরা কি আল্লাহ এবং তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রসূলকে নিয়েই উপহাস করছিলে? তোমরা ছলনা করো না। এ কাজের মাধ্যমে তোমরা নিঃসন্দেহে তোমাদের ঈমান আনয়নের পর কুফরী করেছো।"[১৯]

এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, তোমরা ঈমান আনয়নের পরে অবশ্যই কুফরী করেছো। এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে জানা যায়, 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাবুক যুদ্ধের সময় কোনো এক মজলিসে জনৈক ব্যক্তি (মুনাফিক) আলিমদের সম্পর্কে মন্তব্য করে যে, আমি আমাদের এই আলিমদের মতো এতটা ভোজনবিলাসী, এতটা মিথ্যাবাদী এবং শত্রুর মোকাবেলায় এতটা কাপুরুষ আর কাউকে দেখিনি। তখন ঐ মজলিসের একজন ব্যক্তি তার এ কটাক্ষ শুনে বললেন, তুমি মিথ্যা বলছো। বরং তুমি একজন মুনাফিক। আমি অবশ্যই তোমার এ বিষয়টি রসূলুল্লাহ স. কে অবহিত করবো। পরবর্তীতে রসূলুল্লাহ স. সংবাদটি জানলেন এবং তখনই উপর্যুক্ত আয়াতটি নাযিল হয়। বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর রা. বলেন, আমি লোকটিকে রসূলুল্লাহ স.-এর উষ্ট্রীর কোমরের রশির সাথে বেঁধে পাথুরে ভূমিতে টানা হেঁচড়া করতে দেখতে পাই। এমন সময় সে আর্তনাদ করে বলছিল যে, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি তো এ কথাগুলো কেবল কৌতুক ও খেলাচ্ছলে বলেছিলাম (অন্তর থেকে বলিনি)। উত্তরে রসূলুল্লাহ স. বললেন, তা হলে কি তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর আয়াত ও রাসূল স. কে নিয়ে উপহাস করছো?[২০]

এ হাদীস থেকে জানা যায়, যারা রসূলুল্লাহ স.-এর জীবদ্দশায় তাঁর ও তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে কটূক্তি করেছিল, তারা শুধু ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান ছিল না; বরং নামধারী মুসলিমও ছিল। যারা কেবল নামায ও রোযা ইত্যাদি পালন করতো না; বরং রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে তাবুকের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিল। রসূলুল্লাহ স. ও সাহাবীগণকে নিয়ে কটাক্ষ করার কারণে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল করে তাদেরকে কাফির বলে ঘোষণা করেন।

---

১৯. আল-কুরআন, ৯ : ৬৪-৬৬।

২০. ইমাম ইব্‌ন কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল 'আজীম*, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি, খ., ২, পৃ. ৪৪৭।

عن عبد الله بن عمر قال : قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المسجد: كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر أنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ الآية.

রসূলুল্লাহ্ স.-এর শানে কটূক্তি করার শাস্তি

যে রসূলুল্লাহ্ স.-এর অবমাননা করবে, সে নিঃসন্দেহে দুনিয়াতে আল্লাহর লানাতপ্রাপ্ত ও আখিরাতে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে । আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا

"নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ তাদের প্রতি দুনিয়া ও আখিরাতে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি।"[২১]

তদুপরি তার সমস্ত নেক আমল বরবাদ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

"আর যে তোমাদের মধ্য থেকে তার দীন থেকে ফিরে যাবে, অতঃপর কাফির অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে, বস্তুত এদের আমলসমূহ দুনিয়া ও আখিরাতে বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তারাই আগুনের অধিবাসী।[২২]

রসূলুল্লাহ্ স. কে অবমাননা করা এবং তাঁকে নিয়ে কোনো রূপ বিদ্রূপ করা তাঁকে মারাত্মক কষ্ট দেয়ার নামান্তর। আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার জনৈক খ্রিস্টান ইসলাম গ্রহণ করলো এবং এরপর সে সূরা আল-বাকারা ও আলে ইমরান শিখলো। সে রসূলুল্লাহ্ স.-এর পক্ষ থেকে চিঠিপত্র লেখালেখির কাজ আঞ্জাম দিতো। কিছুদিন পর সে পুনরায় স্বধর্মে ফিরে গেলো এবং বলতে লাগলো, মুহাম্মদ আমি যা লিখি তাই বলে। এর বাইরে সে আর কিছুই জানে না। এরপর সে মারা গেলো, তখন তার সাথীরা তাকে দাফন করলো, সকালে উঠে দেখলো, তার লাশ বাইরে পড়ে আছে, তখন খ্রিস্টানরা বলতে লাগলো, মুহাম্মদের সাথীরা এই কাজ করেছে; কেননা সে তাদের ধর্ম ত্যাগ করেছিল। তখন তারা আরো গভীর করে কবর খনন করে তাকে আবার দাফন করলো, আবার সকালে উঠে দেখলো, তার লাশ বাইরে পড়ে আছে। তখন তারা এবারও বললো, এটা মুহাম্মদ এবং তার সাথীদের কাজ। কেননা সে তাদের ধর্ম ত্যাগ করে এসেছিল। তখন তারা আবার আরো গভীর করে কবর খনন করলো এবং তাকে দাফন করলো, আবার সকালে উঠে দেখলো, তার লাশ আবার বাইরে পড়ে আছে, তখন তারা বুঝতে সক্ষম হলো, এটা কোনো মানুষের কাজ নয়। এরপর তারা তার লাশ বাইরেই পড়ে থাকতে দিলো।[২৩]

---

২১. আল-কুরআন, ৩৩ : ৫৭।

২২. আল-কুরআন, ২ : ২১৭।

২৩. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : কিতাবুল মানাকিব, অনুচ্ছেদ : 'আলামাতুন নুবুওয়াতি ফিল ইসলাম, বৈরূত : দারু ইব্‌ন কাছীর, ১৪০৭হি., খ. ৩, পৃ. ১৩২৫, হাদীস নং-৩৪২১।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ وَقَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَعَادَ نَصْرَانِيًّا فَكَانَ يَقُولُ مَا يَدْرِي مُحَمَّدٌ إِلاَّ مَا كَتَبْتُ لَهُ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ فَدَفَنُوهُ فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ فَقَالُوا هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا فَأَلْقَوْهُ فَحَفَرُوا لَهُ فَأَعْمَقُوا فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে জানা যায় যে, যারা আল্লাহকে নিয়ে অথবা তাঁর আয়াত ও রসূল স. কে নিয়ে কটাক্ষ করে, তারা আর মুসলিম থাকে না; বরং তারা মুরতাদ ও কাফির হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, যারা ইসলাম ত্যাগ করে কাফির হয়ে যায় তাদের শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড, যদি সে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাওবাহ করে ঈমানের পথে ফিরে না আসে। রসূলুল্লাহ স. বলেন, "যে ব্যক্তি তার দীন (ইসলামকে) পরিবর্তন করলো, তাকে তোমরা হত্যা করো।"[২৪]

এ হাদীস থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, মুরতাদের শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। রসূলুল্লাহ স. নিজেও তাঁর জীবদ্দশায় মুরতাদদের ওপর এ শাস্তি কার্যকর করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো :

ইবনু খাতাল নামক জনৈক ব্যক্তি মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। পরবর্তীতে সে মুরতাদ হয়ে আবার মক্কায় ফিরে আসে এবং রসূলুল্লাহ স.-কে নিয়ে নানা কটূক্তি করতে থাকে। আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু খাতালের দুই গায়িকা রসূলুল্লাহ স.-এর বিরুদ্ধে কুৎসামূলক গান গাইতো। এ কারণে রসূলুল্লাহ স. যখন মক্কা বিজয় করলেন, তখন অন্যান্য কাফিরের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হলেও ইবনু খাতাল ও তার মতো আরো কয়েকজন যারা একই ধরনের অপরাধী যেমন তার ঐ দুই দাসী, আব্দুল্লাহ ইবনু সাদ ইবন আবী সার্‌হ, মিকয়াস ইবনু ছুবাবাহ আল-লাইসীকে ক্ষমা করেন নি। বরং তাদের মধ্যে একজন দাসী ব্যতীত সকলকেই হত্যা করা হয়েছিল। দাসীটি পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করত মুক্তিলাভ করেন"।[২৫]

الأَرْضُ قَتَلُوا هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ فَأَلْقَوْهُ فَحَفَرُوا لَهُ وَأَعْمَقُوا لَهُ فِي الأَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوا فَأَصْبَحَ قَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ فَأَلْقَوْهُ.

২৪. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-জিহাদ ওয়াস সিয়ার, অনুচ্ছেদ : লা ইউআযযাবু বি-আযাবিল্লাহ, প্রাগুক্ত, ১৯ তম খণ্ড, পৃ. ২৩৬, হাদীস নং-৫৮৫৯ ২৮৫৪; ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান,* তিরমিযী, অধ্যায় : আন-হুদূদ, অনুচ্ছেদ ; মা জাআ ফিল মুরতাদ্দি, বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, খ. ৪, পৃ. ৪৯, হাদীস নং-১৪৫৮।

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من بدل دينه فاقتلوه.

২৫. ইবনু হাজার আসকালানী, *আল-মাতালিবুল 'আলিয়া,* বৈরূত : মুওয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, তা.বি., খ. ১২, পৃ. ২৫৯, হাদীস নং-৪৪২২।

عن أنس ، قال : اسم ابن خطل : عبد الله ، كانت له جاريتان تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم آمنين ، إلا ابن خطل وقينتيه ، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ، ومقيس بن صبابة الليثي، فإنه لم يجعل لهم الأمان فقتلوا كلهم ، إلا إحدى القينتين، فإنها أسلمت.

ইবনু খাতাল বাঁচার জন্য কাবার গিলাফ ধরে ঝুলেছিল। রসূলুল্লাহ স.-কে বিষয়টি অবহিত করা হলো যে, ইবনু খাতাল বাঁচার জন্য কাবার গিলাফ ধরে ঝুলে আছে। রসূলুল্লাহ স. তাকে ঐ অবস্থায় হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। আনাস ইবন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশ করে মাত্র মাথায় যে শিরস্ত্রাণ পরা ছিল তা খুললেন, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি এসে বললো, ইবনু খাতাল (বাঁচার জন্য) কাবার গিলাফ ধরে ঝুলে আছে। রসূলুল্লাহ স. বললেন, (ঐ অবস্থায়ই) তাকে হত্যা করো।[২৬]

রসূলুল্লাহ স.-কে নিয়ে কটাক্ষ ও বিদ্রূপ করার কারণে একজন সাহাবী তার নিজ দাসীকেও হত্যা করেন। রসূলুল্লাহ্ স. এ সংবাদ জেনে খুশি হন এবং উক্ত মহিলার রক্তকে মূল্যহীন বলে ঘোষণা করেন। ঘটনাটি হলো- ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক অন্ধ ব্যক্তির একজন উম্মু ওয়ালাদ (এমন দাসী, যার গর্ভে মালিকের সন্তান জন্মগ্রহণ করে) ছিলো। ঐ দাসী রসূলুল্লাহ স.-কে নিয়ে অবিবেচকের মতো কটূক্তি করতো। অন্ধ ব্যক্তি তাকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতেন এবং নিবৃত্ত করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু দাসী কিছুতেই বিরত হতো না। এক রাতে দাসীটি রসূলুল্লাহ্ স.-কে নিয়ে কটূক্তি ও গাল-মন্দ করতে লাগলো। তখন লোকটি একটি কোদাল দিয়ে তার পেটে আঘাত করলো এবং তাকে হত্যা করলো। এ অবস্থায় তার একটি সন্তান তার দুপায়ের মাঝখানে পড়ে গেলো এবং রক্তে ভিজে গেলো। সকাল বেলা রসূলুল্লাহ্ স.-এর কাছে বিষয়টি জানানো হলে তিনি লোকদের জড়ো করলেন এবং ঘোষণা দিলেন, আল্লাহর কসম! যে ব্যক্তি আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ করেছে সে যেন অবশ্যই দাঁড়ায়। তার প্রতি আমারও একটি হক রয়েছে। তখন অন্ধ লোকটি কাঁপতে কাঁপতে মানুষের সারি ভেদ করে রসূলুল্লাহ্ স.-এর নিকট গিয়ে বসে পড়লো। অতঃপর লোকটি বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ! ঐ ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটি আমিই। আমার দাসীটি আপনাকে গালি-গালাজ করতো এবং অযথা তর্কে লিপ্ত হতো। আমি তাকে বারণ করলেও সে নিবৃত্ত হতো না। তার থেকে আমার মুক্তোর মতো দু'টি ছেলে রয়েছে। তার সাথে আমার দীর্ঘ দিনের সুসম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু গত রাতে সে যখন আপনাকে গালমন্দ করতে লাগলো আমি তখন তাকে একটি কোদাল দিয়ে পেটে আঘাত

---

২৬. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ,* অধ্যায় ; আল-হাজ্জ, অনুচ্ছেদ : জাওয়াযি দুখূলি মাক্কাতা বিগাইরি ইহরাম, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৫৫, হাদীস নং-১৭৪৯; ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ,* প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১১১, হাদীস নং-৩৩৭৪।

عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال : اقتلوه.

করি। ফলে সে মৃত্যু বরণ করে। রসূলুল্লাহ স. উপস্থিত লোকদের বললেন, তোমরা সাক্ষী থাকো! তার রক্ত মূল্যহীন ঘোষণা করা হলো।"[২৭]

রসূলুল্লাহ স. মক্কা বিজয়ের পর কতিপয় কবিকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। তারা রসূলুল্লাহ স.-কে গাল-মন্দ ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কবিতা আবৃত্তি করতো। তাদের বেশিরভাগ লোককেই হত্যা করা হয় এবং কিছু লোক পালিয়ে যায়। রসূলুল্লাহ স. তাদের ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন, তাদের যেখানে পাওয়া যাবে, সেখানেই হত্যা করা হবে। এরূপ একজন কবি হলো কুরাইশ বংশের ইবনুয যিবা'রী। সে রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে চরম শত্রুতা পোষণ করতো। সে ছিল একজন বড় মাপের কবি। সে রসূল স.-এর সমালোচনার সাথে সাথে মুসলিম কবি- হাস্‌সান ইবন ছাবিত, কাব ইবন মালিক রা. প্রমুখের বিরুদ্ধেও সমালোচনামূলক কবিতা আবৃত্তি করতো। এ কারণে তাকে হত্যার নির্দেশ দেয়া হয়। মৃত্যুদণ্ডাদেশ শুনে সে পালিয়ে নাজরান এলাকায় চলে যায়। এরপর সে ইসলাম গ্রহণ করে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট আগমন করে এবং নিজের তাওবা ও ওজর পেশ করে অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতাও আবৃত্তি করে। এতদসত্ত্বেও তার রক্ত বৈধ ঘোষণা করা হয়। অর্থাৎ তাকে হত্যা করার নির্দেশ বলবৎ রাখা হয়। অথচ সে দিন মক্কার সকল অপরাধীর প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। কেবল সে এবং তার মতো যারা রসূলুল্লাহ স.-এর নিন্দা ও কুৎসা রটনার মতো ন্যক্কারজনক কাজে জড়িত ছিল তারা ব্যতীত।[২৮]

---

২৭. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-হুদূদ, অনুচ্ছেদ : আল-হুকমু ফী মান সাব্বান নাবিয়্যা সা., বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি., খ. ২২৬, পৃ. ৪৩৬৩। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ (صحيح) বলেছেন, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনান আবু দাউদ*, হাদীস নং-৪৩৬১

عن ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي –صلى الله عليه وسلم– وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا
تنزجر –قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي –صلى الله عليه وسلم– وتشتمه فأخذ المغول فوضعه في بطنها
واتكأ عليها فقتلها فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله –صلى الله عليه وسلم–
فجمع الناس فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين
يدي النبي –صلى الله عليه وسلم– فقال يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا
تنزجر ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته
في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي –صلى الله عليه وسلم– : ألا اشهدوا أن دمها هدر.

২৮. ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ, *আস-সারিমুল মাসলূল*, বৈরূত : দারু ইব্‌ন হাযম, ১৪১৭ হি., খ. ১, পৃ. ১৪৩; ইব্‌ন সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫৯। মূল বর্ণনাটি নিম্নরূপ

قد ذكر ابن إسحاق قال : فلما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المدينة منصرفا عن الطائف كتب
بجير بن زهير بن أبي سلمى إلى أخيه كعب بن زهير يخبره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال

স্মর্তব্য মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ স. মক্কার কাফির-মুশরিকদেরকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন। যদিও তারা বিলাল রা. কে উত্তপ্ত বালুর ওপর চিৎ করে শুইয়ে রেখে ওপরে পাথর চাপা দিয়ে চরম নির্যাতন করেছিল, আম্মার ইবন ইয়াসির রা. ও তার পরিবারকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিল, সুমাইয়া রা. কে বর্শা দিয়ে লজ্জাস্থানে আঘাত করে হত্যা করেছিলো, এমনকি স্বয়ং রসূলুল্লাহ স.-কে হত্যার উদ্দেশ্যে বাড়ি ঘেরাও করে ফেলেছিলো। সেসব চরম শত্রুকে ক্ষমা করা হলেও যারা রসূলুল্লাহ স. কে নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছে এবং ব্যঙ্গাত্মক কবিতা আবৃত্তি ও গান গেয়েছে তাদের ক্ষমা করা হয়নি; বরং রসূলুল্লাহ স. তাদের প্রত্যেকের নাম ধরে ধরে বলেন যে, তাদেরকে যেখানে পাওয়া যাবে, এমনকি কাবার গিলাফের নিচেও যদি পাওয়া যায়, তবুও তাদেরকে হত্যা করতে হবে। সে দিন রসূলুল্লাহ স. যাদের নাম ধরে হত্যার নির্দেশ জারি করেছিলেন তারা হলো : আবদুল্লাহ ইবন সাদ ইবন আবী সারহ, আবদুল্লাহ ইবন খাতাল, হুওয়াইরিছ ইবন নুকায়য, মিকয়াস ইবন ছুবাবাহ ও বনু তামীম ইবন গালিব গোত্রের একজন। এদের মধ্যে হুওয়াইরিছ ইবন নুকায়যকে আলী রা. হত্যা করেন।[২৯]

ইসলামের সকল ইমাম এ বিষয়ে একমত যে, রসূলুল্লাহ স.-কে তুচ্ছ–তাচ্ছিল্য করা কিংবা গালি-গালাজ করা অথবা কটূক্তি করার শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। নিম্নে এ বিষয়ে বিভিন্ন মাযহাবের মতামত পেশ করা হলো :

রসূলুল্লাহ স.-এর বিরুদ্ধে কটূক্তি ও বিভিন্ন মাযহাব

যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-কে গাল-মন্দ করবে হানাফী মাযহাবের মতে, সে নিঃসন্দেহে মুরতাদ। ইসলামী শরীয়তে মুরতাদের যে বিধান রয়েছে, তার ব্যাপারে সেই বিধান প্রযোজ্য হবে এবং মুরতাদের সাথে যেরূপ আচরণ করা হয়, তার সাথেও সেরূপ আচরণ করা হবে।[৩০]

رجالا بمكة ممن كان يهجوه و يؤذيه و أن من بقي من شعراء قريش عبد الله بن الزبعرى وهبيرة بن أبي وهب قد هربوا في كل وجه ففي هذا بيان أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بقتل من كان يهجوه و يؤذيه بمكة من الشعراء مثل ابن الزبعرى و غيره و مما لا خفاء فيه أن ابن الزبعرى إنما ذنبه أنه كان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه و سلم بلسانه فإنه كان من أشعر الناس و كان يهاجي شعراء الإسلام مثل حسان و كعب ابن مالك و ما سوى ذلك من الذنوب قد شركه فيه و أربى عليه عدد كثير من قريش. ثم إن ابن الزبعرى فر إلى نجران ثم قدم على النبي صلى الله عليه و سلم مسلما و له أشعار حسنة في التوبة و الاعتذار فأهدر دمه للسب مع أمانه لجميع أهل مكة إلا من كان له جرم مثل جرمه و نحو ذلك.

২৯. ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ, *আস-সারিমুল মাসলূল*, প্রাগুক্ত, খ. ১. পৃ. ১৪৭।

৩০. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ.১৬,পৃ.২৮২।

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ফাতাওয়ায়ে শামী'তে উল্লেখ করা হয়েছে, যারা রসূলুল্লাহ স.-কে কটাক্ষ বা গাল-মন্দ করে, তাদের হত্যা করার ব্যাপারে সমস্ত ফকীহগণ একমত। ইমাম মালিক, লাইস, আহমাদ, ইসহাক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আবু হানীফা রাহ. ও তার শিষ্যবর্গ এবং ইমাম ছাওরী ও আওযাঈ রাহ. সহ সকলেই এ মত পোষণ করেন...।[৩১]

প্রখ্যাত ফকীহ কাযী ইয়াদ আল-মালিকী রহ. (১০৮৩-১১৪৯ খ্রি.) বলেন, "উম্মাতের ওলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, রসূলুল্লাহ স.-কে গালি দেয়া বা তাকে অসম্মান করার শাস্তি হচ্ছে হত্যা করা। এ ব্যাপারে ইমামগণের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-কে গালি দেবে বা তাকে অবমাননা করবে সে কাফির এবং তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।"[৩২]

শাফিঈ মাযহাবের প্রসিদ্ধ আলিম ইবনুল মুনযির রহ.(৮৫৬-৯৩১ খ্রি.) বলেন, "যে ব্যক্তি সরাসরি রসূলুল্লাহ স.-কে গাল-মন্দ করবে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব এবং এ ব্যাপারে সকলেই একমত।"[৩৩]

মালিকী মাযহাবেও এ কথা বলা হয়েছে, "কোনো মুসলিম যদি রসূলুল্লাহ স. কে কটাক্ষ বা গাল-মন্দ করে তাকে অবশ্যই হত্যা করা হবে, তার তওবা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি কোনো কাফির ঐ একই অপরাধ করে এবং পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করতে চায় সে ক্ষেত্রে দু'টি মত রয়েছে। একটি হলো : সে ইসলাম কবুল করলে ক্ষমা করা হবে। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো, যদি সে নিজে স্বেচ্ছায় ধরা দেয় এবং তাওবা করে। আরেকটি হলো : না! তাকেও ক্ষমা করা হবে না; বরং হত্যা করা হবে।"[৩৪]

শাফিঈ মাযহাবের প্রসিদ্ধ আলিম আবু বাক্র আল-ফারিসী রহ. (মৃ. ৯১৭ খ্রি.) তাঁর 'আল-ইজমা' নামক কিতাবে বলেন, "যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স. কে এমন কোনো গালি দেয়, যাতে অপবাদের বিষয় রয়েছে, তবে সে স্পষ্ট কুফরি করলো। সে তাওবা করা সত্ত্বেও তার হত্যার বিধান রহিত হবে না। কেননা রসূলুল্লাহ স. কে অপবাদ দেয়ার শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড, যা তওবা করা সত্ত্বেও রহিত হয় না"[৩৫]

বর্তমানে এক শ্রেণির চরম ইসলাম বিদ্বেষী লোক বিভিন্ন দেশে রসূলুল্লাহ স. এবং তাঁর স্ত্রী-পরিজন ও সাহাবীগণের ব্যাপারে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নানারূপ কটূক্তি ও

مَنْ سَبَّ الرَّسُوْلَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ مُرْتَدٌّ وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُرْتَدِّ وَيُفْعَلُ بِهِ مَا يُفْعَلُ بِالْمُرْتَدِّ.

৩১. ইবনু 'আবিদীন, *প্রাগুক্ত*, খ. ১৬, পৃ. ২৮৫।

৩২. ইমাম ইব্ন তাইমিয়্যাহ, *আস-সারিমুল মাসলূল*, প্রাগুক্ত, খ. ১. পৃ. ৯।

৩৩. ইবনুল মুনযির, *কিতাবুল ইজমা*, তাবি. খ. ১, পৃ. ৩৫।

৩৪. 'আবদুল ওয়াহ্হাব আছ-ছা'লাবী, *আত-তালকীন ফিল ফিকহিল-মালিকী*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪২৫হি./২০০৪খ্রি., খ. ২, পৃ. ১৯৯।

৩৫. আন-নাবাভী, *আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব*, বৈরূত : দারুল ফিকর, তা.বি., খ. ১৯, পৃ. ৩২৬।

অপপ্রচার চালাচ্ছে, যা সুস্পষ্ট অপবাদের পর্যায়ভুক্ত। ইসলামী শরীয়তে তাদের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এ প্রসঙ্গে ইমাম আল-খাত্তাবী রহ. (৯৩১-৯৯৮ খ্রি.) বলেন, "যারা রসূলুল্লাহ স. কে নিয়ে কটাক্ষ বা গাল-মন্দ করে তাদের হত্যা করা ওয়াজিব। এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত আছে বলে আমার জানা নেই।"[৩৬]

"আল-কাফী ফী ফিকহি আহলিল মাদীনাহ" গ্রন্থে বলা হয়েছে : "যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স. কে গালি-গালাজ করবে, সে মুসলিম হোক বা যিম্মী (অমুসলিম নাগরিক) হোক, তাকে সর্বাবস্থায় হত্যা করা হবে। এ দু'টি মতই ইমাম মালিক রাহ. থেকে ইমাম ইবনুল হাকাম ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।"[৩৭]

মালিকী মাযহাবের অন্য একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ **"আয-যাখীরাহ ফী ফিকহিল মালিকী"**তে বলা হয়েছে, "যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহকে অথবা আল্লাহর রাসূলকে অথবা অন্য কোনো নবী-রাসূলকে গালি দেয় তাকে ইসলামের নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী হত্যা করা হবে। সে যদি তওবা করে, তা সত্ত্বেও তার এই শাস্তি রহিত হবে না।"[৩৮]
ইমাম ইবনু কুদামাহ রহ. (১১৪৬-১২২৩ খ্রি.) বলেন : "যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স. কে গালি দেয় তাকে সর্বাবস্থায় হত্যা করতে হবে।"[৩৯]

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রহ. (১২৬৩-১৩২৮ খ্রি.) বলেন, "ইমাম আহমদ র. একাধিক স্থানে বলেছেন, যে সকল লোক রসূলুল্লাহ স. কে গালি-গালাজ করে অথবা কটাক্ষ করে তারা মুসলমান হোক বা কাফির তাদেরকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। আমি মনে করি তাদেরকে তওবার সুযোগ না দিয়ে হত্যা করা হোক।"[৪০]

ইমাম আহমাদ রাহ.-এর "উসূলুস সুন্নাহ" নামক 'আকীদার গ্রন্থে বলা হয়েছে : "সঠিক সিদ্ধান্ত হলো এই যে, যিন্দীক মুনাফিক এবং যারা রসূলুল্লাহ স. কে অথবা সাহাবীদের গালি দেয় অথবা আল্লাহ, আল্লাহর কিতাব অথবা রসূলুল্লাহ স. কে নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এবং যারা জাদুকর এবং যাদের মুরতাদ হওয়া বারংবার প্রমাণিত এদের সকলের ব্যাপারে ইসলামের বিধান হলো, কোনো প্রকার তওবা করার সুযোগ দেয়া ছাড়াই তাদের হত্যা করতে হবে, যাতে তাদের অন্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং অন্যেরা এ ধরনের অন্যায় করতে সাহস না পায়।"[৪১]

---

৩৬. ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ, *আস-সারিমুল মাসলূল,* প্রাগুক্ত, খ. ১. পৃ. ৯।
৩৭. ইবনু 'আবদিল বার্‌র, *আল-কাফী ফী ফিকহি আহলিল মাদীনাহ,* খ. ২, পৃ. ১০৯১।
৩৮. শিহাবুদ্দীন আহমাদ ইব্‌ন ইদরীস, *আয-যাখীরাহ ফী ফিকহিল মালিকী,* বৈরূত, ১৯৯৪, খ. ১১, পৃ. ৩০২।
৩৯. ইব্‌ন কুদামাহ, *আশ-শারহুল কাবীর,* বৈরূত : দারুল কিতাবুল 'আরাবী, তা.বি., খ. ১০, পৃ. ৬৩৫।
৪০. ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ, *আস-সারিমুল মাসলূল,* প্রাগুক্ত, খ. ১. পৃ. ১০।
৪১. ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, *উসলূস সুন্নাহ,* সৌদীআরব : দারুল মানার, ১৪১১, খ. ১, পৃ. ৪৯২।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানী রাহ. (১৩৩২-১৪২০ হি.) বলেন, শায়খ ইবনু বায রহ. (মৃ. ১৪২০ হি.) বলেছেন, "মানুষ কখনো মুখে অস্বীকার না করেও বিভিন্ন কারণে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে কাফির হয়ে যায়, যার বিস্তারিত বিবরণ আলিমগণ নিজ নিজ কিতাবের 'মুরতাদের বিধান' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। এ জাতীয় বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, ইসলাম নিয়ে অথবা রসূলুল্লাহ স. কে নিয়ে কটাক্ষ করা অথবা আল্লাহ, আল্লাহর রসূল অথবা আল্লাহর কিতাব অথবা আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়তের কোনো বিষয় নিয়ে উপহাস করা। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন, "বলো! তোমরা কি আল্লাহর সাথে এবং তাঁর আয়াত ও রসূলকে নিয়ে উপহাস করছো? তোমরা আর কোনো কৈফিয়ত পেশ করো না। নিশ্চয়ই তোমরা ঈমান আনার পরে কুফরী করেছো।"[৪২]

"আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ" নামক কিতাবে শায়খ মুহাম্মদ ইবন আবদুল ওয়াহ্হাব রাহ.-এর বর্ণিত 'ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ'-এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি আল্লাহর দীনের কোনো বিষয় নিয়ে অথবা সওয়াব বা শাস্তির বিষয় নিয়ে উপহাস ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, সে কাফির হয়ে যায়।"[৪৩]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ কথা জানা যায় যে, যারা আল্লাহর রসূলকে নিয়ে উপহাস করে, কৌতুক করে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করে তাদের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই। কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা তা সুপ্রমাণিত।

রসূলের অবমাননাকারীর তওবা

মানুষ কোনো অন্যায় বা পাপ কাজ করলে তার জন্য তওবার বিধান রয়েছে। কিন্তু রসূলের অবমাননাকারীরা তওবাহ করলে তা গ্রহণ করা হবে কি না- তা নিয়ে ইমামগণের তিনটি অভিমত পাওয়া যায়;

এক. রসূলের অবমাননাকারী মুসলিম হোক বা অমুসলিম তার তওবা গ্রহণযোগ্য হবে না। তাকে হত্যা করা হবে। ইমাম মালিক রাহ. এ রূপ অভিমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, "কোনো মুসলিম যদি রসূলুল্লাহ স. কে কটাক্ষ বা গালমন্দ করে তাকে অবশ্যই হত্যা করা হবে। তার তওবা গ্রহণযোগ্য হবে না।"[৪৪] ইমাম আহমাদ রাহ. থেকেও অনুরূপ একটি মত বর্ণিত রয়েছে। ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহ. বলেন, "ইমাম আহমদ রাহ. একাধিক জায়গায়

---

৪২. মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *হাকীকাতুল ঈমান,* মিসর : মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাহ, তা.বি., খ. ১, পৃ. ৩২।

৪৩. আব্দুর রহমান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু কাসিম, *আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ, মিন আজ্জভীবাতিন নাজদিয়্যাহ,* খ. ২, পৃ. ২৬৬।

৪৪. আবদুল ওয়াহহাব আছ-ছা'লাবী, *আত তালকীন ফিল ফিকহিল মালিকী,* প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৯৯।

বলেছেন, যে সকল লোক রসূলুল্লাহ স. কে গালি-গালাজ করে অথবা কটাক্ষ করে তারা মুসলমান হোক বা কাফির তাদেরকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। আমি মনে করি, তাদেরকে তওবার সুযোগ না দিয়ে হত্যা করা হোক।"[৪৫]

কাযী ইয়াদ আল-মালিকী রাহ. (১০৮৩-১১৪৯ খ্রি.) বলেন, যে সকল লোক রসূলুল্লাহ স. কে গালি-গালাজ করে অথবা কটাক্ষ করে, তারা মুসলমান হোক বা কাফির তাদেরকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে, তাদের তওবা কবুল হবে না। কেননা এটি শুধু রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়।'[৪৬]

দুই. রসূলের অবমাননাকারী যদি মুসলিম হয় তবে তার তওবা গ্রহণযোগ্য হবে, অমুসলিম হলে হত্যা করা হবে । ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফি'ঈ রাহ. প্রমুখ এ অভিমত পোষণ করেন। ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর মতে, রসূলের অবমাননাকারী যদি মুসলিম হয় তবে তার তওবা গ্রহণযোগ্য হবে, তাকে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি দিতে হবে। ইমাম শাফি'ঈ রাহ.-এর মতে, রসূলের অবমাননাকারী যদি মুসলিম হয়, তবে তার তওবা গ্রহণযোগ্য হবে।[৪৭]

তিন. রসূলের অবমাননাকারী যদি অমুসলিম হয়, আর সে ইসলাম কবুল করে, তবে তার তওবা গ্রহণযোগ্য হবে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ইমাম মালিক রাহ. বলেন, "যদি কোনো কাফির ঐ একই অপরাধ করে এবং পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করতে চায়, সে ক্ষেত্রে দু'টি মত রয়েছে। একটি হলো : সে ইসলাম কবুল করলে তাকে ক্ষমা করা হবে। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো, যদি সে নিজে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে এবং তওবা করে। আরেকটি হলো : না! তাকেও ক্ষমা করা হবে না; বরং হত্যা করা হবে।"[৪৮]

তা ছাড়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৪১ নং ধারায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ধর্ম পালন ও সংরক্ষণের অধিকার দেয়া হয়েছে। অন্য কোন ধর্ম বা কোন ধর্মবেত্তা সম্পর্কে কটূক্তি করা সংবিধান পরিপন্থি কাজ।

আমাদের করণীয়

রসূলুল্লাহ স. কে নিয়ে কটাক্ষ ও বিদ্রূপ করার মতো জঘন্য অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির ওপর তার ঈমানের একান্ত দাবি হলো, সে নিজ নিজ সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী এর প্রতিবাদ করবে এবং তা বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সুতরাং এ রূপ অবস্থায় আমাদের করণীয়গুলো হলো:

---

৪৫. ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ, *আস-সারিমুল মাসলূল আ'লা শাতিমির রাসূল*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০।

৪৬. প্রাগুক্ত।

৪৭. প্রাগুক্ত।

৪৮. আবদুল ওয়াহহাব আছ-ছা'লাবী, *আত-তালকীন ফী ফিকহিল মালিকী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৯৯।

এক. প্রতিবাদ করা : আমাদের প্রধান করণীয় হলো : যারা রসূলুল্লাহ স.-এর অবমাননা করে তাদের বিরুদ্ধে সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিবাদ করা। একজন সত্যিকার নবীর অনুসারী মুসলিমের বৈশিষ্ট্য কখনো এমন হতে পারে না যে, সে মহানবীর স. অবমাননার বিষয়টি জানার পরও নিশ্চুপ থাকবে । কেননা এটি একটি মহা অন্যায় কাজ। আর ঈমানের লক্ষণ হলো অন্যায়ের প্রতিবাদ করা।

দুই. শাস্তির ব্যবস্থা করা : মহানবীর স. অবমাননাকারীদের বিচারের মাধ্যমে শাস্তির ব্যবস্থা করা ঈমানের দাবি। একশ্রেণির নামধারী মুসলিম বলে বেড়ায়, এ বিচার আল্লাহ করবেন, অতএব আমাদের কিছুই করার দরকার নেই। ঈমানদার হিসেবে এ ধরনের কথা বলা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা রসূলুল্লাহ স. নিজেই তাকে অবমাননা করার শাস্তি কার্যকর করেছেন এবং সাহাবা কিরাম রা.ও তা বাস্ত বায়ন করেছেন। তাই যে ব্যক্তিই মহানবীর অবমাননা করবে, দুনিয়াতেই বিচারের মাধ্যমে তার শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে অনেক অমুসলিম পণ্ডিত ও তাদের ভাবশিষ্য মুসলিম বুদ্ধিজীবীরাও মুরতাদের শাস্তিকে মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য হুমকি মনে করে। তাদের মতে, বর্তমান সভ্য, সংস্কৃতিমনস্ক ও প্রগতিশীল সমাজে এ আইন চালু হতে পারে না। তাদের কথার উত্তরে সংক্ষেপে এতটুকু বলতে চাই যে, বর্তমানে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, হংকং, বৃটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্স প্রভৃতি উন্নত দেশেই তাদের নিজ নিজ ধর্মের সুরক্ষার জন্য সংবিধানে রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যবস্থা রয়েছে। যদি ধর্মান্তরের কিংবা ধর্মকে কটাক্ষ করার শাস্তি সভ্যতা বিরোধী হতো, তা হলে তারা কেনই বা তাদের সংবিধানে এ আইন সংযোজন করেছে। বর্তমান জগতে তারাই হলো প্রগতির ধ্বজাধারী। অধিকন্তু, এ শাস্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিরোধী নয়; বরং সভ্যতাকে মহিমান্বিতকরণ, মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ পূরণ এবং সুস্থ ও পবিত্র সমাজ বিনির্মাণের জন্য এর প্রয়োজন অপরিসীম।[৪৯]

তিন. জাতিকে সতর্ক করা : মহানবী স. কে অবমাননা করার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে জাতিকে সতর্ক করতে হবে। কেননা জেনে-না জেনে, বুঝে-না বুঝে নানাভাবে মহানবী স.-এর অবমাননা করা হচ্ছে। এর কারণে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসবে। সে জন্য আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত, জাতিকে সতর্ক করা।

চার. ঐক্যবদ্ধ হওয়া : রসূলুল্লাহ স.-এর অবমাননা বন্ধে ঈমানদার ব্যক্তিদের মধ্যে কোনো প্রকার বিরোধ থাকা উচিত নয়। এ বিষয়ে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। নিজেদের মধ্যে কর্মপন্থা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে; কিন্তু রসূলুল্লাহ স.-

---

৪৯. ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন,* ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯, পৃ. ১৮৬-৭।

এর অবমাননার মতো ভয়াবহ অপরাধের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধভাবে কর্মসূচি পালনে কোনো ধরনের হঠকারিতা ও অবিমৃষ্যকারিতা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

পাঁচ. আল্লাহর নিকট বেশি বেশি ক্ষমা চাওয়া : রসূলুল্লাহ স.-এর অবমাননা করার কারণে যে কোনো সময় গোটা জাতির ওপর আল্লাহর গযব নেমে আসতে পারে। সে জন্য আল্লাহর নিকট বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

ছয়. রসূলুল্লাহ স.-এর অবমাননাকারীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা : যারা রসূলুল্লাহ স.-এর অবমাননা করে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

"আর তিনি তো কিতাবে তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করা হচ্ছে এবং সেগুলো নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে, তাহলে তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় নিবিষ্ট হয়, তা না হলে তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদের সকলকে জাহান্নামে একত্রকারী।"[৫০]

সাত. রসূলুল্লাহ স.-এর সম্মান ও মর্যাদা নিশ্চিত করা : রসূলের বিরুদ্ধে কোনো অপপ্রচার এবং তাঁর মর্যাদা হানি করে এমন কোনো কাজ পরিচালিত হলে উম্মতের দায়িত্ব হলো তার সমস্ত শক্তি ও যোগ্যতা দিয়ে তা বন্ধ করতে চেষ্টা করা। মহান আল্লাহ তাঁর সম্মানকে সমুন্নত করেছেন। অতএব, তাঁর যথার্থ সম্মান ও মর্যাদা নিশ্চিত করা উম্মতের প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

আট. রসূলুল্লাহ স.-এর কটূক্তিকারীদের ঘৃণা করা : যারা রসূলকে কটূক্তি করে তাদেরকে রাসূলের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে ঘৃণা করা ঈমানের দাবি। অনেকে রাসূলের উম্মত ও অনুসারী দাবি করে; আবার রসূলুল্লাহ স.-এর অবমাননাকারীদের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখে, এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

নয়. রসূলুল্লাহ স.-এর আদর্শ জাতির সামনে ব্যাপকভাবে তুলে ধরা : রসূলুল্লাহ স. আমাদের প্রিয় নবী। তাঁর উম্মত হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো তাঁর আদর্শ জাতির সামনে তুলে ধরা।

দশ. নিজের অবস্থান সুস্পষ্ট করা : আজকে অনেক মুসলিম নিজের অবস্থান কোন দিকে, তা স্পষ্ট করে না। যেহেতু কিছু লোক রসূলুল্লাহ স.-এর

---

৫০. আল-কুরআন, ৪ : ১৪০।

অবমাননাকারীর পক্ষাবলম্বন করছে, সেহেতু নিজের অবস্থান কোন পক্ষে তা ঘোষণা দিতে হবে। কেননা রসূলুল্লাহ স.-এর অবমাননা হলে কোনো ঈমানদার ব্যক্তির অবস্থান অস্পষ্ট হতে পারে না। যে এমনটি করবে সে মুনাফিক। আল্লাহ তাআলা বলেন,

مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا

"তারা এর মধ্যে দোদুল্যমান, না এদের দিকে আর না ওদের দিকে। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনো তার জন্য কোনো পথ পাবে না।"[৫১]

এগার. সরকারের করণীয় : সরকার রাষ্ট্রের পরিচালক ও অভিভাবক। সরকারের অন্যতম কাজ হলো শিষ্টের লালন এবং দুষ্টের দমন। অতএব, মুসলিম সরকারের দায়িত্ব হলো যারা রসূলের বিরুদ্ধে কটূক্তি করছে, তাদের সবাইকে এবং যারা তাদের সহযোগী তাদেরকে আইনের হাতে ন্যস্ত করা। কোনো ধরনের অজুহাত তৈরি করে প্রকৃত ঘটনাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকা। কুরআন মাজীদে সরকারের দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে,

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

"তারা এমন যাদেরকে আমি যমীনে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে; আর সব কাজের পরিণাম আল্লাহরই অধিকারে।"[৫২]

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, যারা আল্লাহকে অথবা তাঁর রসূল স. কে নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে কিংবা তাঁকে গালমন্দ করে, ইসলামী শরীআহ আইন অনুযায়ী তারা নিঃসন্দেহে মুরতাদ ও কাফির। তাদের একমাত্র শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। এ ব্যাপারে কুরআন-হাদীসের অকাট্য প্রমাণসহ দল-মত নির্বিশেষে সকল ইমাম ঐকমত্য পোষণ করেন। ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ স.-এর জীবদ্দশায় এই অপরাধে তাঁর নির্দেশক্রমে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল। মুসলিম উম্মাহর ঈমান রক্ষার স্বার্থে মুসলিম সরকারকে এ বিষয়ে সমুচিত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর অপরাপর মুসলিম দেশ এ ব্যাপারে সাংবিধানিকভাবে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা বিবেচনায় রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। অন্যান্য ধর্মের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও অধিকার যাতে ক্ষুণ্ন না হয়, সে বিষয়েও তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে।

---

৫১. আল-কুরআন, ৪ : ১৪৩।

৫২. আল-কুরআন, ২২ : ৪১।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৯ সংখ্যা : ৩৫
জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১৩

দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থা : একটি পর্যালোচনা

ড. হাফিজ মুজতাবা রিজা আহমাদ*

[**সারসংক্ষেপ :** *আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড (আইবিবিএল) বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর কর্মসূচি হিসেবে 'পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প' (Rural Development Scheme-RDS) বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র অর্থায়নে এক চমকপ্রদ ও মাইলফলক হিসেবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র অর্থায়ন (মাইক্রোফিন্যান্স্) যে সম্ভব এবং সফল; আর সেই সাথে দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র অর্থায়ন অত্যন্ত কার্যকর, তা আইবিবিএল-এর 'পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প' প্রমাণ করেছে। ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত আইবিবিএল ৬১ টি জেলার ১৫,৫০৭টি গ্রামে ৭,৩৩,৫২০ জন গ্রাহকের মাঝে ৫৬,৮১৪.৯৮ মিলিয়ন (ক্রমপুঞ্জিভূত) টাকা বিনিয়োগ প্রদান করেছে। আইবিবিএল শুধু ক্ষুদ্র অর্থায়নই করে যাচ্ছে না বরং ক্ষুদ্র অর্থায়নের গ্রাহকগণের শিক্ষা, নৈতিকতা ও ধর্মীয় বিষয়ে মানোন্নয়ন, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, বিশুদ্ধ পানি পান, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার ইত্যাদি সমাজসেবামূলক বিষয়েও সহযোগিতা প্রদান করছে। সদস্যগণ কর্মতৎপর হওয়ার ও কর্মসংস্থানের সুযোগ পাওয়ার ফলে প্রতিদিনের খরচ মিটানোর পরও সঞ্চয় গড়ে তুলতে পেরেছেন। সর্বোপরি দরিদ্রতা কমিয়ে আনতে এমনকি অনেকেই সম্পূর্ণ দারিদ্র্য বিমোচনে সক্ষম হয়েছেন। মাঠ জরিপ ও ডাটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থায় যে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন হচ্ছে-এ বিষয়টিই আলোচ্য প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।]*

গবেষণার গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা

আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ সা. কর্তৃক নিষিদ্ধ এবং অর্থনীতিতে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে প্রমাণিত সুদকে বর্জন করে প্রচলিত তথা সুদী ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে এদেশের ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড একটি শরী'আসম্মত ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেছে।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

যার মাধ্যমে লাখো বনী-আদম আল্লাহ তা'আলার এই নিষিদ্ধ বিষয়টিকে পরিহার করার সুযোগ পেয়েছেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা, উদ্যোগ গ্রহণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করে জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের মধ্য দিয়ে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি লাভে নিজেদেরকে সক্ষম করে তুলেছেন। নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক উন্নয়ন বিশেষ করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গৃহায়নের মত খাতেও ক্ষুদ্র অর্থায়নে আইবিবিএল এগিয়ে এসেছে। সঙ্গত কারণেই ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বর্তমান সময়ের এই আলোচিত ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা যৌক্তিক দাবী রাখে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রদানকারী একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা তুলে ধরা;
- আইবিবিএল-এর ক্ষুদ্র অর্থায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের অবস্থান তুলে ধরা;
- আইবিবিএল-এর আরডিএস-এর সেবামূলক খাতে অবদান তুলে ধরা এবং
- আরডিএস-এর ফলাফল ও ভূমিকা উপস্থাপন করা।

তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ

বাংলাদেশের অর্থনীতি ও ক্ষুদ্র অর্থায়ন সংক্রান্ত বই, প্রতিবেদন, সাময়িকী, ইন্টারনেট, মাঠ- জরিপ ইত্যাদি থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

তথ্য বিশ্লেষণ

এই প্রবন্ধে তথ্য বিশ্লেষণে বিভিন্ন গ্রাফ, টেবিল ও চার্ট ব্যবহার করা হয়েছে এবং বিভিন্ন তথ্যের গড় ও পার্থক্যও নির্দেশ করা হয়েছে।

ভূমিকা

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ১৯৮৩ সালের ৩০ মার্চ হতে এ দেশে প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। এ ব্যাংক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদবিহীন ব্যাংক, যা যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি ব্যাংকিং কোম্পানী। ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ শেষে ব্যাংকটির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০,০০০ মিলিয়ন ও ১২,৫০৯.৬৪ মিলিয়ন টাকা। মার্চ ২০১৩ শেষে ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা ২৭৬টিতে এবং মোট জনশক্তির সংখ্যা ১২,১৮৮ জনে দাঁড়ায়। এর মধ্যে রয়েছেন ৫,৩২৮ জন কর্মকর্তা এবং ৪,০৬৯ জন কর্মচারী।[১] ব্যাংকের কার্যক্রম ইসলামী শরী'আহ অনুযায়ী পরিপালন ও বাস্তবায়নের জন্য দেশের

---

[১] http:// www.islamibankbd.com

প্রখ্যাত আলিম, আইনজীবী, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং ব্যাংকারগণকে নিয়ে একটি 'শরী'আহ কাউন্সিল' রয়েছে। ২০১২ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৪১৭,৮৪৪.১৪ মিলিয়ন টাকা এবং বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩৯৯,৯৩০.৮০ মিলিয়ন টাকা।[২] ।

১. আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। এ লক্ষ্যে ব্যাংক পল্লী এলাকায় গরীব ও সম্বলহীন মানুষের জন্য কৃষি খাতে বিনিয়োগ সীমা ৫ হাজার টাকা হতে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত এবং অকৃষিখাতে বিনিয়োগ সীমা ৩০,০০০ টাকা হতে ২ লাখ টাকা নির্ধারণ করেছে। স্বল্প শিক্ষিত বেকার ও কৃষিকর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে কৃষি উৎপাদনে সহায়তা প্রদানের জন্য ব্যাংক কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় পাওয়ার টিলার, পাওয়ার পাম্প এবং শ্যালো টিউবওয়েল ক্রয়ের জন্য সর্বোচ্চ ৭৫,০০০ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ প্রদান করে থাকে। দেশের স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিনা জামানতে ব্যাংক ৫ লাখ টাকা থেকে ২৫ লাখ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ প্রদান করে থাকে।[৩]

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে আইবিবিএল-এর ১৩টি বিশেষায়িত প্রকল্পের মধ্যে সর্বপ্রধান ও সবচেয়ে কার্যকর প্রকল্প হিসেবে এবং ক্ষুদ্র অর্থায়ন বা বিনিয়োগ প্রদানকারী প্রকল্প হিসেবে 'পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প'টি বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রদানে এক চমকপ্রদ ও মাইলফলক হিসেবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মাইক্রোফিন্যান্স্ যে সম্ভব এবং তা দারিদ্র্য বিমোচনে যে অত্যন্ত কার্যকর তা আইবিবিএল-এর 'পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প' প্রমাণ করে।

২. RDS এবং এর সফলতার বিভিন্ন দিক

নিম্নে RDS এবং এর সফলতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হলো

---

[২] *আইবিবিএল এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২*

[৩] *ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যাবলী ২০০৮-২০০৯*, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ৬৯

ক. সারণী-০১ : বিগত পাঁচ বছরের প্রবৃদ্ধির ছক: ২০০৮-২০১২[৪]

মিলিয়ন টাকা

বিবরণ	২০০৮	২০০৯	বৃদ্ধি %	২০১০	বৃদ্ধি %	২০১১	বৃদ্ধি%	২০১২	বৃদ্ধি %
গ্রামের সংখ্যা	১০৬৭৬	১০৭৫১	.৭০	১১৪৮২	৭	১২৮৫৭	১২	১৫৫০৭	২১
কেন্দ্র সংখ্যা	২১১৯৩	২২২৬১	৫	২০৮৩৩	(৬)	২২২০৬	৭	২৪৬২৩	১১
সদস্য (পুরুষ)	৬৯৩২৯	৭৮৭৯৬	১৪	৮৩৮৩১	৬	৯৭৩৯২	১৬	১১৭৩৬৩	২১
সদস্য (নারী)	৫০৮৪১১	৪১৩৬৭৯	(১৯)	৪৪০১১০	৬	৫১১৩১১	১৬	৬১৬১৫৭	২১
মোট সদস্য	৫৭৭৭৪০	৪৯২৪৭৫	(১৫)	৫২৩৯৪১	৬	৬০৮৭০৩	১৬	৭৩৩৫২০	২১
ক্রমপুঞ্জিভূত বিনিয়োগ	১৮৭৬৮.২৭	২৪২৩৮.৬৯	২৯	৩১৮৪৭.৩০	৩১	৪২২৮৫.২৩	৩৩	৫৬৮১৪.৯৮	৩৪
বিনিয়োগ স্থিতি	৩০১১.৭২	৩৭৫২.২০	২৫	৫১১০.০৫	৩৬	৭০৭২.০২	৩৮	১০৩৯০.৭১	৪৭
আদায়ের হার (%)	৯৯	৯৯	-	৯৯.৩৭	-	৯৯.৫৮	-	৯৯.৭২	-
সদস্যদের সঞ্চয়	১১০৮.৬৫	১২৯৫.১২	১৭	১৫৪৪.৭৯	১৯	১৯২৪.৭৪	২৫	২৫২৪.১৪	২৬
টিউবওয়েল বিতরণ	৬৮৪৪	৭৪৭৮	৯	৮২৭৪	১১	৮৯২৬	৮	৯৮৯৮	১১
স্যানিটারী ল্যাট্রিন বিতরণ	৩৮৩৮	৪২৭০	১১	৪৪৭২	৫	৪৭৩১	৬	৫১৭৪	৯
ফিল্ড অফিসার	১৬১৯	১৫১২	(৭)	১৫৯২	৫	১৮০৩	১৩	১৮৭৭	৪

উৎস : আইবিবিএল-এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২

আইবিবিএল-এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের বিগত ৫ বছরের প্রবৃদ্ধি অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। বিগত ৫ বছরের প্রবৃদ্ধি সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১২ সালে RDS-র সর্ব ক্ষেত্রে চমকপ্রদ প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। ২০১১-২০১২ সালে গ্রামের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ২১ ভাগ। একই সময়ে সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে ২১%। অন্যদিকে ২০০৮-২০০৯ সালে পুঞ্জিভুত বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ২৯ ভাগ। সদস্যদের সঞ্চয় সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি পায় ২০১১-১২সালে। এ সময় সঞ্চয়ের প্রবৃদ্ধি ঘটে শতকরা ২৬

---

[৪] *Bangladesh Microfinance Statistics 2011*, Credit and Development Forum (CDF) & Insitute of Microfinance (InM), p. 2-7, আইবিবিএল এর প্রধান কার্যালয়ের আরডিডি থেকে তথ্য সংগৃহীত এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২

ভাগ। ২০১০-১১ সালে টিউবওয়েল ও সেনেটারি লেট্রিনের প্রবৃদ্ধি ঘটে যথাক্রমে ৮% ও ৬%। অন্য দিকে একই সময়ে ফিল্ড অফিসারের প্রবৃদ্ধি ঘটে শতকরা ১৩ ভাগ। তবে ২০০৮-২০০৯ সালে নারী সদস্য সংখ্যার অবনতি ঘটে শতকরা ১৯ ভাগ।

খ. গ্রাকে গ্রাম সংখ্যা বৃদ্ধির ধারা (০১) : ২০০৮-২০১২
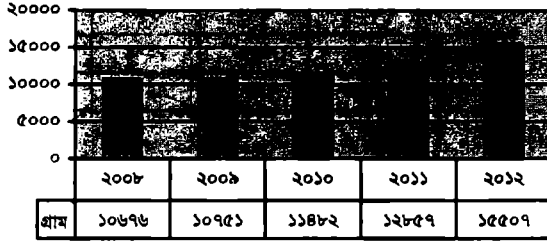
গ. বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রবণতার লেখচিত্র (০২) : ২০০৮-২০১২
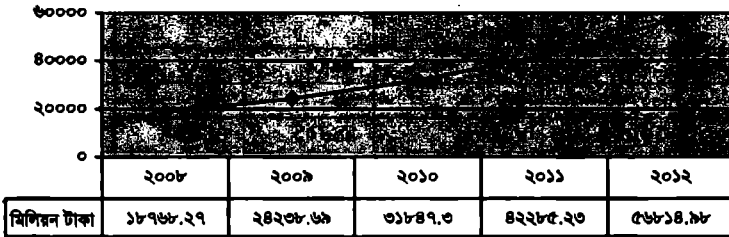
ঘ. সদস্যদের সঞ্চয় প্রবৃদ্ধির লেখচিত্র (০৩) : ২০০৮-২০১২
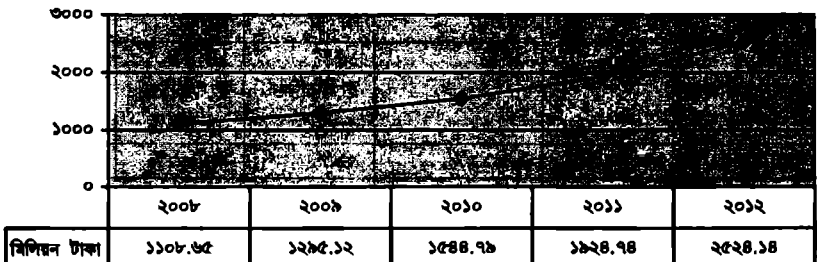
ঙ. টিউবওয়েল ও স্যানিটারি লেট্রিন স্থাপনের প্রবণতার লেখচিত্র (০৪) : ২০০৮-২০১২

	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২
টিউবওয়েল	৬৮৪৪	৭৪৭৮	৮২৭৪	৮৯২৬	৯৮৯৮
স্যানিটারী	৩৮৩৮	৪২৭০	৪৪৭২	৪৭৩১	৫১৭৪
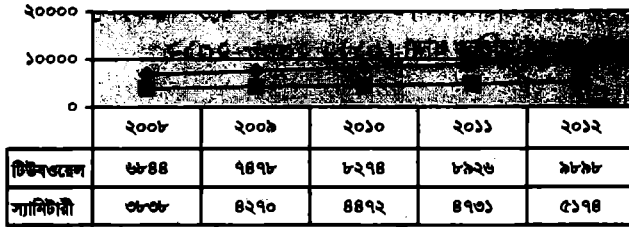
৩. RDS-এর সাথে বাংলাদেশের বৃহৎ MFI-এর তুলনামূলক বিশ্লেষণ

RDS-এর সাথে বাংলাদেশের বৃহৎ মাইক্রোফিন্যান্স্ ইনস্টিটিউশনস্গুলোর (MFI) তুলনামূলক বিশ্লেষণ নিম্নের সারণীতে তুলে ধরা হলো :

সারণী-০৩ : RDS-এর সাথে বাংলাদেশের বৃহৎ MFI-এর তুলনা (৩১-১২-২০১২)[৫]

পারফরমেন্স এরিয়া	RDS	Grameen Bank	BRAC	ASA	Proshika
প্রতিষ্ঠার বছর	১৯৯৫	১৯৮৩	১৯৭২	১৯৭৪	১৯৭৬
জেলা	৬১	৬৪	৬৪	৬৪	৫৫
গ্রাম	১৫৫০৭	৮১৩৮৬	৬৯৪২১	৬৪৪৪৭	২৩৬৫২
শাখা	২০৬	২৫৬৭	২৬৬১	২৯৫৯	২০০
সদস্য (মহিলা)	৬১৬১৫৭	৮০,৯৫,৩৭২	৬০১০০০০	৪৭২৫৫৪১	১০৭৬০০০
সদস্য (পুরুষ)	১১৭৩৬৩	৩,১৩,১৮৯	-	-	-
মোট সদস্য	৭৩৩৫২০	৮৪,০৮,৫৬১	৬০১০০০০	৪৭২৫৫৪১	১০৭৬০০০
বিতরণ (পুঞ্জিভূত)	৫৬৮১৪.৯৮ মি. টা.	৮,৫৩,৮০৯.৯৯ মি. টা.	৫৭২৪১ মি. টা.	৬৪৪৮৬ মি. টা.	৩৮৫২৭ মি. টা.
লাভের (সুদের) হার	১০%	২০%	১৫% ইফেকটিভ ৩০%	১৪.৪% ইফেকটিভ ২৮.৮০%	১৫% ইফেকটিভ ৩০%
আদায় হার	৯৯.৭২%	৯৭.১১%	৯৯%	৯৯.৮০%	৯৪%
মেম্বারশীপ ফি	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য	প্রযোজ্য	প্রযোজ্য	প্রযোজ্য
পাশ বুক ফি	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য	প্রযোজ্য	প্রযোজ্য	প্রযোজ্য

---

[৫] *Bangladesh Microfinance Statistics 2011*, *Ibid*, আইবিবিএল-এর প্রধান কার্যালয়ের আরডিডি থেকে তথ্য সংগৃহীত এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২

উপর্যুক্ত সারণী থেকে জানা যায় যে, ইসলামী ব্যাংক ব্যাংলাদেশ লিমিটেড-এর কার্যক্রম প্রতিষ্ঠার সময়ের দিক থেকে অন্যান্য MFI-এর কার্যক্রমের তুলনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। আইবিবিএল-এর লাভের হারও অধিকাংশ MFI-এর তুলনায় অনেক কম। অন্যান্য MFI তাদের সুদের সাথে বিভিন্ন ধরনের ফি যোগ করেছে; কিন্তু আইবিবিএল-এর এ ধরনের কোন বাড়তি ফি নেই। সুতরাং যে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে লাভের বা সুদের হার কম সেখানে সফলতা আসার সম্ভাবনা রয়েছে। আর তাই ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থা/RDS এর প্রবৃদ্ধি অনেক বেশী। অনুরূপভাবে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার সেবা গ্রহণ করে দরিদ্র জনগণ কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এবং নীতি-নৈতিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের মধ্য দিয়ে দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

০৪. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর দারিদ্র্য বিমোচনমূলক ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার গ্রাহকগণের উপর একটি জরিপ

বাংলাদেশ একটি দরিদ্র জনবহুল দেশ। এ দেশের জনসংখ্যা ১৫.১৬ কোটি (সাময়িক প্রাক্কলন ২০১১-১২)[৬] এবং ৮০ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। এ দেশের জনগণের দরিদ্র অবস্থার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় নিরক্ষরতা, ভূমিহীনতা, বেকারত্ব, অপুষ্টি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগকে। উৎপাদনমূলক সম্পদের মালিকানার অভাব এবং শ্রমিকদের যথার্থ পারিশ্রমিকের অভাবে অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি উন্নতির পথে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। পল্লী এলাকার লোকদের ভূমিহীনতা দারিদ্র্যকে আরো বেগবান করছে। ভূমিহীন লোকগণ শহরে কাজের জন্য এসে বেকারত্বকে বাড়িয়ে তুলছে।

উপর্যুক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত গ্রামীণ জনগণকে সম্পদে পরিণত করার, তাদের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন এবং উৎপাদনমূলক কর্মে তাদের নিয়োজিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন এনজিও, কিছু সরকারী সংস্থা এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তবে এসব সংস্থাগুলোর সবই সুদ নির্ভর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থা চালিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে ইসলাম সুদকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তাই সুদবিহীন ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থা পরিচালনার নিমিত্ত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড 'পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প' (Rural Development Scheme-RDS) এর মাধ্যমে এ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

---

৬. *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১২, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ।

মাঠ-জরিপের উদ্দেশ্য

পর্যবেক্ষণ দল (টার্গেট গ্রুপ) এর নিম্নোক্ত কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করা এই মাঠ-জরিপের উদ্দেশ্য :

ক. টার্গেট গ্রুপের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ;

খ. টার্গেট গ্রুপের আয়-ব্যয়, সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা এবং উৎপাদনমূলক কাজে অংশগ্রহণে বিনিয়োগের প্রভাব মূল্যায়ন এবং

গ. টার্গেট গ্রুপের সমস্যা ও তার সমাধান খুঁজে বের করা।

ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার টার্গেট গ্রুপ

(i) সক্ষম ও পরিশ্রমী দরিদ্র জনগণ যাদের বয়স ১৮-৫০ এর মধ্যে এবং যারা নির্বাচিত এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা;

(ii) এমন কৃষক যাদের সর্বোচ্চ .৫০ একর জমি আছে;

(iii) তালাকপ্রাপ্তা, বিধবা এবং স্বামী পরিত্যাক্তা নারী;

(iv) যে সমস্ত গ্রামীণ কৃষক উৎপাদনমূলক কাজে জড়িত নেই এবং

(v) অর্থের অভাবে যারা নিজেদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারছেন না।

মাঠ-জরিপের প্রস্তাব (হাইপোথিসিস)

উপর্যুক্ত উদ্দেশ্যাবলীর মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা করা হবে যে, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আয়-ব্যয়, জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নতি এবং উৎপাদনমূলক কাজে লক্ষণীয় ভূমিকা রাখছে।

ডাটার উৎস

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর 'পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প' এর গ্রাহকগণের একটি নির্বাচিত অংশ। অসংখ্য গ্রাহক, সময়ের স্বল্পতা এবং গবেষণাকে ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে গ্রাহকগণের একটি নির্বাচিত অংশকে মাঠ-জরিপের ডাটার উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

ডাটা সংগ্রহ

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর 'আরডিএস'-এর নির্বাচিত গ্রাহকগণ থেকে ডাটা সংগ্রহ করা হয়।[৭] সরাসরি প্রশ্নোত্তরকে ডাটা সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। মোট ১০০ জন গ্রাহকের উপর ২৬টি বড় প্রশ্ন ও এর অন্তর্ভুক্ত প্রায় ১০০টি ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে ১৮/১০/২০১০ থেকে ০৩/০১/২০১১ তারিখের মধ্যে ডাটা সংগ্রহের কাজটি সম্পন্ন করা হয়। গ্রাহকগণের অধিকাংশই যেহেতু শুধু

---

৭. নিম্নের সকল তথ্য প্রাইমারী উৎস হিসেবে মাঠ-জরিপ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

স্বাক্ষরজ্ঞানের অধিকারী তাই লিখিত উত্তরের পরিবর্তে শুধু তাদের মৌখিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রাহকগণের প্রতিজন থেকেই ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে এবং তাদের থেকে ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে মতামতও নেয়া হয়েছে। ডাটা সংগ্রহের চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো :

ব্যাংক	জেলা	থানা	কেন্দ্র	উত্তরদাতার সংখ্যা
আইবিবিএল	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ	বেগম রোকেয়া, মা হাওয়া, হযরত আছিয়া, সুমাইয়া, মা ফাতেমা, উম্মে কুলসুম, আয়েশা, মরিয়ম, যয়নব, রাবেয়া বসরী	১০০

মাঠ-জরিপের ফলাফল

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার আওতাধীন গ্রাহকগণের দারিদ্র্য বিমোচনের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করে দেখার লক্ষ্যে এই মাঠ-জরিপ পরিচালিত হয়। এর ফলাফল নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

৪.১ মাঠ-জরিপের অধীন প্রশ্নের উত্তরদাতাগণের মৌলিক বৈশিষ্ট্য

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন শুধু আর্থিক উন্নতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিও দারিদ্র্য বিমোচনের শর্ত, যা তাদের সার্বিক জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের উপর নির্ভরশীল। তাই এই অংশে আর্থ-সামাজিক বিষয়ের নিম্নোক্ত দিকগুলো তুলে ধরা হবে:

৪.১.১ গ্রাহকগণের বয়স

মাঠ-জরিপে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, ১৮ বছর বয়সের কমের দরিদ্র জনগণকে ক্ষুদ্র অর্থায়নের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। টেবিল ৪.১ এ দেখা যায়, গ্রাহকগণের অধিকাংশই (৪৭ %) ১৮-৩০ এর বয়সের মধ্যে। তবে ৩১-৪০ এর মধ্যেও কিছু গ্রাহক রয়েছেন। এই ফলাফলে জানা যাচ্ছে যে, ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রদানকারী (আইবিবিএল) বয়সীদের তুলনায় যুবকদেরকেই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমেও এ ফলাফল তুলে ধরা হলো:

টেবিল ৪.১ গ্রাহকগণের বয়স

বয়স	শতকরা
১৮-৩০	৪৭
৩১-৪০	৩৬
৪০ এর উপর	১৭

উৎস: আইবিবিএল-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার উপর মাঠ-জরিপ ২০১০

চিত্র: ৪.১ গ্রাহকগণের বয়স বিভাজন

৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ০
শতকরা
৪৭% ৩৬% ১৭%
১৮-৩০ ৩১-৪০ ৪০+
বয়স
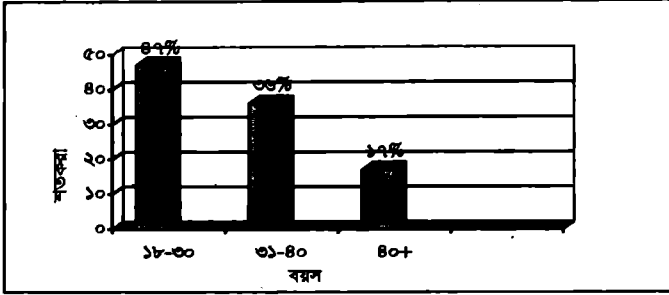
উৎস: টেবিল ৪.১

৪.১.২ উত্তরদাতাগণের বৈবাহিক অবস্থা

টেবিল ৪.২-এ দেখা যায় যে, আইবিবিএল এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার গ্রাহকগণের অধিকাংশই (৮৯%) বিবাহিত, যেখানে মাত্র ৩% অবিবাহিত, বিধবা ৫% এবং স্বামী পরিত্যাক্তা ৩%। এখানে এটাও পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী আইবিবিএল বিবাহিতদেরকেই প্রাধান্য দিচ্ছে যাতে তাদের বিনিয়োগ ঝুঁকিমুক্ত হয় এবং পর্যবেক্ষণ সহজতর হয়।

টেবিল ৪.২ উত্তরদাতাগণের বৈবাহিক অবস্থা

বিবরণ	শতকরা
বিবাহিত	৮৯
অবিবাহিত	৩
বিধবা	৫
স্বামী পরিত্যাক্তা	৩

উৎস : আইবিবিএল-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার উপর মাঠ-জরিপ ২০১০

চিত্র ৪.২: গ্রাহকগণের বৈবাহিক অবস্থার বিভাজন
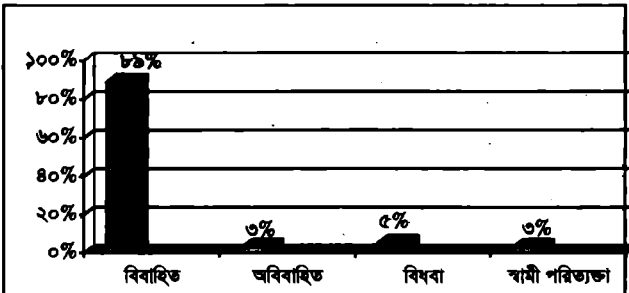
উৎস : টেবিল ৪.২

৪.১.৩ পরিবারের আকার

টেবিল ৪.৩-এ পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার গ্রাহকগণের অধিকাংশ (৮১%) পরিবার বড় আকারের পরিবার, যাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪-৫ জন। তবে ১৯% পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪ এর নিচে, যাদেরকে মধ্যম মানের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

টেবিল ৪.৩ পরিবারের আকার

বিবরণ	শতকরা
বড়	৮১
মধ্যম	১৯

উৎস : আইবিবিএল-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার উপর মাঠ-জরিপ ২০১০

চিত্র : ৪.৩ : গ্রাহকগণের পারিবারিক আকার বিভাজন
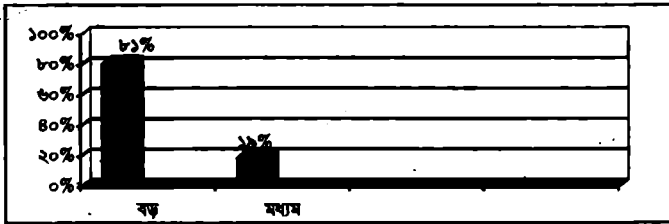
উৎস: টেবিল ৪.৩

৪.১.৪ উত্তরদাতাগণের শিক্ষার অবস্থা

গ্রাহকগণের অধিকাংশই (৩২%) নিরক্ষর, তবে তাদের শুধু স্বাক্ষরজ্ঞান আছে। আর তারাই মৌলিক প্রয়োজন পূরণে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে অবিরাম সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। গ্রাহকগণের খুব অল্প সংখ্যকই (১৬%)এসএসসি পাশ করেছেন যা নিম্নোক্ত চিত্রে ফুটে ওঠে। তবে এই পর্যবেক্ষণে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, আইবিবিএল ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রদান করার পূর্বে গ্রাহকগণকে স্বাক্ষরজ্ঞান শিখিয়ে থাকেন। এটা বিনিয়োগ পাবার অন্যতম শর্ত। নিম্নের টেবিল ও চিত্রে বিষয়টি তুলে ধরা হলো :

টেবিল ৪.৪ উত্তরদাতাগণের শিক্ষা

বিবরণ	শতকরা
অশিক্ষিত, তবে শুধু স্বাক্ষর জানেন	৩২
প্রাথমিক	৩০
৮ম শ্রেণী	২২
এসএসসি	১৬

উৎস : আইবিবিএল-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার উপর মাঠ-জরিপ ২০১০

চিত্র ৪.৪: গ্রাহকগণের শিক্ষার বিভাজন
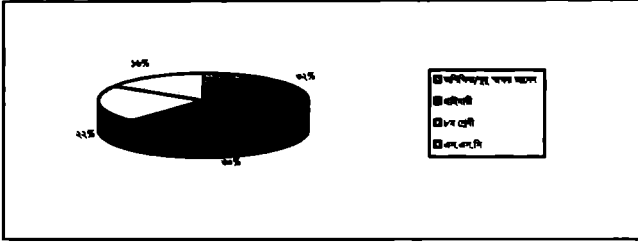
উৎস : টেবিল ৪.৪

৪.১.৫ উত্তরদাতাগণের পেশা

টেবিল ৪.৫-এ পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, গ্রাহকগণের একটি বড় অংশ (২৮%) গৃহিণী, যারা কোন উৎপাদনমূলক কর্মে নিয়োজিত নেই। তবে কিছু সংখ্যক গ্রাহক রয়েছেন যারা বিনিয়োগ গ্রহণ করে ছোট ব্যবসা, গবাদিপশু পালন, হাস-মুরগীর খামার এবং বিভিন্ন রকমের দোকানদারীর মাধ্যমে আয়বর্ধক কাজে জড়িত রয়েছেন।

টেবিল ৪.৫ উত্তরতাদাগণের পেশা

বিবরণ	শতকরা
গৃহিণী	২৮
ছোট ব্যবসা	৩৭
হস্তশিল্পী	১৪
কৃষি	১৩
গাভী পালন	৪
দৈনিক শ্রমিক	৪

উৎস : আইবিবিএল-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার উপর মাঠ-জরিপ ২০১০

চিত্র ৪.৫: গ্রাহকগণের পেশার বিভাজন
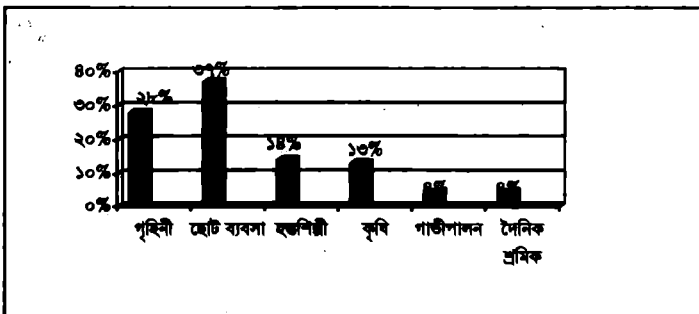
উৎস : টেবিল ৪.৫

৪.১.৬ গ্রাহকগণের জমির পরিমাণ

টেবিল ৪.৬-এ পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থাধীন গ্রাহকগণের অধিকাংশেরই (৫২%) জমি নেই। ৫০ ডেসিম্যালের কম জমি রয়েছে ২৯ শতাংশ গ্রাহকের এবং ৫০ ডেসিম্যালের অধিক ভূমি রয়েছে ১৯% গ্রাহকের।

টেবিল ৪.৬ গ্রাহকগণের জমির পরিমাণ

বিবরণ	শতকরা
জমি নেই	৫২
৫০ ডেসি. এর কম	২৯
৫০ ডেসি. এর বেশী	১৯

উৎস : আইবিবিএল-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার উপর মাঠ-জরিপ ২০১০

চিত্র ৪.৬ : ভূমির পরিমাণে গ্রাহকগণের বিভাজন
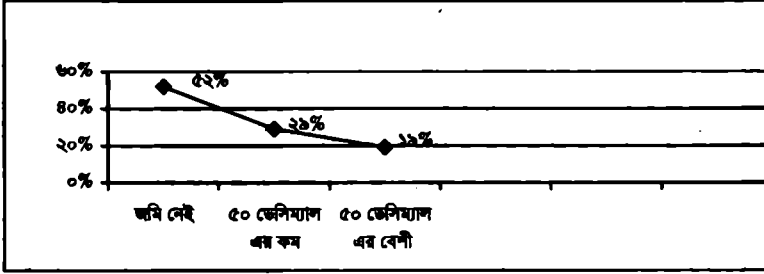
ভূমির পরিমাণ (ডেসিম্যাল)
উৎস: টেবিল ৪.৬

৪.১.৭ ক্ষুদ্র অর্থায়ন বিতরণ এবং গ্রাহক কর্তৃক এর ব্যবহার

ব্যাংক কর্তৃক ক্ষুদ্র অর্থায়ন বিতরণ টেবিল ৪.৭ এ তুলে ধরা হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, ১৯% গ্রাহক ৫,০০০-১০,০০০ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে ১৫,০০০-২০,০০০ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ গ্রহণ করেছেন ৫৩% গ্রাহক। আর ২০,০০০ টাকার উপর বিনিয়োগ গ্রহণ করেছেন ২৭% গ্রাহক। (উল্লেখ্য যে, জরিপকালীন সময়ে একজন গ্রাহক রয়েছেন যিনি তখনও বিনিয়োগ গ্রহণ করেন নি।) আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, গ্রাহকগণ বিনিয়োগ নিয়ে তা কোন না কোন উৎপাদনমূলক খাতে এর ব্যবহার করেছেন।

টেবিল ৪.৭ বিনিয়োগ বিতরণ

বিবরণ (টাকা)	শতকরা
৫,০০০-১০,০০০	১৯
১৫,০০০-২০,০০০	৫৩
২০,০০০ এর উপর	২৭
বিনিয়োগ গ্রহণ করেন নি	০১

উৎস: আইবিবিএল-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার উপর মাঠ-জরিপ ২০১০

চিত্র ৪.৭ বিনিয়োগ পরিমাণে গ্রাহক বিভাজন
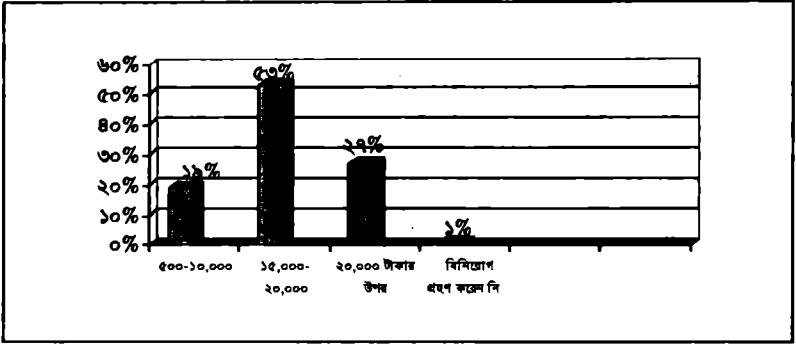
বিনিয়োগ ক্রমবিন্যাস
উৎস : টেবিল ৪.৭

৪.১.৮ উত্তরদাতাগণের নৈতিকতা ও ধর্মীয় বিষয় পরিপালন

আইবিবিএল-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাহকগণকে নীতি-নৈতিকতা ও ধর্মীয় বিষয় পরিপালনে উদ্বুদ্ধ করা হয়। টেবিল ৪.৮-এ পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, অধিকাংশই (১০০%) রোজা নিয়মিত পালন করে থাকেন। অন্যদিকে নিয়মিত সালাত আদায় করেন ৬৪%, কুরআন তেলাওয়াত জানেন ও করেন ৪৬%, কুরআন তেলাওয়াত করতে জানেন না ৫৪%।

টেবিল ৪.৮ নৈতিকতা ও ধর্মীয় বিষয় পরিপালন

বিবরণ	শতকরা
সালাত/নামাজ	৩৪
সাওম/রোজা	১০০
কুরআন তেলাওয়াত জানেন ও করেন	৪৬
কুরআন তেলাওয়াত জানেন না	৫৪

উৎস: আইবিবিএল-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার উপর মাঠ-জরিপ ২০১০

চিত্র ৪.৮: ধর্মীয় বিষয় পরিপালনে গ্রাহক বিভাজন
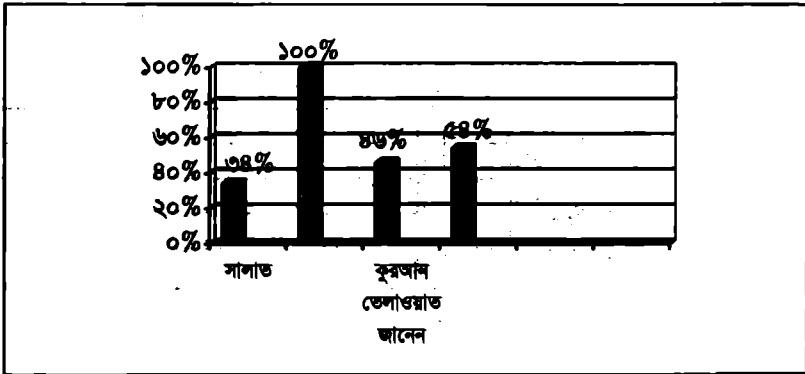
উৎস: টেবিল ৪.৮

৪.২ গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন-যাপনে ক্ষুদ্র অর্থায়নের প্রভাব

ইসলামী ব্যাংকগুলোর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে কিভাবে গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের জীবন-যাপনে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বা কী ধরনের প্রভাব পড়েছে এ বিষয়গুলো নিম্নে তুলে ধরা হবে:

৪.২.১ পারিবারিক আয়ে পরিবর্তন

টেবিল ৪.৯-এ দেখা যাচ্ছে যে, ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থা গ্রহণকারী গ্রাহকগণের বাৎসরিক আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিনিয়োগ গ্রহণের পূর্বে ৩৭% গ্রাহকের বাৎসরিক আয় ছিল ৬০,০০০/- টাকা। আর বিনিয়োগ গ্রহণের পর তাদের বাৎসরিক আয় বেড়ে দাঁড়ায় ৬০,০০১/- থেকে ১,২০,০০০/- টাকার মধ্যে। অন্যদিকে ৫২% গ্রাহকের বাৎসরিক আয় বৃদ্ধি পায় ১,২০,০০১/- থেকে ২,৪০,০০০/- টাকার মধ্যে। আর ১১% গ্রাহকের আয় অপরিবর্তিত থাকে। সুতরাং পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, আইবিবিএল এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম গ্রাহকগণের আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, বিনিয়োগ পাবার পর আয়ের পরিবর্তনের ফলে ৬৫% গ্রাহক তাদের সন্তানদের স্কুলে পড়াতে সক্ষম হয়েছেন।

টেবিল ৪.৯ আয়ে পরিবর্তন

বিবরণ (টাকা)	শতকরা
৬০,০০১-১,২০,০০০.০০	৩৭
১,২০,০০১-২,৪০,০০০.০০	৫২
আয় অপরিবর্তিত (অর্থাৎ ৬০,০০০ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ)	১১

উৎস : আইবিবিএল-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার উপর মাঠ-জরিপ ২০১০

চিত্র ৪.৯: ক্ষুদ্র অর্থায়ন গ্রহণকারী গ্রাহকগণের আয়ে প্রভাব
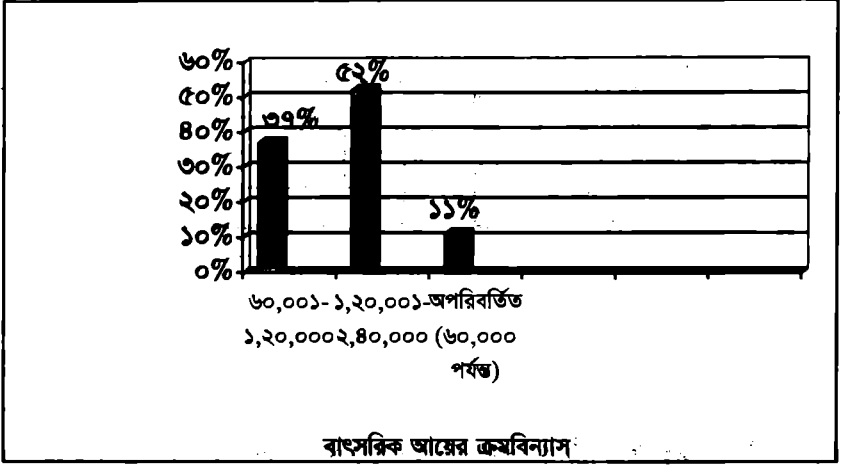
উৎস : টেবিল ৪.৯

৪.২.২ পারিবারিক ব্যয়ে পরিবর্তন

আইবিবিএল-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থায় গ্রাহকগণের পারিবারিক ব্যয়ে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন সূচীত হয়। টেবিল ৪.১০-এ পরিলক্ষিত হয় যে, মাসিক গড়ে সর্বোচ্চ ৫,৫১০.০০ টাকা খাদ্য খরচে পরিবর্তন আসে। ঔষধে পরিবর্তন আসে মাসিক গড়ে ৫২৫.০০ টাকা এবং শিক্ষায় আসে ৬১২.০০ টাকা। পোষাকে খরচ হয় বাৎসরিক গড়ে ২,২৯০.০০ টাকা এবং অন্যান্য খরচ দাঁড়ায় বাৎসরিক গড়ে ২,৩৯০.০০ টাকায়।

টেবিল ৪.১০ পারিবারিক ব্যয়ে পরিবর্তন

বিবরণ(টাকা)	গড় টাকা
খাদ্য খরচ (মাসিক)	৫,৫১০.০০
ঔষধ (মাসিক)	৫২৫.০০
শিক্ষা (মাসিক)	৬১২.০০
পোষাক (বাৎসরিক)	২,২৯০.০০
অন্যান্য (বাৎসরিক)	২,৩৯০.০০

উৎস: আইবিবিএল-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার উপর মাঠ-জরিপ ২০১০

চিত্র ৪.১০: পারিবারিক ব্যয়ে গ্রাহক বিভাজন
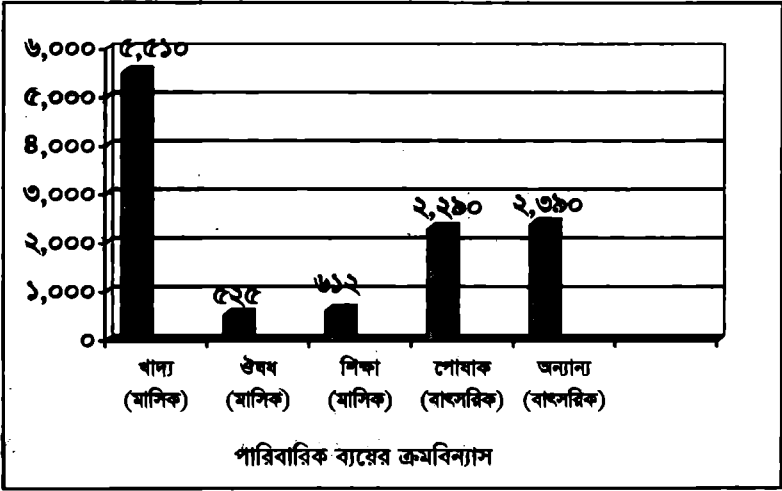
উৎস: টেবিল ৪.১০

৪.২.৩ বিনিয়োগ গ্রহণের পর বাসস্থানের অবস্থার পরিবর্তন

টেবিল ৪.১১ তে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ১৭% গ্রাহকের ঘর ছিল না। কিন্তু বিনিয়োগ গ্রহণের পর তারা ঘর নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। ৫৩% গ্রাহক কাঁচা ঘর থেকে টিনে পরিবর্তন করেছেন এবং ২২% টিন থেকে তাদের গৃহ পাকায় পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন। এতে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়েছে। তবে ৮% গ্রাহক তাদের বাসস্থানের অবস্থার পরিবর্তন করতে পারেন নি।

টেবিল ৪.১১ বাসস্থানের অবস্থার পরিবর্তন

বিবরণ	শতকরা
ঘর ছিল না, ঘর হয়েছে	১৭
কাঁচা থেকে টিনের	৫৩
টিন থেকে পাকা	২২
ঘরের অবস্থা অপরিবর্তিত	০৮

উৎস : আইবিবিএল-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার উপর মাঠ-জরিপ ২০১০

চিত্র ৪.১১: গ্রাহকগণের বাসস্থানের অবস্থা পরিবর্তনের বিভাজন
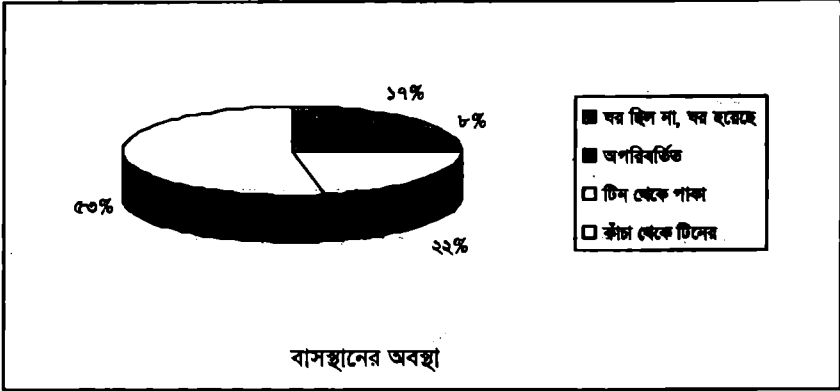
উৎস : টেবিল ৪.১১

৪.২.৪ ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পরিশোধের জন্য অন্যান্য সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ

টেবিল ৪.১২ তে দেখা যাচ্ছে যে, গ্রাহকগণের অধিকাংশই (৮৪%) ইসলামী ব্যাংকের ক্ষুদ্র অর্থায়ন সমন্বয় সাধনের জন্য অন্যান্য সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ করেন নি, যা গ্রাহকগণকে ওভার লোডেড অবস্থা থেকে মুক্ত রাখছে। এতে এ বিষয়টিও পরিষ্কার যে, গ্রাহকগণ বিনিয়োগের পুরো অংশই উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করেছেন। ফলে তাদের কিস্তি পরিশোধে অসুবিধা হচ্ছে না।

টেবিল ৪.১২ অন্যান্য সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ

বিবরণ	শতকরা
ঋণ গ্রহণ করেন নি	৮৪
ঋণ গ্রহণ করেছেন	১৬

উৎস : আইবিবিএল-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার উপর মাঠ-জরিপ ২০১০

চিত্র ৪.১২: অন্যান্য সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণে গ্রাহক বিভাজন
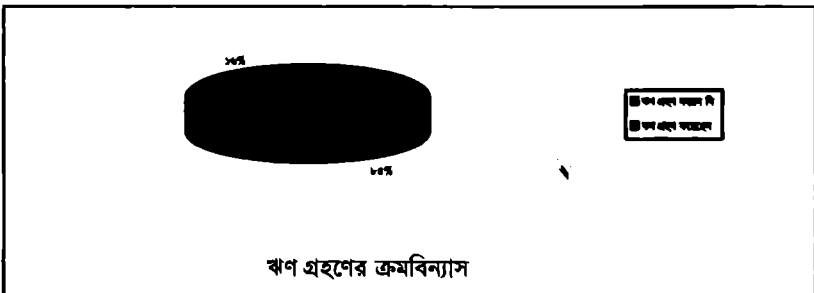
উৎস : টেবিল ৪.১২

৪.২.৫ বিশুদ্ধ পানি পানের প্রবণতা

আইবিবিএল-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থায় গ্রাহকগণের বিশুদ্ধ পানি পানের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। কেননা অধিকাংশ রোগই পানিবাহিত রোগ। তাই সুস্থ থাকার জন্য বিশুদ্ধ পানি পানের বিকল্প নেই। নিম্নে টেবিল ও চিত্রের সাহায্যে বিনিয়োগ গ্রহণের আগে ও পরে পানি পানের অবস্থা তুলে ধরা হলো :

টেবিল ৪.১৩ বিশুদ্ধ পানি পান

বিবরণ	শতকরা
পূর্বে পুকুরের পানি, বর্তমানে টিউবওয়েল	৫৬
এখনও পুকুরের পানি পান	০৬
পূর্ব থেকেই টিউবওয়েল	৩২
বর্তমানে টেপ	০৬

উৎস : আইবিবিএল-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার উপর মাঠ-জরিপ ২০১০

চিত্র ৯.১৩: গ্রাহকগণের বিশুদ্ধ পানি পানের প্রবণতা

উৎস : টেবিল ৪.১৩
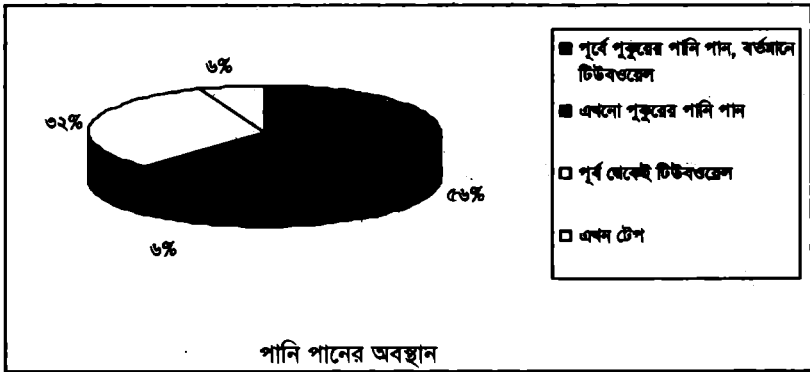
৪.২.৬ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের প্রবণতা

স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা আইবিবিএল-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য। গ্রাহকগণ যাতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করতে পারেন এজন্য ব্যাংক কার্যে হাসানাহ (বিনা লাভে অর্থায়ন) প্রদান করে থাকে। নিম্নে টেবিল ও চিত্রে বিনিয়োগ গ্রহণের আগে ও পরে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের প্রবণতা তুলে ধরা হলো :

টেবিল ৪.১৪ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার

বিবরণ	শতকরা
পূর্বে কাঁচা, বর্তমানে সেনিটারি	৬২
বর্তমানেও কাঁচা	০৯
পূর্ব থেকেই সেনিটারি	২৯

উৎস : আইবিবিএল-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার উপর মাঠ-জরিপ ২০১০

চিত্র ৪.১৪: স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের প্রবণতা

পায়খানা ব্যবহারের অবস্থান
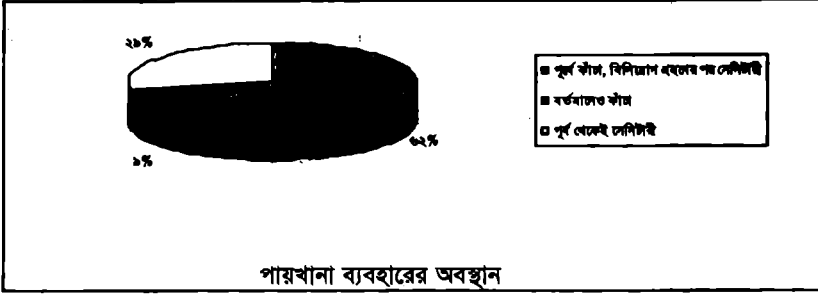
উৎস : টেবিল ৪.১৪

বিনিয়োগ গ্রহণের পূর্বে গ্রাহকগণ অর্থের অভাবে কোন উৎপাদনমূলক কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। বিনিয়োগ গ্রহণোত্তর সময়ে উৎপাদনমূলক কাজে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। টেবিল ৪.১৫ তে পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, ২৮% গ্রাহকের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধি পায় ৪২% গ্রাহকের। যোগাযোগ ও শিক্ষার দক্ষতা বৃদ্ধি পায় যথাক্রমে ১০% ও ১৩% গ্রাহকের। তবে ৭% গ্রাহকের কোন ধরনের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়নি।

টেবিল ৪.১৫ গ্রাহকগণের দক্ষতা বৃদ্ধি

বিবরণ	শতকরা
ব্যবসা	৪২
কারিগরি	২৮
যোগাযোগ	১০
শিক্ষা	১৩
দক্ষতা বৃদ্ধি পায়নি	০৭

উৎস : আইবিবিএল-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার ওপর মাঠ-জরিপ ২০১০

চিত্র ৪.১৫: গ্রাহকগণের দক্ষতাবৃদ্ধির বিভাজন

দক্ষতা বৃদ্ধির ক্রমবিন্যাস
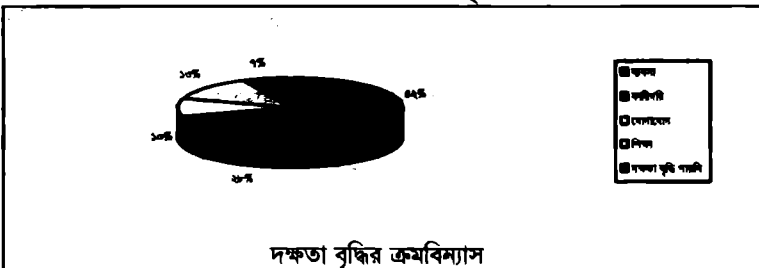
উৎস : টেবিল ৪.১৫

৪.২.৯ কিস্তি পরিশোধে গ্রাহকগণের সক্ষমতা

চিত্র ৪.১৬ তে দেখা যায় যে, আইবিবিএল-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার গ্রাহকগণের সকলেই (১০০%) সময়মত কিস্তি পরিশোধ করছেন। এতে এটা বুঝা যাচ্ছে যে, গ্রাহকগণ বিনিয়োগের টাকা উৎপাদনমুখী খাতে ব্যবহার করেছেন, যাদ্বারা তাদের কিস্তি পরিশোধে সমস্যায় পড়তে হয় না।

চিত্র ৪.১৬: সময়মত কিস্তি পরিশোধের অবস্থান

১০০%
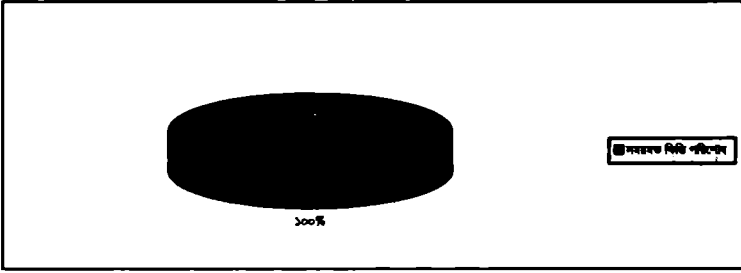
কিস্তি পরিশোধের অবস্থান

*উৎস : আইবিবিএল-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার উপর মাঠ-জরিপ ২০১০

৪.২.১০ গ্রাহকগণের সঞ্চয়ে সক্ষমতা

ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমের গ্রাহকগণ দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটানোর পর কিছু কিছু করে ব্যাংকে সঞ্চয় গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। এতে তাদের অর্থনৈতিক দীনতা হ্রাসের প্রমাণ মিলে। নিম্নোক্ত টেবিল ও চিত্রে বিষয়টি তুলে ধরা হলো :

টেবিল ৪.১৭ গ্রাহকগণের সঞ্চয়

বিবরণ (টাকার পরিমাণ)	শতকরা
২,০০০.০০ পর্যন্ত	২৯
২,০০১-৪,০০০.০০	১৯
৪,০০১-৬,০০০.০০	১৬
৬,০০১-৮,০০০.০০	১৩
৮,০০০.০০ টাকার উপর	২৩

উৎস : আইবিবিএল-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার উপর মাঠ-জরিপ ২০১০

চিত্র ৪.১৭: সঞ্চয়ে গ্রাহক বিভাজন
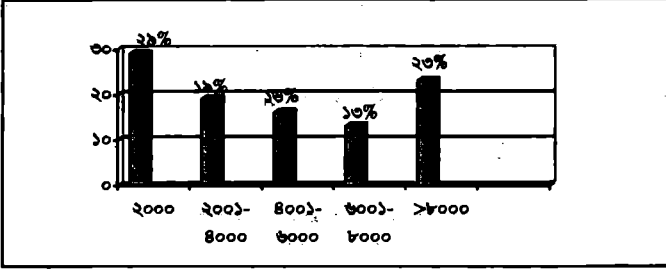
সঞ্চয়ের ক্রমধারা
উৎস : টেবিল ৪.১৭

৪.২.১১ ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিপূর্ণ দারিদ্র বিমোচন

টেবিল ৪.১৮-এ দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থা গ্রহণকারী গ্রাহকগণের ১৩% মনে করছেন বর্তমানে তাদের আর বিনিয়োগ গ্রহণের প্রয়োজন নেই। সুতরাং বলা যায় তাদের দরিদ্রতা দূর হয়েছে। ৭৮ শতাংশ মনে করছেন তাদের দরিদ্রতা কমেছে এবং ৯ শতাংশের মতামত, তাদের অবস্থা এখনো অপরিবর্তিত রয়েছে। তবে তারা ভবিষ্যতে অবস্থা পরিবর্তন হবে বলে আশাবাদী।

টেবিল ৪.১৮ দারিদ্র্য বিমোচন

বিবরণ	শতকরা
দরিদ্রতা দূর হয়েছে	১৩
দরিদ্রতা কমেছে	৭৮
দরিদ্রতা অপরিবর্তিত	০৯

উৎস: আইবিবিএল-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার উপর মাঠ-জরিপ ২০১০

চিত্র ৪.১৮ : দারিদ্র্য বিমোচনে গ্রাহক বিভাজন
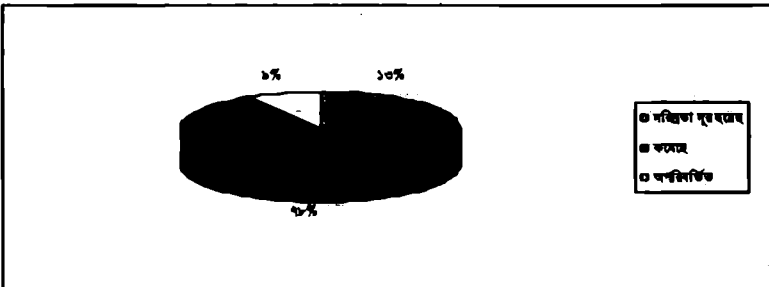
উৎস: টেবিল ৪.১৮

৪.৩ গ্রাহক দৃষ্টিকোণে বড় সমস্যা ও সমাধান

আইবিবিএল-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থা দারিদ্র্য বিমোচনমূলক একটি সফল ব্যবস্থা হলেও গ্রাহক দৃষ্টিকোণে এর কিছু সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে এবং সমস্যাবলী দূরীকরণে তাদের মতামতও ব্যক্ত হয়েছে। কেননা কোন ব্যবস্থাকে আরো কার্যকর ও গতিশীল করতে হলে অবশ্যই সমস্যা চিহ্নিত করে এর সমাধান বের করতে হবে। আলোচ্য ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থায় যে প্রধান সমস্যাবলী তুলে ধরা হয়েছে তা নির্ভর করছে বিনিয়োগের পরিমাণ, প্রশিক্ষণ, কিস্তি শুরুর সময়ের স্বল্পতা, সভা করার জন্য নির্দিষ্ট স্থান না থাকা ইত্যাদি বিষয়ের উপর।

টেবিল ৪.১৯-এ পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, ৬৭% গ্রাহক ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থায় সমস্যা আছে বলে মনে করেন এবং ৩৩% গ্রাহকের দৃষ্টিতে এতে কোন সমস্যা নেই। সমস্যাগুলোর মধ্যে গ্রাহকগণের ৫৭% বিনিয়োগের পরিমাণ কম বলে চিহ্নিত করেছেন, যা উৎপাদনমূলক কাজে অপ্রতুল। কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে বলে ৬০% গ্রাহক মনে করেন। ৪৩% গ্রাহক মনে করেন গেস্টেশন পিরিয়ড অর্থাৎ বিনিয়োগ দেয়ার পর কিস্তি শুরুর সময় যথার্থ নয়। সভা করার জন্য নির্দিষ্ট স্থান না থাকাকে ৫% গ্রাহক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য বিনা লাভে অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা না থাকা এবং অন্যান্য বিষয়কে ২২% গ্রাহক সমস্যা বলে মতামত দিয়েছেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ গঠনের লক্ষ্যে শিশুদের জন্য ইসলামিক স্কুল না থাকাকে ৯% গ্রাহক সমস্যা বলে মতামত প্রদান করেন।

টেবিল ৪.১৯ গ্রাহক কর্তৃক প্রধান সমস্যা চিহ্নিতকরণ

ক্রমিক নং	সমস্যা	শতকরা
১	সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন	৬৭
২	সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন না	৩৩
৩	বিনিয়োগের পরিমাণ কম	৫৭
৪	প্রশিক্ষণের অভাব	৬০
৫	বিনিয়োগ গ্রহণের পর কিস্তি শুরুর সময় খুবই কম	৪৩
৬	সভা করার জন্য নির্দিষ্ট স্থান না থাকা	০৫
৭	শিশুদের জন্য ইসলামিক স্কুল না থাকা	০৯
৮	কর্যে হাসানাহ না থাকা সহ অন্যান্য বিষয়	২২

উৎস : আইবিবিএল-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার উপর মাঠ-জরিপ ২০১০

উপর্যুক্ত সমস্যাবলীর সমাধানে গ্রাহকগণ সুনির্দিষ্ট মতামতও তুলে ধরেছেন। টেবিল ৪.২০-এ দেখা যায় ৫৭% গ্রাহক বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানোর প্রতি মতামত দিয়েছেন, যাতে বিনিয়োগটি উৎপাদনমুখী কর্মে ব্যবহার উপযোগী হয়। ৬০% গ্রাহক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানে মতামত ব্যক্ত করেন, যাতে গ্রাহকগণ বিনিয়োগের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারেন। উৎপাদনমূলক বিনিয়োগে উৎপাদন শুরুর পর কিস্তি নির্ধারণ করা এবং অন্য অবস্থায় কমপক্ষে ৪ সপ্তাহ সময় দেয়ার প্রতি ৪৩% গ্রাহক মতামত প্রদান করেন। ৫% গ্রাহক মনে করেন ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার লক্ষ্য- উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সভা করার জন্য নির্দিষ্ট স্থান থাকা প্রয়োজনীয়। কেননা উক্ত সভায় গ্রাহকগণের সার্বিক মানোন্নয়নে অনেক বিষয় আলোচনা করা হয়। কর্যে হাসানাহসহ অন্যান্য বিষয়ের প্রবর্তনকে ২২% গ্রাহক আবশ্যক বলে মনে করেন।

টেবিল ৪.২০ গ্রাহক কর্তৃক সমস্যাবলীর সমাধান

ক্রমিক নং	সমাধান	শতকরা হার
১	বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানো	৫৭
২	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান	৬০
৩	কিস্তি প্রদান শুরুর সময় বাড়ানো	৪৩
৪	নিয়মিত সভা করার জন্য স্থান নির্দিষ্ট করা	০৫
৫	শিশুদের জন্য ইসলামিক স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা	০৯
৬	কর্যে হাসানাহসহ অন্যান্য বিষয়ের প্রবর্তন করা	২২

উৎস : আইবিবিএল-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার ওপর মাঠ-জরিপ ২০১০

মাঠ-জরিপের সার-সংক্ষেপ

বর্তমানে দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কর্মসূচিগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ বহুল আলোচিত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ দারিদ্র্য দূরীকরণে এ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে অসংখ্য ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা কাজ করছে এবং এই সংস্থাগুলো অতি উচ্চহারে সুদ আরোপের মাধ্যমে ঋণ সুবিধা প্রদান করছে। অন্যদিকে এই সংস্থাগুলোর খুব কমই গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মূল্যবোধ ও নৈতিক উন্নতির প্রতি গুরুত্বারোপ করে থাকে।

মাঠ-জরিপ ১৮/১০/২০১০ থেকে ০৩/০১/২০১১ খৃ. তারিখ পর্যন্ত ব্যাংকের মোট ১০০ জন গ্রাহকের মাঝে পরিচালিত হয়। ২৬টি বড় প্রশ্ন ও এর অন্তর্ভুক্ত প্রায় ১০০টি ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক ডাটা সংগ্রহ করা হয়। এই মাঠ-জরিপে গ্রাহকগণের বয়স, বৈবাহিক অবস্থা, পরিবারের আকার, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, জমির পরিমাণ, বিনিয়োগের পরিমাণ, পারিবারিক আয়ের পথ, বিনিয়োগ গ্রহণের পর আয় বৃদ্ধি, জীবন-যাত্রার মানোন্নয়ন, প্রশিক্ষণ গ্রহণ, বিনিয়োগ পরিশোধ, দারিদ্র্য অবস্থার পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

মাঠ-জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, গ্রাহকগণের অধিকাংশই (৪৭%) ১৮-৩০ বছর বয়সের মধ্যে এবং বৃহৎ অংশই (৮৯%) বিবাহিত। গ্রাহকগণের ৩২ শতাংশ অশিক্ষিত, তবে তারা শুধু স্বাক্ষর জানেন এবং তাদের খুব সামান্যই জমি রয়েছে। তাদের ৫২% এর কোন জমি নেই এবং ৫০ ডেসিম্যাল এর কম জমি রয়েছে ১৯ শতাংশ গ্রাহকের। তাদের মধ্যে ৮১% বড় পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, যাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪-৫ জন। ক্ষুদ্র অর্থায়ন গ্রাহকগণের ২৮% গৃহিণী। যাদের জীবিকা নির্বাহের অন্য কোন উপার্জনক্ষম ব্যবস্থা নেই। আইবিবিএল কৃষি শস্য উৎপাদন, ছোট কৃষি নির্ভর ব্যবসা এবং অকৃষি ব্যবসা তথা দোকানদারি এবং হস্তশিল্পে বিনিয়োগ প্রদান করেছে। গ্রাহকগণের মধ্যে বিতরণকৃত বিনিয়োগের গড় পরিমাণ ১৮,১৩১.০০ টাকা। এই জরিপে দেখা যায়, গ্রাহকগণ উপযুক্ত কোন প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন না। তবে আরেকটি বিষয় পরিলক্ষিত হয়েছে যে, সাপ্তাহিক কেন্দ্র সভায় আলোচনার মাধ্যমে গ্রাহকগণকে নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ, মানুষের উপকার, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ধর্মীয় বিষয়ে সচেতন করে তোলা হয়।

ক্ষুদ্র অর্থায়ন গ্রহণকারী গ্রাহকগণের পারিবারিক আয়, খাদ্য ব্যয় ও মোট ব্যয় পর্যালোচনা করে দেখা যায়, তাদের সংসার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। গবেষণায় পরিলক্ষিত হয় যে, ক্ষুদ্র অর্থায়ন গ্রহণের কারণে তাদের পারিবারিক আয় লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর আয় বৃদ্ধির কারণে গ্রাহকগণের নীতি-নৈতিকতা, পরিবারের সদস্য, পরিবারের আকার ও জমির পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ের উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। আয় বাড়ার কারণে তাদের খাদ্যমান এবং খাদ্যের খরচও পরিবর্তিত হয়েছে।

আইবিবিএল-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থাকে গ্রাহকগণ একটি কার্যকর ও সন্তোষজনক ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এর মাধ্যমে গ্রাহকগণ নিজেদের জীবন-যাত্রার মান উন্নত করতে সক্ষম হয়েছেন। বিনিয়োগকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে শিখেছেন। ফলে বৃদ্ধি পেয়েছে তাদের কর্মদক্ষতা ও অভিজ্ঞতা। সে সাথে উন্নত হয়েছে তাদের নীতি-নৈতিকতা, মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধ। গ্রাহকগণের মধ্যে যারা স্বাক্ষরজ্ঞানহীন ছিলেন তারা অন্তত এই প্রকল্পগুলোর সংস্পর্শে আসার ফলে স্বাক্ষরজ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। সাপ্তাহিক সভায় মাঠকর্মীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ক্ষুদ্র অর্থায়নের গ্রাহকগণ দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম তথা সালাত (নামাজ), সাওম (রোজা), কুরআন অধ্যয়ন ইত্যাদি বিষয় পরিপালনে সচেতন হয়েছেন। স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসেবা, পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও জীবানুমুক্ত পানি পানের ব্যবস্থার প্রতিও ক্ষুদ্র অর্থায়ন গ্রাহকগণের সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়।

আইবিবিএল-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থায় কিছু সমস্যা রয়েছে, যা এ মাঠ জরিপে পরিলক্ষিত হয়। গ্রাহকগণের অধিকাংশের (৫৭%) মতে বিনিয়োগের পরিমাণ যথার্থ নয়, যা দ্বারা আয়ের পথ সুগম হয়। আবার বিনিয়োগ প্রাপ্তির পর তা পরিশোধের সময় তথা কিস্তি পরিশোধের সময় খুব তাড়াতাড়িই শুরু হয়ে যায় বলে এটাকে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ৪৩ শতাংশ গ্রাহক। সাপ্তাহিক সভা করার জন্য নির্দিষ্ট স্থান না থাকাকে ৫ শতাংশ গ্রাহক সমস্যা মনে করেন। ৬০ শতাংশ গ্রাহক তাদের নিজেদের জ্ঞান ও দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক কোন প্রশিক্ষণ না থাকাকে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্যান্য বিপর্যয় মুকাবিলার জন্য কোন ব্যবস্থা না থাকাকে ২২ শতাংশ গ্রাহক সমস্যা মনে করেন।

পরিশেষে বলা যায়, আইবিবিএল-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থায় কিছুটা সমস্যা থাকলেও এই প্রকল্পটি গরিব ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিপুল উপকার সাধন করছে এবং তাদের জীবন ধারায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনয়ন করছে। পল্লী এলাকার অভাবী ও নিঃস্ব জনগণের দরিদ্রতা লাঘবে ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। সুতরাং নিঃস্ব ও দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম।

সুপারিশসমূহ

ক্ষুদ্র অর্থায়ন গ্রাহকগণের প্রায় শতকরা ২৮ ভাগ মহিলা যারা কোন উৎপাদনমূলক বা আয়বর্ধক কাজে জড়িত নয়। এমন জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র অর্থায়নের মাধ্যমে আয়বর্ধক কাজে লাগানো গেলে দারিদ্র্য বিমোচনে ভালো একটা ফলাফল বয়ে আনবে।

দারিদ্র্য বিমোচনে আইবিবিএল-এর আরো বেশী তৎপর হওয়া উচিত। বাংলাদেশে এনজিওগুলো যে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করছে, আইবিবিএল ব্যাংক হয়েও যদি এনজিওর তুলনায় আরো কম লাভে এবং কার্যকর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থা উপহার দিতে পারে, তবে আইবিবিএল-এর সাফল্য রোধ করা যাবে না। তাই আইবিবিএলকে এ লক্ষ্য নিয়েই কাজ করতে হবে।

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য হিসেবে বিধবা ও স্বামীপরিত্যাক্তাদের ক্ষুদ্র অর্থায়নে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত।

গ্রেস পিরিয়ড (বিনিয়োগ পরিশোধের কিস্তি শুরুর আগের সময়) নির্ধারণ করতে হবে বিনিয়োগের ধরন হিসেবে। অর্থাৎ বিনিয়োগ নিয়ে দুধালো গাভী কিনলে পরিবর্তী

সপ্তাহ থেকেই বিনিয়োগ পরিশোধের কিস্তি শুরু হতে পারে। শস্যের জন্য বিনিয়োগ নিলে কোন রকম গ্রেস পিরিয়ড ছাড়াই বায়' সালাম পদ্ধতিতে বিনিয়োগ প্রদান করা যায়। সুতরাং গ্রেস পিরিয়ডটি সকল ক্ষেত্রে ২ সপ্তাহ না ধরে বিনিয়োগের প্রকৃত আয় শুরু হওয়ার উপর নির্ভর করে নির্ধারণ করা উচিত।
বিনিয়োগ প্রধানত আয়বর্ধক খাতে প্রদান করতে হবে এবং যে খাতে প্রদান করা হয় সেখাতেই এর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য তদারকী জোরদার করতে হবে।
ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াতে হবে, যাতে ইনকাম জেনারেট হয় এবং প্রকৃতপক্ষেই কাজ করা সম্ভব হয়। বিনিয়োগ ফেরত দেয়ার সময়ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দুই বা তিন বছর করা উচিত।

আইবিবিএল-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থায় যে মুনাফা হয় তা দিয়ে একটি কল্যাণজনক ফান্ড গড়ে তুলতে হবে, যার মাধ্যমে চরম দরিদ্রদের বিনা লাভে বিনিয়োগ প্রদান করা যায় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে গ্রাহকগণকে পুনরায় বিনিয়োগ প্রদান করা যায়।
নিরক্ষরতা দরিদ্রতার অন্যতম কারণ। তাই ক্ষুদ্র অর্থায়ন গ্রাহকগণের নিরক্ষরতা দূরীকরণে ক্ষুদ্র অর্থায়নের মুনাফার একটি অংশ দিয়ে গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং স্বাস্থ্য সেবার জন্য হেলথ সেন্টার প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা যাচ্ছে।
একজন ক্ষুদ্র অর্থায়ন গ্রাহক তার এলাকার বিভিন্ন ব্যাংক ও এনজিও থেকে ক্ষুদ্র অর্থায়ন গ্রহণ করে ওভার লোডেড হয়ে যাচ্ছে এবং বিনিয়োগ পরিশোধে ব্যর্থ হচ্ছে। সুতরাং এই মারাত্মক সমস্যার সমাধানে বাংলাদেশ ব্যাংক যেমন তার বৃহৎ গ্রাহকগণের মধ্যে CIB প্রতিবেদনের ব্যবস্থা রেখেছে, তেমনি ক্ষুদ্র অর্থায়ন গ্রাহকগণের জন্য 'Microcredit Regulatory Authority-(MRA)'-র মাধ্যমে ID কার্ড বা কোন ধরনের কোড নাম্বার ব্যবহার করা যায়, যাতে একজন গ্রাহক অন্য কোন সংস্থা থেকে বিনিয়োগ পেতে না পারে।

শস্যে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ করা হলে তা অনেক সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগে পতিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং এই ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সকল শস্য গ্রাহককে শস্য বীমার আওতায় আনার সুপারিশ করা যাচ্ছে।
দরিদ্র মানুষের অসংখ্য চাহিদা রয়েছে। তাই ক্ষুদ্র অর্থায়নের অর্থ যেন যথাস্থানে ব্যবহার করা যায়, সেজন্য ক্ষুদ্র অর্থায়নের সাথে যাকাত, সাদাকাহ, ওয়াকফ, দান, কর্যে-হাসানাহ ইত্যাদি প্রদান করা উচিত, যাতে অন্য প্রয়োজনগুলো এর মাধ্যমে পূরণ করা যায়।

উপসংহার

উপসংহারে বলা যায়, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে এর গ্রাহক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। পরিবর্তন এসেছে তাদের জীবন-যাত্রার মানে। গ্রাহকগণের আয়-ব্যয়, শিক্ষা ও ধর্মীয় বিষয় পরিপালনেও পরিবর্তন এসেছে। তাদের মধ্যে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে তারা বিনিয়োগকে উৎপাদনমূলক খাতে খাটাতে সক্ষম হয়েছেন। গড়ে ওঠেছে তাদের মধ্যে নীতি-নৈতিকতা, মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধ। এ ব্যবস্থার ফলে গ্রাহকগণের অনেকেই স্বাক্ষর-জ্ঞান অর্জন করেছেন। আয় বাড়ায় সন্তানদের স্কুলে পড়াতে সক্ষম হয়েছেন অনেকেই। স্বাস্থ্য সচেতনতা, বিশুদ্ধ পানি পান ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে গ্রাহকগণের মধ্যে। ক্ষুদ্র অর্থায়ন গ্রহণের মধ্য দিয়ে গ্রাহকগণ তাদের বাসস্থানের অবস্থা পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছেন। অন্যান্য সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ না করে ওভার লোডেড থেকে মুক্ত হয়ে এবং বিনিয়োগকে যথার্থ স্থানে ব্যবহার করে গ্রাহকগণের অনেকেই দারিদ্র মুক্ত হয়েছেন এবং তাদের বৃহৎ অংশ দরিদ্র্যতা কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন। পরিশেষে উল্লেখ করা যায়, আইবিবিএল-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থা গরীব ও নিঃস্ব জনসমষ্টির বহুমাত্রার কল্যাণ সাধন করেছে এবং তাদের জীবন-যাত্রায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনয়ন করেছে। গ্রামীণ-দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দরিদ্রতা লাঘবে এ ব্যবস্থা কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সে সাথে গোটা সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত রাখতেও অভাবনীয় ভূমিকা পালন করছে। সুতরাং দরিদ্র ও অভাবী জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থার ভূমিকা অপরিসীম।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৯ সংখ্যা : ৩৫
জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১৩

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যবস্থা : একটি আইনী পর্যালোচনা

ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল*

[**সারসংক্ষেপ :** *সকল ধর্মই নারীর প্রতি যে কোন ধরনের সহিংসতার বিরুদ্ধে। নারী যেন কোন সহিংসতার শিকার না হয় তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধর্মসমূহ বিভিন্ন বিধান দিয়েছে, বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অথচ কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মের নামে নারী নির্যাতিত হয়, নারী সহিংসতার শিকার হয়। এর মূলে রয়েছে পুরুষ সমাজের নারীকে বশীভূত রাখার প্রভুসুলভ অসুস্থ মানসিকতা এবং কখনো কখনো ধর্মের অপব্যাখ্যা ও অপব্যবহার। বর্তমান বিশ্বের সর্বত্র নারী নানাভাবে সহিংসতার শিকার। খুন, গুম, অপহরণ, উত্ত্যক্তকরণ, মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন, বৈষম্য, ধর্ষণ প্রভৃতি নারীদের জীবনযাত্রা বিভীষিকাপূর্ণ করে তুলেছে। নারীদের ক্ষেত্রে যদি ইসলামপ্রদত্ত নির্দেশনা ও আইনগুলো সবাই মেনে চলতো তাহলে নারীর প্রতি সহিংসতার মাত্রা এমন প্রকট আকার ধারণ করতো না। এ প্রবন্ধে ধর্মে নারীদের অবস্থা ও অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। ধর্মীয়ভাবে তাদের প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতনের যে কোন সুযোগ নেই তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর ধর্মীয় আইনসমূহ যে একান্তই নারীর প্রতি সংবেদনশীল তা প্রমাণ করা হয়েছে। প্রবন্ধটি ধর্মীয়ভাবে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতা তৈরি করবে, এ বিষয়ক আইনগুলো জানা থাকায় ধর্মের ভিত্তিতে নারীকে নির্যাতনের শিকার বানানোর পথরুদ্ধ করবে এবং ধর্মসমূহের অনুসারীদের মধ্যে সম্প্রীতির মেলবন্ধন তৈরিতে ভূমিকা রাখবে।*]

সহিংসতা

নারী হলো স্ত্রীলোক; রমণী; মহিলা।[১] নির্যাতন হলো পীড়ন; উৎপীড়ন; নিগ্রহ; অত্যাচার; প্রহার; প্রতিহিংসা।[২] কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর যখন অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠী হুমকি বা বল প্রয়োগ করে তাকে নির্যাতন বলে।[৩] নারী নির্যাতন বলতে তাই যে কোনো বয়সের

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯২, পৃ. ৬৭৮।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৫।

৩. প্যাসিফিক এশিয়ান উইমেনস ফোরামের নারী নির্যাতন বিষয়ক আলোচনায় প্রদত্ত নিপীড়ন বা ভায়োলেন্সের সংজ্ঞা। ড. মোঃ নুরুল ইসলাম উদ্ধৃত, *বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা*, ঢাকা : তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ২০০৬, পৃ. ৩৩১।

যে কোনো সম্পর্কের নারীকে নিগ্রহ, অত্যাচার ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা বুঝায়। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Molestation/persecution of a woman[4] Women's Oppression[5] Crudelty to Women.[6] তবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রণীত সকল সংবিধান, দেশে-বিদেশে নারী মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষায় সকল গোষ্ঠী ও আন্দোলনে নারী নির্যাতন বুঝাতে সাধারণভাবে Violence Against Women পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয়েছে।[৭]

সাধারণভাবে নারীর প্রতি সহিংসতা বলতে পুরুষ কর্তৃক নারীদেরকে কোনো না কোনো প্রকারে কষ্ট দেয়াকে বুঝায়। ব্যাপক অর্থে নারীর প্রতি সহিংসতা বলতে নারীদের উপর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক যে কোনো ধরনের নিপীড়ন ও নির্যাতনকে বুঝায়। নারীর যে কোনো অধিকার খর্ব বা হরণ করা এবং কোনো নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো বিষয় চাপিয়ে দেয়া বা কোনো ব্যক্তি গোষ্ঠীর ইচ্ছানুসারে কাজ করতে বাধ্য করাও নারী নির্যাতনের অন্তর্গত। সার্বজনীন নারী অধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘনমূলক অপরাধ নারী নির্যাতন। ধারণাগতভাবে এটি আবার নারীর প্রতি সহিংসতা, নিপীড়ন এবং নারীর সাথে অপব্যবহার ইত্যাদিও বুঝায়। এটি সমাজে মহিলাদের প্রতি অমানবিক ও অনৈতিক আচরণের মধ্যেও প্রকাশ পায়। এর একটি সহজ সংজ্ঞা হলো, "... all forms of cruelty and repression on women of all ages.[৮]

এভাবেও বলা যায়, "These forms of violence frequently occur in private in the home and police and other criminal justice agencies have been reluctant to define such violence as criminal or to respond to such family matter."[9]

সি. বানচের মতে, "নারী নির্যাতন-তা যে ধরনেরই হোক না কেনো-কোনো বিক্ষিপ্ত বিষয় নয় এবং যৌনতা সম্পর্কিতও নয়। এই নির্যাতনের একটা সুনির্দিষ্ট সামাজিক

---

৪. *Bengali-English Dictionary*, Dhaka : Bangla Academy, 1998, p.357

৫. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪. পৃ. ৫২৩।

৬. ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০।

৭. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *সামাজিক সমস্যা ও বিশ্লেষণ কৌশল*, ঢাকা : রোহেল পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭, পৃ. ২৩৬; ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০; জাতিসংঘে প্রণীত সকল বিধি-উপবিধিতে শব্দটির সাধারণ ব্যবহার থেকেও এ সম্পর্কে জানা যায়।

৮. Dr. Mohammad Abdur Rob and Mostaq Mohammad, *Violence against city women*, Dhaka : The Independent, 10 September, 1999, p. 12.

৯. Edllar, Quoted by Abdul Halim, *The Enforcement of Human Rights*, Dhaka, 1995, p. 50.

উদ্দেশ্য আছে এবং তা হচ্ছে নারীর জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও তাদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক করে রাখা।[১০]

নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধে জাতিসংঘ ১৯৭৫ সাল থেকে বিশ্ব জুড়ে কাজ করে চলেছে। প্রতিবছর এ বিষয়ের উপর আলোচনা, বিতর্ক ও সুপারিশ আসছে। এর ২০ বছর পর ১৯৯৪ সালে পৃথিবীর সব দেশের সরকারি-বেসরকারি প্রতিনিধিরা নারী নির্যাতন রোধে একটি অবশ্য পালনীয় বিধি তৈরি করেছেন। এটি হলো বেইজিং প্লাটফর্ম ফর অ্যাকশন। এতে নারী নির্যাতনকে নির্দিষ্ট করে বলা হয়,

"....any action of gender violence that results in or is likely to result in physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion of arbitrary deprivation of liberty whether occurring in public or private life."[১১]

এ সম্মেলনে তৈরি বিধির বিশ্লেষণ ও ঘোষণাটি নিম্নরূপঃ "নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা হলো নারী ও পুরুষের মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে বিরাজমান অসম ক্ষমতা সম্পর্কের একটি বহিঃপ্রকাশ, যা নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও নারীর বিরুদ্ধে পুরুষের বৈষম্য সৃষ্টি করছে। নারীর পরিপূর্ণ অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করছে।[১২]

বেইজিং ঘোষণা অনুযায়ী নারী নির্যাতন বলতে এমন যে কোনো কাজ অথবা আচরণকে বুঝায় যা নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত হয় এবং নারীর শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতি সাধন করে। এছাড়াও এ ধরনের কোনো ক্ষতি সাধনের হুমকি, জোরপূর্বক অথবা খামখেয়ালিভাবে সমাজ অথবা ব্যক্তিগত জীবনে নারীর স্বাধীনতা হরণকেও বুঝায়। নারী নির্যাতন বা নিগ্রহ বলতে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোকে বুঝায় :

১. পরিবারের অভ্যন্তরে শারীরিক, যৌন অথবা মনস্তাত্ত্বিক নির্যাতন যেমন প্রহার, কন্যা শিশুর উপর যৌন নিগ্রহ, যৌতুক সংক্রান্ত নির্যাতন এবং অন্যান্য প্রথাগত যন্ত্রণাদায়ক রীতি, স্বামী ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির যৌনাচরণ এবং নারীকে কোনো কাজে অন্যায়ভাবে ব্যবহারের জন্য নির্যাতন;

২. সম্প্রদায়ের মধ্যে নারীর প্রতি শারীরিক, যৌন অথবা মনস্তাত্ত্বিক নির্যাতন যেমন ধর্ষণ, যৌন নিগ্রহ, যৌন হয়রানি এবং কর্মক্ষেত্রে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভীতিপ্রদর্শন, নারী অপহরণ এবং জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা;

---

১০. সি, বানচ, দুর্বিসহ স্থিতাবস্থা : নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা, উদ্ধৃত: ইউনিসেফ, *বাংলাদেশের শিশু ও তাদের অধিকার*, ঢাকা : ১৯৯৭, পৃ. ৬০।

১১. Quoted by Syed Mehdi Momin, Violence against women and children : searching for causes, *Weekend Independent*, Dhaka, 12 February 1999, p. 4.

১২. জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন – বেইজিং, ঢাকা ১৯৯৫, ড. মোঃ নুরুল ইসলাম উদ্ধৃত, *বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩২।

৩. রাষ্ট্র কর্তৃক শারীরিক, যৌন এবং মনস্তাত্ত্বিক নিগ্রহ তা যেখানেই ঘটুক না কেন। অতএব নারীর প্রতি সহিংস আচরণ বা নারী নির্যাতন বলতে সশস্ত্র সংঘর্ষের সময় হত্যা, পরিকল্পিত ধর্ষণ, যৌন দাসত্ব এবং জোরপূর্বক গর্ভধারণকে বুঝায়।[১৩]

বর্তমানে বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় নারীদের অবস্থান প্রান্তিক। এই প্রান্তিকতা সমাজব্যবস্থার স্তর বিন্যাস কাঠামো থেকে তৈরি হয়েছে। অপরপক্ষে এই প্রান্তিকতার দুটি উপাদান অধস্তনতা এবং নির্যাতন স্তর বিন্যস্ত কাঠামোজনিত কারণে শক্তিশালী হয়েছে। সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের অবস্থা প্রান্তিক হওয়ায় তারা নির্যাতিত। অধস্তনতা এবং নির্যাতন পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে শোষণের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলে। এই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে শোষণ অর্থনৈতিক শ্রেণি কাঠামো এবং পিতৃতন্ত্র পরস্পরকে প্রবিষ্ট করে তোলে। এর ফলে পুরুষরা নারীদের শ্রম লুণ্ঠন করে কিংবা নারীদের শ্রমের অর্থ ভোগ করে। এদিক থেকে নারীগণ ত্রিবিধভাবে শোষিত : (ক) তারা মানুষ হিসেবে পুরুষ কর্তৃক শোষিত, (খ) তারা গৃহবধূ হিসেবে পুরুষ কর্তৃক শোষিত এবং (গ) তারা বেতনভুক্ত হিসেবে শোষিত।[১৪]

১৯৯৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত বিশেষ প্রতিবেদনে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বা নির্যাতনকে সংজ্ঞায়িত করে বলা হয়েছে, নারী নির্যাতন হলো শারীরিক, মানসিক, জোরপূর্বক যৌন সম্পর্ক এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনমূলক ব্যবস্থা।[১৫]

২০০২ সালে ঢাকায় আয়োজিত 'Sub-Regional Expert Group Meeting on Eliminating Violence Against Women' শীর্ষক সম্মেলনে বলা হয়, নারী নির্যাতন শুধু কোনো ব্যক্তির উপর আক্রমণাত্মক বিশেষ কিছু নয় বরং নারীর বিরুদ্ধে মানসিক অথব শারীরিক অথবা স্বাধীনভাবে চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রণ।[১৬] এতে আরো বলা হয়, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নারীরা যখন অন্যের দ্বারা জোরপূর্বক বঞ্চনার সম্মুখীন হয় এবং শারীরিক, যৌন ও মানসিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়, সে পরিস্থিতিকে নারী নির্যাতন বলে।[১৭]

---

১৩. *বেইজিং প্লাটফর্ম ফর অ্যাকশন ১৯৯৫*, ড. মোঃ নুরুল ইসলাম উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩২।

১৪. বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর ও জরিনা রহমান খান, *বাংলাদেশে নারী নির্যাতন*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩, পৃ. ৩।

১৫. "Gender violence is a violence against women that results in physical, mental, sexual coercion of human rights. - United Nation, *The Worlds Women Trends and Statistics, 1995.*

১৬. "Violence against women is not just an assault against an individual but against women's personhood, mental or physical integrity or over freedom of movement on account of their gender."- Jyoti Talukder, *Violence Against Women in Nepal,* Country Report CWCD, Nepal, 1997, p. 1.

১৭. Violence against women is well-defined as any act of gender based violence that results or is likely to result in physical, sexual, psychological harm or suffering to women including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life.-Ibid.

নারী নির্যাতন এমন একটি লিঙ্গীয় অপরাধমূলক কাজ যার ফলে নারীর লিঙ্গীয় অথবা মানসিক ক্ষতি হয় অথবা ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া এ ধরনের দুষ্কর্ম ঘটানোর হুমকি দেয়া, নানা রকম জোর-জবরদস্তি করা, চলাচলে বিঘ্ন ঘটানো নির্যাতনের সংজ্ঞায় পড়ে। এ অপরাধমূলক কর্ম যেখানেই সম্পন্ন হোক না কেন তা নারী নির্যাতন হিসেবেই গণ্য হবে। এ সংজ্ঞানুযায়ী শারীরিক, মানসিক, লিঙ্গীয় নির্যাতন যেমন; যৌতুক অনাদায়ে নির্যাতন, নারী পাচার ও লিঙ্গীয় শোষণ, স্ত্রীকে মারধোর করা, নারী ও কন্যা শিশু ধর্ষণ ও শারীরিক অত্যাচার, যৌন হয়রানি করা ও পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করা ইত্যাদি অপরাধমূলক কাজ হিসেবে চিহ্নিত হবে।

নারী নির্যাতন সমস্যার ব্যাপকতা, গভীরতা ও ভয়াবহতার কথা চিন্তা করে ১৯৯০ সালের ৮ মার্চ থেকে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস, সারা বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই দিবসের প্রেক্ষিতেই আজকের নারী সমাজ তাদের অধিকার ও প্রাপ্তি সম্পর্কে সচেতন হতে শিখেছে। যদিও ধর্ষণ, হত্যা এবং নানা প্রকারের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এখন নিত্যদিনের ঘটনায় রূপান্তরিত হয়েছে। নারীর প্রতি নির্যাতনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা আর একই সাথে প্রশাসনের বিরূপ আচরণ।[১৮]

নারী নির্যাতনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় Status of Women প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

"Violence against women is alarmingly on the increase. The Bangladesh Bureau of Statistics, in a special report in 1993 revealed that death due to unnatural causes (suicides, murder, burn, snake bite, accident and drowning) in almost three times higher for women that pregnancy related causes.[১৯]

নারী নির্যাতন স্থান-কাল-পাত্রভেদে বিভিন্ন ধরন ও প্রকৃতির হয়ে থাকে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটি হলো আঘাত করা বা অপব্যবহার, যৌতুকের জন্য দৈহিক ও মানসিক চাপ, মানসিক নিপীড়ন, অপহরণ, বউ পেটানো, যৌন নিপীড়ন বা অপব্যবহার, জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহ, বিদেশে পাচার, অন্যায়ভাবে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছেদ, যৌন নিপীড়ন ও হয়রানি এবং ধর্ষণ করতে গিয়ে জখম বা মৃত্যু ঘটানো ইত্যাদি অপরাধের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।[২০]

---

১৮. *সম্মিলিত নারী সমাজ*, আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ৮ মার্চ, ১৯৯৭, ড. মোঃ নূরুল ইসলাম উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩।

১৯. *Fifth Five Year Plan 1997-2002*, Government of Bangladesh, Planning Commission, 1998 Ministry of Planning, p.IX, 1-5.

২০. Syed Mehdi Momin, ibid, p. 4.

সনাতন ধর্মে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আইনী ব্যবস্থা

যস্মান্নোদ্বিমতে লোকো লোকোন্নোদ্বিমতে চযঃ। হর্ষামর্ষ ভয়োগ বেগে মুক্তো যঃসচমে প্রিয়[২১] বা যা থেকে কোন প্রাণি উদ্বেগপ্রাপ্ত হয় না এবং যিনি স্বয়ংও কোনো প্রাণী কর্তৃক উত্যক্ত হন না, যিনি হর্ষ, অমর্ষ, ভয় ও উদ্বেগ হতে মুক্ত, তিনি আমার প্রিয়। এ শ্লোক হতে বুঝা যায়, যিনি সত্যই অহিংস ব্রতে স্থিত, তাঁকে কেউ হিংসা করে না। যিনি অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং[২২] বা যিনি সকল প্রাণির প্রতি দ্বেষ রহিত তিনি আমার প্রিয়। তাই কেবল নারীকে নয় বরং জগতের সমস্ত প্রাণির প্রতি ভালবাসা এবং সকলের প্রতি অহিংস আচরণ সনাতন ধর্মের মূল শিক্ষা।

যেখানে নারীগণ সম্মানিত হন সেখানে দেবগণ প্রীত হন। যেখানে নারীগণ সম্মানিত হন না, সেখানে সকল কর্ম নিস্ফল হয়। বহু কল্যাণকামী তপতা, ভ্রাতা, পতি ও দেবর কর্তৃক কন্যা সম্মানীয় ও ভূষণীয়। যেখানে ভগিনী, পত্নী, কন্যা ও ভ্রাতৃবধূ প্রমুখ দুঃখ করেন, সে বংশ শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। যেখানে এরা দুঃখ করেন না, সে বংশ সবসময় উন্নতি করে। মনুসংহিতায় রয়েছে, মন্ত্র নার্যস্ত পূদ্যন্তে রমন্তে তত্র দোতা, যত্রৈতাস্ত ন পূদ্যন্তে সর্বস্ত্রতা ফলাঃ ক্রিয়া।[২৩]

সনাতন ধর্মেও রয়েছে, যারা মারাত্মকভাবে সহিংস আচরণ করেছে তাদের জন্য কঠোর শাস্তি ব্যবস্থা আইনে থাকতে হবে এবং নির্দ্বিধায় সেটি প্রয়োগ করতে হবে। শাস্তি না পেলে অপরাধী আরো বেশি অপরাধ করার সাহস পাবে এবং অন্যরাও একই অপরাধ সংঘটনে উৎসাহিত হবে। মহাভারতে নির্দেশ রয়েছে, ভূমি হরণকারী, গৃহে অগ্নিদানকারী, বিষ প্রয়োগকারী, স্ত্রীর উপর নির্যাতনকারী এবং অপহরণকারীকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। আততায়ীকে নির্বিচারে হত্যা করবে।[২৪] যারা কর্তন করে তাদেরকে রাজা উদ্বেগজনক দণ্ড দ্বারা চিহ্নিত করে নির্বাসিত করবেন।

সনাতন ধর্মে নারীকে নানাভাবে সম্মানিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে, সৃষ্টিকর্তা বিরাট পুরুরু। তিনি আপন সৃষ্টি বৈচিত্রকে উপলব্ধি করার জন্য নারীসত্ত্বা সৃষ্টি করেছেন। তিনি আত্মবেদমগ্র আসীদেক এবং সেংকাময়ত জায়া মে স্যাহ্ অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টিকর্তাই একমাত্র ছিলেন। তিনি কামনা করলেন, আমার জায়া উৎপন্ন হোক। উপনিষদের এ বাণী প্রকৃতপক্ষে নারী জাতির মহিমাকেই নির্দেশ করে।

বিয়ের মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন নারী দাম্পত্য জীবনে আবদ্ধ হয়। এ সময় যে ধর্মীয় অনুশাসনের ভেতর দিয়ে বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয় সেগুলোর মূল্যবোধ ধারণ করলে কোনো স্বামীই স্ত্রীকে নিপীড়ন করতে পারে না। বিয়ের মন্ত্রে বলা হয়, যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম অর্থাৎ তোমার হৃদয় আমার হোক, আমার হৃদয় তোমার হোক।

---

২১. শ্রীগীতা, ১২ : ১৫।
২২. শ্রীগীতা, ১২ : ১৩।
২৩. মনুসংহিতা, ৩ : ৫৪।
২৪. মনুসংহিতা, ৮ : ৩৫০।

বৈদিক মন্ত্রে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলা হয়, হে বধূ! তুমি সুমঙ্গলী হয়ে পতিগৃহে প্রবেশ কর। আমাদের এবং চতুষ্পদ জীবের মঙ্গলবহ হও। তুমি কল্যাণনেত্রা হও, পতির মঙ্গল বিধান কর। গৃহপালিত পশুদের হিতকারিণী হও। তোমার মন সুন্দর হোক, তোমার তেজ শোভন হোক। তুমি বীরজননী, দেবপরায়ণা এবং সকলের সুখদায়িনী হও।

নববধূকে লক্ষ করে আরও বলা হয়েছে, সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব।
ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষুঃ॥[২৫]
অর্থাৎ তুমি শশুরের উপর সম্রাজ্ঞী হও, শাশুরির উপর সম্রাজ্ঞী হও, ননদের উপর সম্রাজ্ঞী হও এবং দেবরের উপরও সম্রাজ্ঞী হও।

মহাভারতে বলা হয়েছে, ভাষা মানুষের অর্ধাংশ এবং শ্রেষ্ঠতম সখা। ভাষা, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মূল। ভাষাযুক্ত ব্যক্তিরাই ক্রিয়াবান হতে পারেন। ভাষা থাকলেই গৃহীর কর্তব্য পালন করা সম্ভব। ভাষা থাকলে আনন্দ ও শ্রীলাভ হয়। প্রিয়ম্বদা ভার্যা জনবিরল স্থানে সখার, ধর্মকার্যে পিতার এবং রোগে মাতার কাজ করে থাকেন।
ধর্মীয় বিধান মেনে যে স্ত্রী এমন আচরণ করেন সনাতন ধর্মীয় কোন পুরুষ তার সঙ্গে কোনক্রমেই সহিংস আচরণ করতে পারে না।

সনাতন ধর্মে নারী মায়ের জাতি। অর্থাৎ মাকে যেমন ভক্তি শ্রদ্ধা করা উচিত নারীকেও তেমনি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখানো কর্তব্য। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, মাতৃবৎ পরদারেষু যঃপশ্যতি সপণ্ডিত অর্থাৎ যিনি পরস্ত্রীকে মায়ের মত করে দেখেন তিনিই পণ্ডিত।

হিন্দুশাস্ত্রে মাকে স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। অন্যত্র বলা হয়েছে, মাতা কিল মনুষ্যণাং দৈবতানাং চ দৈবতম অর্থাৎ মাতা মনুষ্য এবং দেবতারও দেবতা।

সনাতন ধর্মে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মশক্তি অভিন্ন। শাস্ত্রে ব্রহ্মশক্তিকে মাতৃরূপে কল্পনা করা হয়েছে। দেবী চণ্ডী, দূর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী প্রভৃতি দেবীগণ মাতৃজাতিরই প্রতিনিধি। অমিতভক্তে তাঁরা পূজিত হয়ে থাকেন।
সনাতন ধর্মীয় শিক্ষা সঠিকভাবে ধারণ করলে, মেনে চললে, অনুসরণ ও অনুশীলন করলে কোনো হিন্দুর পক্ষে নারীকে নিপীড়ন করা ও নির্যাতন করা সম্ভব হবে না। নারীর প্রতি সহিংস আচরণ করা অসম্ভব হবে।

খ্রিস্টধর্মে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আইনী ব্যবস্থা

বাইবেলে রয়েছে, পরে সদাপভু ঈশ্বর বললেন, মানুষটির পক্ষে একা থাকা ভাল নয়। আমি তার জন্য একজন উপযুক্ত সঙ্গী তৈরি করব।[২৬] পুরুষের ঈশ্বর প্রদত্ত এই উপযুক্ত সঙ্গী হলেন নারী। খ্রিস্টধর্মে তাই নারীর মর্যাদা পুরুষের সমান। এ ধর্মের শিক্ষায় নারীকে পুরুষের দেহ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই পুরুষরা যেমন নিজের দেহকে

---

২৫. ঋগ্বেদ ১০-৮৫-৪৬।
২৬. আদিপুস্তক, ২ : ১৮।

ভালবাসে ঠিক তেমনি নারীগণকে ভালবাসবে। কেউ কখনও নিজের দেহকে ঘৃণা বা অবজ্ঞা করে না। বরং মনোযোগ সহকারে যত্ন নেয়। এ দিক দিয়ে বিবেচনা করলে প্রত্যেকেরই নারীর প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত এবং তাকে সম্মান দেয়া আবশ্যক। বাইবেলে রয়েছে, স্বামী যেমন নিজের দেহকে ভালবাসে ঠিক সেভাবে নিজের স্ত্রীকেও তার ভালবাসা উচিত। যে নিজের স্ত্রীকে ভালবাসে সে নিজেকেই ভালবাসে। কেউ তো কখনও নিজের দেহকে ঘৃণা করে না বরং সে তার দেহের ভরণ পোষণ ও যত্ন করে।[২৭] পুরুষ তাই নারীকে নিপীড়ন করবে না বরং ভালবাসবে। কারণ নারীকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা কিংবা হেয়ভাবে দেখা মানে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকে ঘৃণা করা। বাইবেলে আরও বলা হয়েছে, ঠিক সেভাবে তোমরা যারা স্বামী, তোমরা বুদ্ধি বিবেচনা করে স্ত্রীর সঙ্গে বাস কর। তারা তোমাদের দুর্বল সাথী, আর তারাও তোমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের দয়ার দান হিসেবে জীবন পাবে। সেজন্য তাদের সম্মান কর যেন তোমাদের প্রার্থনা বাধা না পায়।[২৮] এখানে নির্বিঘ্নে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার শর্ত হিসেবে স্ত্রীকে সম্মান করার শর্তারোপ করা হয়েছে। তাই ধর্মভীরু খ্রিস্টান স্ত্রীকে সম্মান না করে পারে না।

বাইবেল অনুসারে নারী দুর্বল ও নরম স্বভাবের। ঈশ্বর তাদের এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। এ জন্য তাদের সাথে বুদ্ধিপূর্বক চলার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এর তাৎপর্য হল, তাদেরকে না ঠকানো ও প্রতারিত না করা। তাদেরকে ভোগ্য পণ্য না বানানো বা তাদের নিকট থেকে বিশেষ সুবিধা না নেয়া। তাদের উপর জোর না খাটানো ও তাদেরকে অধিকার বঞ্চিত না করা। কারণ বাইবেলে একের প্রতি অন্যের ভালবাসা সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। ভালবাসা সবসময় ধৈর্য ধরে, দয়া করে, হিংসা করে না, গর্ব করে না, অহংকার করে না, খারাপ ব্যবহার করে না, নিজের সুবিধার চেষ্টা করে না, রাগ করে না, কারো মন্দ ব্যবহারের কথা মনে রাখে না, মন্দ কিছু নিয়ে আনন্দ করে না। বরং যা সত্য তাতে আনন্দ করে।[২৯]

নারী নির্যাতন রোধে বাইবেলের দশ আজ্ঞায় সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে, 'ব্যভিচার করো না। অন্যের ঘর, স্ত্রী, দাসদাসী, গরু-গাধা কিংবা অন্য কিছুর উপর লোভ করো না।'[৩০] অন্যত্র আরো কড়াকড়িভাবে বলা হয়েছে, 'যে কেউ কোনো স্ত্রীলোকের দিকে কামনার চোখে তাকায় সে তখনই মনে মনে তার সঙ্গে ব্যভিচার করল। তোমার ডান চোখ যদি তোমাকে পাপের পথে টানে তবে তা উপড়ে দূরে ফেলে দাও। তোমার সমস্ত দেহ নরকে পোড়ার চেয়ে বরং তার একটা অংশ নষ্ট হওয়া তোমার পক্ষে ভাল। যদি তোমার ডান হাত তোমাকে পাপের পথে টানে তবে তা কেটে ফেলে দাও। তোমার সমস্ত দেহ নরকে যাওয়ার চেয়ে বরং একটা অংশ নষ্ট হওয়া তোমার পক্ষে ভাল।'[৩১]

---

২৭. ইফিসিয়, ৫ : ২৮-২৯।
২৮. পিতর, ৩ : ৭।
২৯. করিন্থিয়, ১৩ : ৪-৬।
৩০. যাত্রাপুস্তক, ২০ : ১৪ ও ১৭।
৩১. মথি, ৫ : ২৭-৩০।

নারীদের ভুল-ত্রুটি শুধরে দেয়ার নির্দেশনা দিয়ে বলা হয়েছে, 'বয়স্কা স্ত্রীলোকদের মায়ের মত মনে করে সংশোধন করো এবং যুবতীদের বোনের মত মনে করে পবিত্রভাব বজায় রেখে সংশোধন করো।'[৩২] বিভিন্ন বয়সী নারীগণের সাথে পুরুষরা কেমন আচরণ করবে এ নির্দেশনা থেকে তা জানা যায়। এ নির্দেশনা মেনে চললে নারীদের প্রতি বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে না।

সমাজে নারীঘটিত সকল সমস্যা সমাধানে খ্রিস্টধর্মের মূলীভূত চেতনা ও শিক্ষা কার্যকর হতে পারে। খ্রিস্টধর্মের চেতনা অনুসারে, মানবদেহ ঈশ্বরের এবং এ দেহ ঈশ্বরের থাকার মন্দির। মানবদেহকে ঈশ্বরের গৌরবের জন্য ব্যবহার করা যায়। যৌন সম্পর্ক ঈশ্বরের দেয়া একটি দান। এ সম্পর্কে বাইবেলে বলা হয়েছে, 'কিন্তু চারদিকে অনেক ব্যভিচার হচ্ছে, সেজন্য প্রত্যেক পুরুষের নিজের স্ত্রী থাকুক আর প্রত্যেক স্ত্রীর নিজের স্বামী থাকুক।'[৩৩] বাইবেলে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কেও সতর্ক করা হয়েছে, 'প্রত্যেকে যেন বিয়ের ব্যাপারটাকে সম্মানের চোখে দেখে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিয়ের পবিত্র সম্পর্ক রাখা উচিত, কারণ যে কোনো রকম ব্যভিচার হোক না কেন, যারা সেই দোষে দোষী ঈশ্বর তাদের শাস্তি দেবেন।'[৩৪] খ্রিস্টধর্মে অবশ্য সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে পরিবারের চাহিদা মিটাবার ভার পুরুষকে দেয়া হয়েছে।[৩৫]

একজন স্বামী-স্ত্রী হিসেবে তারা তাদের দায়িত্ব কীভাবে পূর্ণ করবেন বাইবেলে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'দেহের দিক থেকে স্ত্রীর যা পাওনা, তার স্বামী তাকে তা দিক। সেভাবে স্ত্রীও স্বামীকে দিক। স্ত্রীর দেহ তার নিজের নয়, তার স্বামীর। একইভাবে স্বামীর দেহ তার নিজের নয়, তার স্ত্রীর। একে অন্যের সঙ্গে দেহে মিলিত হতে অস্বীকার করো না; তবে কেবল প্রার্থনা করতে সুযোগ পাবার জন্য একমত হয়ে কিছুকাল আলাদা থাকতে পার। তারপরে আবার একসঙ্গে মিলিত হয়ো, যেন নিজেদের দমনের অভাবে শয়তান তোমাদের পাপের দিকে টানতে না পারে'।[৩৬]

খ্রিস্টসমাজে চারপাশে যৌন হয়রানির যে ঘটনা ঘটে খ্রিস্টধর্মীয় বিধান মেনে প্রত্যেক পুরুষ স্ত্রী আর প্রত্যেক স্ত্রী স্বামী গ্রহণ করলে যৌন হয়রানিমূলক কার্যকলাপ সংঘটিত হতে পারে না।

খ্রিস্টধর্মে সদাচার ও সুনীতির যে নির্দেশনা রয়েছে তা যথাযথভাবে পালন করলে এবং মানুষ ধর্ম বিশ্বাসে অটুট থাকলে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটার কথা নয়। কিন্তু মানুষ পাপের পথে গিয়ে নানা অপকর্মে লিপ্ত হয়ে সমাজকে কলুষিত করছে। বাইবেলে বলা হয়েছে, এভাবে মানুষ ঈশ্বরকে মানতে চায়নি বলে ঈশ্বরও পাপপূর্ণ হতে তাদের ছেড়ে

---

৩২. তীমথিয়, ৫ : ২।
৩৩. করিন্থিয়, ৭ : ২।
৩৪. ইবরীয়, ১৩ : ৪।
৩৫. আদিপুস্তক, ৩ : ১৯।
৩৬. করিন্থিয়, ৭ : ৩-৫।

দিয়েছেন। আর সেজন্যই মানুষ অনুচিত কাজ করতে থাকে। সব রকম অন্যায়, মন্দকাজ, লোভ, নীচতা, হিংসা, খুন, মারামারি, ছলনা ও অন্যের ক্ষতি করার ইচ্ছায় তারা পরিপূর্ণ। তারা অন্যের বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, অন্যের নিন্দা করে এবং ঈশ্বরকে ঘৃণা করে। তারা বদমেজাজী, অহংকারী ও গর্বিত। অন্যায় কাজ করার জন্য তারা নতুন নতুন উপায় বের করে। তারা মা-বাবার অবাধ্য, ভালমন্দের জ্ঞান তাদের নেই আর তারা অবিশ্বস্ত। পরিবারের প্রতি তাদের ভালবাসা নেই এবং তাদের অন্তরে দয়ামায়া নেই। ঈশ্বরের এই বিচারের কথা তারা ভাল করেই জানে যে, এ রকম কাজ যারা করে তারা মৃত্যুর শাস্তির উপযুক্ত। এ কথা জেনেও তারা যে কেবল এ সব কাজ করতে থাকে তা নয় কিন্তু অন্য যারা তা করে তাদের সায়ও দেয়।[৩৭]

বাইবেলের এ সকল নির্দেশনা মেনে চললে কোন খ্রিস্টধর্মাবলম্বীর পক্ষে কোনো নারীকে নির্যাতন করা সম্ভব নয়। বরং এ সকল নির্দেশনা মেনে চললে প্রত্যেক ধর্মভীরু খ্রিস্টানের নারীর প্রতি ভালো দৃষ্টিতে দেখার অভ্যাস তৈরি হবে, অন্যের প্রতি মমত্ববোধ ও সহমর্মিতা বেড়ে যাবে।

বৌদ্ধধর্মে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আইনী ব্যবস্থা

বৌদ্ধধর্মীয়গণ মৈত্রীপরায়ণ ও শান্তিপূর্ণ জীবনযান পদ্ধতিতে বিশ্বাসী। তারা বুদ্ধের অহিংসা নীতি, সংযম ও ধৈর্য সংহতির মন্ত্রে উজ্জীবিত। তারা বিশ্বাস করে, বৈরিতা কখনো প্রশমিত হয় না, বৃদ্ধি পায়। অহিংসা ও মৈত্রী দিয়েই বৈরিতা প্রশমিত হয়। এটিই জাগতিক নিয়ম। বৌদ্ধ ধর্মমতে, জীবন সমৃদ্ধির জন্য করুণা ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন অপরিহার্য। এ দুটি গুণ ছাড়া জীবন কখনো পরিপূর্ণতা সাধন করে না। জীবনকে পূর্ণ মনুষ্যত্বে পর্যবসিত করতে হলে দয়া, সেবা, দান, মমতা, ভালবাসা, সহিষ্ণুতা, পরোপকারিতা, সমব্যাথি হওয়া প্রভৃতি ধর্মগুণের প্রয়োজন হয়। এগুলোই মানুষকে করুণাবান ও মৈত্রীবান হতে শেখায়। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, মৈত্রীর দ্বারা ক্রোধকে জয় করবে, অসাধুতাকে জয় করবে সাধুতার দ্বারা, কৃপণকে দান দ্বারা এবং মিথ্যাবাদীকে সত্য দ্বারা জয় করবে।[৩৮] অন্যত্র বলা হয়েছে, পরস্পরকে বঞ্চনা করো না, হিংসা বা আক্রোশের বশবর্তী হয়ে পরস্পরের মধ্যে দুঃখোৎপাদনের চেষ্টা করো না।[৩৯] মহামতি বুদ্ধ উপদেশ দিয়েছেন, যারা পরকে দুঃখ দিয়ে কিংবা পরের অনিষ্ট সাধন করে নিজের সুখ কামনা করে সেই বৈর-সংসর্গ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ কোনদিন মুক্তি লাভ করতে পারবে না। শাস্ত্র তাই বলছে, 'পরদুক খুপদানের সো অত্তনো সুখমিচ্ছতি বেরসংসগ্ন সংসটপাঠো বেরা সোন পরিমুচ্চতি'।[৪০]

---

৩৭. রোমীয়, ১ : ২৮-৩২।

৩৮. ধম্মপদ, শ্লোক ২২৩।

৩৯. ধম্মপদ, শ্লোক ৬।

৪০. ধম্মপদ, শ্লোক ২৯১।

বৌদ্ধধর্মের মহানির্বাণ সূত্রে জানা যায়, তথাগত বুদ্ধ সপ্ত অপরিহানীয় ধর্মে বজ্জীদের উদ্দেশ্যে যে সাতটি অমূল্য উপদেশ প্রণয়ন করেছিলেন সেখানে পঞ্চমাটিতে রয়েছে, মাতৃজাতিকে সম্মান করার কথা, কুল নারীদের শ্রদ্ধা করার কথা, তাদের মান-সম্মান রক্ষা করার কথা। সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম হল, যাবতীবঞ্চ আনন্দ বজ্জী যা তা কুরিখিযো, কুল কুমারিয়ো তা ন ওক্কসস বাসেসন্তি, বুদ্ধিযেব আনন্দ বজ্জীনং পাটিকঙ্খ নো পরিহানি।[৪১] অর্থাৎ আনন্দ! যতদিন বজ্জীগণ কুলকুমারী ও রমণীদেরকে সম্মান করবে, শ্রদ্ধা করবে এবং বলপূর্বক অপহরণ করে নিজ গৃহে বসবাস করাবে না ততদিন বজ্জীদের শ্রীবৃদ্ধি হবে, কখনো তাদের পরিহানি হবে না।

বৌদ্ধগণ যে কোনো মানবতার কাজে উৎসাহ যোগান। ত্রিপিটকে মহামতি বুদ্ধ বলেছেন,

অসুভানুপসিসং বিহরন্তং, ইন্দ্রিয়েসু সুসংতং
ভোজননহি চ মত্তঞঞুং, সদ্ধং, আরদ্ধবীরিযং
তং বে নপ্পসহতি মারো বাতো সেলংব পব্বতং।[৪২]

অর্থাৎ যিনি বাহ্যিক শোভা বা সৌন্দর্য দর্শন হতে বিরত থাকেন, সকল ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত রাখেন, ভোজনে, মাত্রাজ্ঞান ও সেবাপরায়ণ হন, শ্রদ্ধাবান ও আরদ্ধবান, তারা কখনো পরাভূত হন না, যেমনি হয় না প্রবল বায়ুতে শিলাময় পর্বত।

ইসলামে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আইনী ব্যবস্থা

রসূলুল্লাহ স. এর আবির্ভাব প্রাক্কালীন সময়ে আরবে নারী নির্যাতন চরম আকার ধারণ করেছিলো। নারীর জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের কোনো নিরাপত্তা ছিলো না। প্রকাশ্য আসরে ব্যভিচারিতার নির্লজ্জ প্রদর্শনে নারীকে বাধ্য করা হয়েছিলো। খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ, অপহরণ, ব্যভিচারিতার মিথ্যা অভিযোগ, নিরাপত্তাহীনতা প্রভৃতি নারী জীবনের প্রতিশব্দ হয়ে ওঠেছিলো। নারীদের চলাফেরা, খোলামেলা পোশাক আর উত্তেজক শারীরিক কসরত পুরুষকে এ কাজে আরো বেশি উদ্বুদ্ধ করছিলো। ইসলাম নারীকে এমন নির্যাতিত জীবনের পরিবর্তে সম্মানের জীবন দেয়ার ব্যবস্থা করে। নারী নির্যাতনের সকল পথ ও পদ্ধতি নিষিদ্ধ করে নারীর মর্যাদাপূর্ণ ও শান্তিময় জীবনযাত্রা নিশ্চিত করে।[৪৩]

বর্তমান সময়ে পরিবারে ও সমাজে নারী বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হয়। কন্যা হয়ে জন্মানোর অপরাধে তাকে মা-বাবা ও অন্যান্যদের বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হতে হয়। ছেলে সন্তানের চেয়ে সকল ক্ষেত্রে সে কম সুবিধা ও অধিকার পায়। বিবাহের ক্ষেত্রেও তার কোনো মতামত নেয়া হয় না। বিয়ের পর স্বামী ও তার আত্মীয়দের যৌতুক দাবি এবং

---

৪১. ধম্মপদ, শ্লোক ২৪৭।

৪২. ধম্মপদ, শ্লোক ৮।

৪৩. অধ্যাপক নাজির আহমেদ ও ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস*, ঢাকা : আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৮৯, পৃ. ২৬৭।

সে কারণে নির্যাতন কিংবা এমনিতেই মৌখিক, শারীরিক ও মানসিক লাঞ্ছনা নারীকে দুঃসহ জীবনে ঠেলে দেয়। আর্থিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা, মানুষ হিসেবে সমান অধিকার ও মর্যাদা না দেয়া, নারীরা পাপের কারণ বলে অবহেলা ও উপেক্ষা করা, ব্যভিচারে বাধ্য করা, ধর্ষণ, হত্যা, অকারণে তালাক দেয়া, মিথ্যা অপবাদ দেয়া, অসম শ্রমে বাধ্য করা, ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করা, ধর্ম ও শিক্ষা চর্চা থেকে দূরে রাখা, নাচ, গান, বিজ্ঞাপন, নাটক এবং চলচ্চিত্রে নারীদেহকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার, বিবাহ-পূর্ব প্রেম এবং শিক্ষা ও চাকুরি জীবনে অবাধ নারী সম্ভোগের ব্যবস্থা রাখা প্রভৃতি পদ্ধতিতে নারী নির্যাতনের শিকার হয়।[৪৪] ইসলামের বিধান অনুসারে নির্যাতনের এ সকল ক্ষেত্র থেকে নারীকে কীভাবে রক্ষা করা যায় কুরআন–হাদীসে তার বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে।

কোনো নারীর প্রতি কোনো পর-পুরুষ ইচ্ছা করে তাকিয়ে থাকতে পারবে না। বরং দৃষ্টি সংযত রাখবে। নারীও কোনো পর-পুরুষের দিকে তাকিয়ে থাকবে না। অনিচ্ছায় হঠাৎ করে চোখ পড়ে গেলেও সাথে সাথে ফিরিয়ে নেবে। কেননা কামনা সৃষ্টি হওয়া বা লোভ জন্ম নেয়ার শুরু চোখের দেখা থেকেই হয়। আল্লাহ্ বলেন,

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

'মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেনো তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেনো তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে।'[৪৫]

সৃষ্টিগতভাবেই নারীদেহের প্রতি পুরুষের এবং পুরুষের প্রতি নারীর জৈবিক আগ্রহ থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় একে নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও পুরুষ বা নারীদেহের উত্তেজক প্রদর্শনী এমনকি সাধারণ প্রকাশও বিপরীত লিঙ্গকে উত্তেজিত করে তুলতে পারে। ফলে নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। এক্ষেত্রে নারী নির্যাতনের শিকার হয় বেশি। এ কারণে সে অপর পুরুষকে নিজের রূপ সৌন্দর্য প্রদর্শন করবে না। অপর পুরুষের মন বা দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এমন পোশাক পরবে না। অলংকার বা প্রসাধনে নিজেকে আকর্ষণীয় করে পরের সামনে উপস্থাপন করবে না। আল্লাহ্ বলেন,

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ... وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ

'মুমিন নারীরা সাধারণভাবে যা প্রকাশ পায় তা ছাড়া যেনো তাদের আবরণ প্রদর্শন না করে। তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেনো তারা মাথায় কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখে। ...... গোপন আবরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে তারা যেনো সজোরে পদক্ষেপ না করে।'[৪৬]

---

৪৪. আল্লামা আবদুস সামাদ রাহমানী, *নারী মুক্তি কোন পথে?* ভাষান্তর : মুফতী মুঈনুদ্দীন তৈয়বপুরী, ঢাকা : ২০০০, পৃ.৭৭।

৪৫. আল–কুরআন, ২৪ : ৩০-৩১।

মুমিন পুরুষ এবং নারী তাদের লজ্জাস্থান হিফাযত করবে। একজন অপরজনকে তার লজ্জাস্থান দেখাবে না এবং যে কোনো হারাম কাজে লজ্জাস্থান ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে। উল্লেখ্য যে, সাধারণভাবে পুরুষের লজ্জাস্থান হলো নাভীমূল থেকে হাটু পর্যন্ত এবং নারীর লজ্জাস্থান হলো তার হাত, পা ও মুখমণ্ডল ছাড়া পুরো শরীর।[৪৭]

মুমিন নর-নারী কেউ কারো ঘরে অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ করবে না। কেননা এতে লজ্জাস্থানের হিফাযত অসম্ভব হয়ে পড়বে। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ... فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا...

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ব্যতীত অন্য কারো ঘরে ঘরবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করো না। ... যদি তোমরা ঘরে কাউকে না পাও তাহলেও তাতে প্রবেশ করবে না। যতক্ষন না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়। যদি তোমাদেরকে বলা হয়, 'ফিরে যাও', তাহলে তোমরা ফিরে যাবে।"[৪৮]

মুমিন নর-নারী পরস্পরের পবিত্রতার ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করবে। কেউ কারো ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করে তাকে মানসিক নির্যাতনের শিকার বানাবে না। আল্লাহ বলেন, لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ "যখন তারা অপবাদ সম্পর্কে শুনলো তখন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা আপন লোকদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করলো না কেনো? এবং বললো না, এটাতো সুস্পষ্ট অপবাদ।"[৪৯]

মুসলিম সমাজে অশ্লীল অশোভন কোনো বিষয়ের স্থান নেই। সমাজে অশ্লীলতা প্রসার পেলে নারীর মর্যাদা নষ্ট হয়। তার সম্মান বিনষ্টের সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয়। আল্লাহ তাই শুধু অশ্লীল আচরণ নয় বরং অশ্লীল বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলাও হারাম করেছেন। তিনি বলেছেন–

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

"নিশ্চয়ই যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্যে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে"।[৫০]

---

৪৬. আল-কুরআন, ২৪ : ৩১।

৪৭. আবদুল হামিদ আহমদ আবুসুলায়মান, *বৈবাহিক সমস্যা ও কুরআন মজীদের সমাধান*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০০, পৃ.৭৭।

৪৮. আল-কুরআন, ২৪ : ২৭-২৮।

৪৯. আল-কুরআন, ২৪ : ১২।

৫০. আল-কুরআন, ২৪ : ১৯।

সৎ চরিত্রবান পবিত্র নারীর প্রতি ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ উত্থাপন করলে নারী নিদারুণ মানসিক নির্যাতনের শিকার হন। নারীকে নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্যে মহান আল্লাহ্ একে কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা দিয়েছেন,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"যারা সতি ও পবিত্র চরিত্রবতী নারীর প্রতি (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করে কিন্তু চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে এবং তাদের সাক্ষ্য কখনোই গ্রহণ করবে না এরাইতো সত্যত্যাগী।"[৫১]

নারী-পুরুষ উভয়ে পারস্পরিক সম্মতিতে অবৈধ দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তুললে এবং তা চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে প্রমাণ হলে তাদেরকে একশত কশাঘাত করা হবে।[৫২] এ শাস্তি অবিবাহিত নারী-পুরুষের জন্য। যদি তারা বিবাহিত হয় তাহলে তাদেরকে পাথর দ্বারা আঘাত করে হত্যা করা হবে।[৫৩] কিন্তু অপরাধটি যদি নারীর অমতে হয়, তাকে যদি এ কাজে বাধ্য করা হয় এবং সাক্ষী প্রমাণের ভিত্তিতে নারীর অসহায়ত্ব ও অমত সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে তাহলে এ জন্যে নারী কোনো শাস্তি পাবে না। বরং এজন্যে ধর্ষক পুরুষই শাস্তি পাবে। সে অবিবাহিত হলে তাকে একশত কশাঘাত করা হবে। সে বিবাহিত হলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে। এক্ষেত্রে নারীর অব্যাহতি প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ "আর যে তাদেরকে (ব্যভিচারে) বাধ্য করে তাহলে তাদের জবরদস্তির পর আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৫৪]

স্বামী যেনো ব্যভিচারিতার মিথ্যা অভিযোগ তুলে স্ত্রীকে মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতন করতে না পারে সে জন্যে আল্লাহ লিআনের বিধান দিয়েছেন। এ প্রক্রিয়ায় ব্যভিচারের অভিযোগ তুলতে স্বামীকে চারবার আল্লাহর নামে কসম করে বলতে হয়– তার স্ত্রীর ব্যাপারে ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপনের ব্যাপারে সে সত্যবাদী। পঞ্চমবারে শপথ করে বলতে হয়– أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ 'যদি সে এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার উপর আল্লাহর লানত।'[৫৫] অভিযোগ উত্থাপনের পর স্বামী যদি কসম করতে অস্বীকার করে তাহলে তাকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে।[৫৬]

---

৫১. আল-কুরআন, ২৪ : ৪।

৫২. আল-কুরআন, ২৪ : ২।

৫৩. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-হুদূদ, অনুচ্ছেদ : রজমুল মুহসিন, বৈরুত : দারু ইবনু কাছীর, ১৪০৭হি./১৯৮৭খ্রি., খ. ৬, হাদীস নং-৬৪২৯।

৫৪. আল-কুরআন, ২৪ : ৩৩।

৫৫. আল-কুরআন, ২৪ : ৬-৯।

৫৬. ইবনুল কায়্যিম , *যাদুল মাআদ*, দিল্লী : ১৪০৬, পৃ. ৭৫।

ব্যভিচারের শাস্তির বিধান বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেছেন–

وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً

وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

"তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে চারজন সাক্ষী আনো। যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে তাদেরকে (নারীদের) ঘরে আবদ্ধ করে রাখো, যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থা করেন। তোমাদের মধ্যে যে দুজন এতে লিপ্ত হবে তাদেরকে শাস্তি দিবে। যদি তারা তওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয় তাহলে তা হতে বিরত থাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু।"[৫৭]

এ আয়াতদ্বয়ে প্রথমত ব্যভিচার প্রমাণের বিশেষ পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে যে, চারজন পুরুষের সাক্ষ্য দরকার হবে। দ্বিতীয়ত ব্যভিচারের শাস্তি নারীর জন্যে ঘরে আবদ্ধ রাখা এবং উভয়কে কষ্ট প্রদান করার কথা উল্লেখিত হয়েছে, এ প্রসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, ব্যভিচারের শাস্তি সংক্রান্ত এই বিধানই সর্বশেষ নয়, বরং ভবিষ্যতে অন্য বিধান আসবে। সূরা নূরে আল্লাহ সেই অন্য বিধান বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন–

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

"ব্যভিচারী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ তাদের প্রত্যেককে একশত করে কশাঘাত করো। আল্লাহর বিধান কার্যকর করায় তাদের প্রতি দয়া যেনো তোমাদের প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও। মুমিনদের একটি দল যেনো তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে"।[৫৮] অর্থাৎ শাস্তিটি গোপনে দেয়া যাবে না, দিতে হবে প্রকাশ্যে। সূরা নূরের আলোচ্য আয়াতে কোনোরূপ বিবরণ ও বিশেষায়ণ ছাড়াই ব্যভিচারের শাস্তি একশত কশাঘাত বর্ণিত হয়েছে। এ শাস্তি কোনো ধরনের পুরুষ ও নারীর জন্যে আল্লাহ তার সুনির্ধারিত ব্যাখ্যা দেননি। কিন্তু তাঁর পরোক্ষ নির্দেশ ও নির্দেশনায় রসূলুল্লাহ স. এ শাস্তির প্রয়োগগত দিক বিশ্লেষণ করে বলেছেন, "আমার নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করো। আল্লাহ ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীর জন্যে বিধান বিবৃত করেছেন। তা হচ্ছে, অবিবাহিত নারী ও পুরুষের জন্যে একশত কশাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসন আর বিবাহিত নারী ও পুরুষের জন্যে একশত কশাঘাত ও পাথরের আঘাতে হত্যা"।[৫৯]

---

৫৭. আল-কুরআন, ৪ : ১৫-১৬।

৫৮. আল-কুরআন, ২৪ : ২।

৫৯. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-হুদূদ, অনুচ্ছেদ : হাদ্দুয যিনা, বৈরূত : দারু ইহয়াহতি তুরাছিল আরাবিয়্যি, তা. বি., খ. ৩, হাদীস নং-১৬৯০।

আবু হুরায়রা ও যায়দ ইবনে খালিদ আল-জুহানী রা. এর বর্ণনা থেকে বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়। তাঁরা বর্ণনা করেন, জনৈক বিবাহিতা মহিলা তার অবিবাহিত চাকরের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। ব্যভিচারীর পিতা তাকে নিয়ে রসূলুল্লাহ স. এর নিকট উপস্থিত হন। স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ঘটনা প্রমাণিত হয়ে গেলে রসূলুল্লাহ স. বলেন, "আমি তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করবো"। তারপর তিনি আদেশ দিলেন ব্যভিচারী অবিবাহিত ছেলেকে একশত কশাঘাত করো"। তিনি বিবাহিত মহিলাকে পাথরের আঘাতে হত্যা করার জন্য উনায়স রা. কে আদেশ দিলেন। উনায়স রা. নিজে মহিলার স্বীকারোক্তি নিলেন। তারপর তার উপর প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান প্রয়োগ করলেন"।[৬০]

এ হাদীসে রসূলুল্লাহ স. বিবাহিত ও অবিবাহিতকে ভিন্ন ধরনের শাস্তি দিয়েছেন এবং দুটো শাস্তিকেই আল্লাহর ফয়সালা বলে উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ হলো, যদিও কুরআনে প্রস্তারাঘাতে হত্যার বিধান দেয়া হয়নি কিন্তু রসূলুল্লাহ স. এ ফয়সালা ওহীর মাধ্যমে আল্লাহর নিকট থেকেই পেয়েছেন।[৬১]

ব্যভিচার যেমন জঘন্যতম অপরাধ তেমনি এর শাস্তিও কঠিন। কিন্তু এ শাস্তি যখন তখন মনে চাইলেই প্রয়োগ করা যাবে না। এজন্যে চারজন প্রত্যক্ষদর্শী পুরুষের সাক্ষ্য প্রয়োজন। সাক্ষ্য প্রমাণে ব্যভিচার প্রমাণিত হলে শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রে কোনো দয়া প্রদর্শন করা যাবে না। আবার কশাঘাতের শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এতোটা কাঠিন্যও অবলম্বন করা যাবে না যাতে ব্যক্তি মারাত্মকভাবে আহত হয় বা তার জীবন অবসানের উপক্রম হয়।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « خُذُوا عَنِّى خُذُوا عَنِّى قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْىُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ ».

৬০. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ,* অধ্যায় : আল-হুদূদ, অনুচ্ছেদ : মান ইতারাফা আলা নাফসিহি বিয-যিনা, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং-১৬৯৭।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ أَنَّهُمَا قَالاَ إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلاَّ قَضَيْتَ لِى بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَائْذَنْ لِى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « قُلْ ». قَالَ إِنَّ ابْنِى كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ وَإِنِّى أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِى الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِى أَنَّمَا عَلَى ابْنِى جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ». قَالَ فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرُجِمَتْ.

৬১. আবদুল হালীম আবু শুককাহ, *রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা,* , ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থাট, ২০১১, খ. ১, পৃ. ৪৩।

নারীদেরকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হলে বা নির্যাতন করা হলে তার প্রতিবিধানে ইসলাম কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। নারীর শ্লীলতাহানির জন্য নির্যাতন হলে সংশ্লিষ্ট পুরুষকে ব্যভিচারের শাস্তি দিতে হবে। আর্থিক বা অন্য কোনো বৈষয়িক কারণে নারীকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হলে ইসলামী আদালত কিসাসের বিধান অনুসারে অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করবে। যতটুকু নির্যাতন নারীকে করা হয়েছে বা যেভাবে তাকে আহত করা হয়েছে কিংবা আঘাত করা হয়েছে, নির্যাতনকারীকেও ঠিক ততোটুকু পরিমাণ আঘাত করতে হবে। কুরআন মাজীদে এ জাতীয় শাস্তির উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"আমি তাদের জন্য তাওরাতে বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের পরিবর্তে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং জখমের বদলে সমান জখম। এরপর কেউ যদি তা ক্ষমা করে তাহলে ক্ষমাকারীর পাপ মোচন হবে। আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুসারে যারা বিচার ফয়সালা করে না তারাই জালিম"।[৬২]

তাই শারীরিকভাবে নারী যতটুকু নির্যাতিত হবে, ইসলামী আইনের আলোকে ততটুকু নির্যাতন নির্যাতনকারীর উপর চালানো যাবে। অবশ্য নারী নিজে এই কাজ করবে না। ইসলামী আদালত নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় শাস্তিদানের ব্যবস্থা করবে। নারীকে শারীরিকভাবে নির্যাতনের সাথে সাথে যদি তাকে অসম্মান করার জন্য অশালীন কোনো কাজ করা হয় বা কোনো কথা বলা হয়, অপরাধের ক্ষতিকর প্রভাব বিবেচনা করে বিচারক সে জন্যও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

এসিড নিক্ষেপ ভয়ানক কাপুরুষতা এবং অমানবিক বর্বরতা। বাংলাদেশে এটি ভীতিকর অবস্থায় এসে উপনীতি হয়েছে। এসিড নিক্ষেপের ব্যাপারে কিসাসের শাস্তিই হবে কার্যকর ব্যবস্থা।[৬৩] অর্থাৎ যে এসিড নিক্ষেপ করবে, তাকেও এসিড দিয়ে ঝলসে দেয়া হবে, ততটুকু, যতটুক সে করেছে। এর পাশাপাশি এসিড নিক্ষেপের সাথে সাথে সন্ত্রাস সৃষ্টির একটি সম্পর্ক রয়েছে বলে সন্ত্রাসীর জন্য ইসলাম যে শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছে এসিড নিক্ষেপকারীর উপর সে শাস্তিও কার্যকর করা যাবে। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

---

৬২. আল-কুরআন, ৫ : ৪৫।

৬৩. গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামে নারী ও শিশু প্রসঙ্গ*, ঢাকা : ১৯৮১, পৃ. ৬০।

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের শাস্তি হলো, তাদেরকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ার জীবনে এটাই তাদের লাঞ্ছনা আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি"।[৬৪]

ইসলামের শাস্তিবিধান অনুসারে এসকল শাস্তি প্রকাশ্যে জনসমাবেশে কার্যকর করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো মমতা বা দয়া দেখানো যাবে না। তাহলে মূলত অপরাধী আরো অপরাধ করার উৎসাহ পাবে। শাস্তি যদি জনসমাবেশে প্রকাশ্যে কার্যকর করা হয় তাহলে নতুন করে কেউ আর একই অপরাধ করতে সাহসী হবে না।[৬৫] শাস্তি কার্যকর করার ক্ষেত্রে এই নীতি ও পদ্ধতি উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

"আল্লাহর বিধান কার্যকর করায় তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখিরাতে বিশ্বাসী হয়ে থাকো। মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।"[৬৬] এমন কঠোর পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হলে এসিড নিক্ষেপ থেকে নারীকে সহজেই রক্ষা করা যাবে।

পথে-প্রান্তরে নারী নানা অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির শিকার হয়। বখাটে এবং ভদ্রবেশী বিভিন্ন বয়সের পুরুষরা তাদেরকে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করে। অশ্লীল কথা বলে, অঙ্গভঙ্গি করে, শীষ বাজিয়ে, স্বাভাবিক পথচলা ব্যাহত করে, নানা কুপ্রস্তাব দিয়ে প্রভৃতি রকমারি পদ্ধতিতে নারীকে উত্ত্যক্ত করা হয়। বলা বা লেখায় নারীর প্রতি উত্ত্যক্তকরণের ক্ষতিকর প্রভাব বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। বরং সংশ্লিষ্ট নারীই এই বিড়ম্বনার অন্তহীন কষ্টের কথা বলতে পারেন। যে কারণে আমরা বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে উত্ত্যক্তকরণের শিকার নারীকে আত্মহননের পথ বেছে নিতে দেখি।[৬৭] এসব ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান হলো, উত্ত্যক্তকরণের কারণে নারী যদি আত্মহননের পথ বেছে নেয় তাহলে সংশ্লিষ্ট উত্ত্যক্তকারী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে। কারণ প্রত্যক্ষভাবে হত্যায় অংশ না নিলেও সেই মূলত হত্যাকারী। তাকে ইসলাম নির্ধারিত হত্যার শাস্তিই দেয়া হবে। আর যদি উত্ত্যক্তকৃত নারী আত্মহননের পথ বেছে না নেয় তাহলে সমাজে বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয় এবং অশালীন

---

৬৪. আল-কুরআন, ৫ : ৩৩।

৬৫. এ জেড এম শামসুল আলম, *ইসলামী প্রবন্ধমালা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪, পৃ. ২৮৭।

৬৬. আল-কুরআন, ২৪ : ২।

৬৭. ইসহাক ওবায়দী, *যুগে যুগে নারী*, ঢাকা : ১৯৯৭, পৃ. ৫৪।

কার্যকলাপ সৃষ্টির দায়ে উত্ত্যক্তকারীদের বিরুদ্ধে বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির দণ্ডবিধান কার্যকর করা হবে।[৬৮]

বাংলাদেশে যৌতুক এক ভয়ঙ্কর বিভীষিকা। হিন্দুধর্মাবলম্বীদের বিবাহরীতিতে আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে যে পণপ্রথার ব্যবস্থা রয়েছে তাই যৌতুক হিসেবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। হিন্দু ধর্মমতে পিতা-মাতার সম্পদে নারীর কোনো অংশ নেই বলে বিবাহের সময় স্বামী-পক্ষ যথাসম্ভব বেশি বেশি অর্থ ও উপহার পণ হিসেবে গ্রহণ করে। বিবাহের আগে দরকষাকষির মাধ্যমে এটা নির্ধারিত হয়ে থাকে। ইসলামে এমন বিধান নিষিদ্ধ। ইসলামে বরং বিবাহের জন্য স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে মোহর প্রদান করতে হয়। যৌতুক তাই সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং ইসলাম বিরুদ্ধ প্রথা। মুসলিমদের এ প্রথায় অভ্যস্ত হওয়ার অর্থ হলো ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাওয়া। ইসলামী আদালত ইসলামী বিধানের বিরুদ্ধাচরণের জন্য যারা যৌতুক দাবি করবে তাদের বিরুদ্ধে অবস্থা অনুসারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।[৬৯]

নারী হওয়ার কারণে তার প্রতি কোনো প্রকার অসম আচরণ করা যাবে না।[৭০] যেমন মেয়ে শিশুকে কম খেতে দেয়া, ছেলে শিশুকে বেশি খেতে দেয়া, মেয়ে শিশুকে কম আদর করা বা অবহেলা করা আর ছেলে শিশুকে বেশি আদর করা, নারীকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা আর পুরুষকে সকল উত্তরাধিকারের মালিক করে দেয়া। নারী বলে কাউকে কাজে নিয়োগ না দেয়া (যদি সে কাজে নিয়োগ দেয়ার ক্ষেত্রে শরীয়তের নিষেধাজ্ঞা থাকে, সে কথা স্বতন্ত্র), নারী হওয়ার কারণে তাকে লেখাপড়া থেকে দূরে রাখা ইত্যাদি বিষয়গুলো ইসলাম সমর্থন করে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসলাম বরং মেয়ে শিশু ও নারীকেই পুরুষের উপর অধিক মর্যাদা এবং অধিকতর অধিকার প্রদান করে থাকে।[৭১]

বাংলাদেশের মত মুসলিম দেশে নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নারীরও কিছু দায়িত্ব রয়েছে। এ দেশের পুরুষরা ইসলামের বিধি-বিধান সত্যিকারার্থে অনুশীলন করে না। তারা নারীকে মর্যাদা দেয়ার পরিবর্তে কখনো ভোগের সামগ্রী মনে করে। এমতাবস্থায় যে সকল নারীর ক্ষমতা আছে তারা ব্যক্তি পর্যায় থেকে জীবনের সকল পর্যায়ে ইসলামের উন্নত নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, সন্তানদের ইসলামের নৈতিকতা সমৃদ্ধ করে তুলতে পারেন, নিজেরা ইসলামের শালীনতার বিধান মেনে চলতে পারেন। তাহলে আশা

---

৬৮. ড. জামাল আল বাদাবী, *ইসলামী শিক্ষা সিরিজ*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০৮, পৃ. ৮৭।

৬৯. বি আইশা লেমু ও ফাতেমা হীরেন, *ইসলামের দৃষ্টিতে নারী*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০১০, পৃ. ২১।

৭০. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮৮, পৃ. ৮৮

৭১. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *নারী*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৮, পৃ. ৪৭।

করা যায়, অনেক বিব্রতকর অবস্থা থেকে তারা এমনিতেই রক্ষা পাবেন। বাংলাদেশে যত নারী এসিডদগ্ধ হয়েছে তাদের কেউ–ই পর্দানশীল বা বোরখা পরিহিতা নারী নন। এ থেকে এটাও প্রমাণ হয়, এ সকল নারীর অনেকেই আন্তরিকভাবে পর্দাবিধান না মেনে চললেও কেবল বোরখা পরার কারণে যেখানে অনেকখানি নির্যাতন থেকে রেহাই পাচ্ছেন, সেখানে তারা যদি ইসলামের সকল বিধান মেনে চলেন, তাহলে তারা যে নির্যাতন থেকে পুরোপুরি রক্ষা পাবেন, তা সহজেই প্রতীয়মান হয়। সাথে সাথে সমাজের পুরুষগণ যদি ইসলামের বিধান মেনে নারীর অধিকার আদায় এবং নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে এগিয়ে আসেন, তাহলে আলাদা করে নারী দিবস ঘোষণা করার প্রয়োজন হবে না। বরং প্রতিদিনই নারীর সম্মান ও অধিকার যথাযথভাবে রক্ষিত হবে। এই বাংলাদেশে একজন নারীও আর নির্যাতনের শিকার হবেন না।[৭২]

উপসংহার

সনাতন, খ্রিস্ট, বৌদ্ধ বা ইসলাম কোনো ধর্মীয় আইনই নারী নির্যাতন সমর্থন করে না বরং নারীকে নির্যাতন থেকে সুরক্ষার জন্য সর্বোতভাবে চেষ্টা করে। বিশেষত ইসলাম ধর্মে নারী নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য যেমন বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট আইন প্রদান করা হয়েছে তাতে ইসলাম ধর্মের অনুসারী কোনো ব্যক্তির পক্ষে ধর্মীয় কারণেই কোনো ধরনের নারী নির্যাতনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। সনাতন, খ্রিস্ট ও বৌদ্ধ ধর্মের নারী নীতিও একান্তভাবে এটাই প্রমাণ করে ধর্মগুলোর নিষ্ঠাবান কোনো অনুসারী নারী নির্যাতন করতে পারে না। এমনকি তাদের সামনে কোনো নারী নির্যাতনে শিকার হতে পারে না। ধর্মীয় শিক্ষা ও আবেগের জন্যই তারা নারীকে নির্যাতন থেকে রক্ষা করতে তৎপর হয়ে ওঠেন। বাংলাদেশ মুসলিম প্রধান দেশ হলেও এ দেশে সনাতন, বৌদ্ধ ও খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী লোক সংখ্যাও কম নয়। সকল ধর্মানুসারী লোকের মধ্যে তাদের স্ব স্ব ধর্ম অনুসারে নারী নির্যাতন প্রতিরোধক শিক্ষা ও বিধিসমূহের নির্মোহ, নিরপেক্ষ এবং সঠিক প্রচারণা চালানো হলে এবং তাদেরকে ধর্মীয় আদর্শ ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা গেলে বাংলাদেশে সমন্বিতভাবে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সম্ভব হবে।

---

৭২. অধ্যক্ষ যাইনুল আবেদীন, *নারী নির্যাতন রোধে ইমামগণের ভূমিকা*, ঢাকা : ২০০৬, পৃ. ১৩।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৯ সংখ্যা : ৩৫
জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১৩

শিশুর বয়সসীমা নির্ধারণে আইনী জটিলতা : ইসলামী সমাধান

মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম*

[**সারসংক্ষেপ :** *একথা সর্বজন বিদিত যে, শিশুর ওপর নির্ভরশীল মানব সভ্যতার ভবিষ্যত, প্রভাতের উদয়, ঝলমলে আগামী দিন, গৌরবময় অতীতের প্রত্যাবর্তন। সম্ভবত এ বদ্ধমূল ধারণা জাগ্রত হওয়ার সুবাদে আজ দেশে দেশে শিশুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নিত্য নতুন শিশু শিক্ষালয়, চাইল্ড কেয়ার হোম, শিশু একাডেমি, শিশু বিনোদন কেন্দ্র, শিশু কেন্দ্রিক নানা প্রজেক্ট-প্রোগ্রাম। রচিত হয়েছে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, জাতীয় শিশুনীতি ও তদসংশ্লিষ্ট নানা বিধি-বিধান। তবে শিশুর যথার্থ পরিচয় প্রদান ও তার বয়সসীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে জটিলতা রয়েই গেছে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইনে শিশুর বয়সসীমা নির্ধারণে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, আলোচ্য প্রবন্ধে ইসলামের দৃষ্টিতে তার যৌক্তিক ও দালিলিক সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমেই ইসলামের মূল উৎস কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে শিশুর মর্যাদা বর্ণনাপূর্বক শিশুর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এরপর শিশুর বয়সসীমা নির্ধারণে প্রচলিত আইনী জটিলতা উল্লেখ করে এর সমাধানকল্পে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করা হয়েছে।*]

ভূমিকা

শিশুরাই দেশ ও জাতির আগামী দিনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। তাই ইসলাম, শিশু জন্মের আগে ও পরের অসংখ্য অধিকারকে সুচারুভাবে উপস্থাপন করেছে এবং বিশ্ববাসীকে শিশু সম্পর্কে অতি উন্নত ধারণা দিয়েছে। আল কুরআনে এ বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা এসেছে। যেমন,

০১. শিশু হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার বিরাট নিয়ামত, যার শুকরিয়া আদায় করা আমাদের কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা বলেন : وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا
"এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে তোমাদেরকে আমি সাহায্য করলাম। (সর্বোপরি এ জনপদে) আমি তোমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ করলাম।"।[১]

০২. শিশু হচ্ছে মাতা-পিতার প্রতি আল্লাহর বিশেষ উপহার। আল্লাহ্ তাআলা বলেন:
لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

---

* প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ, সরদার আছমত আলী মহিলা কলেজ, মনোহরদী, নরসিংদী।

১. আল কুরআন, ১৭ : ৬।

"আকাশমণ্ডলী ও যমীনের সমুদয় সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যে; তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। যাকে চান তাকে কন্যা সন্তান দান করেন, আবার যাকে চান তাকে পুত্র সন্তান দান করেন। যাকে চান তাকে পুত্র-কন্যা উভয়টাই দান করেন। আবার যাকে চান তাকে তিনি বন্ধ্যা করে দেন। নিঃসন্দেহে তিনি মহাজ্ঞানী ও পরম ক্ষমতাধর"।[২]

০৩. শিশু হচ্ছে জীবনের অলঙ্কার ও পরিতৃপ্তি। আল্লাহ তাআলা বলেন:

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا

"ধন-ঐশ্বর্য্য ও শিশু-সন্ততি হচ্ছে পার্থিব জীবনের শোভা।"[৩]

০৪. পৃথিবীতে শিশুর আগমন এক বিশেষ সুসংবাদ। আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

"হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি এক পুত্র সন্তানের, যার নাম হবে ইয়াহয়া। ইতোপূর্বে কাউকেও এ নামধারী করিনি।"[৪]

০৫. শিশু হলো চোখের প্রশান্তি : আল্লাহ তাআলা বলেন:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا

"হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রীদের এবং সন্তানদেরকে আমাদের জন্য নয়ন জুড়ানো করে দাও এবং তুমি আমাদের মুত্তাকী লোকদের ইমাম বানিয়ে দাও"।[৫]

জনৈক আরবী কবি যথার্থই বলেছেন:

إنمـــا أولادنـــابيـــنـــا * أكبادنا تمشي على الأرض

لو هبت الريح على بعضهم * لامتنعت عيني عن الغمض

সন্তানেরা মনে হয় যেনো মোদের মাঝে
মোদেরই অন্তর মূর্ত হয়ে মাটিতে হাঁটে।
দমকা হাওয়া বয়ে যায় যদি কোনো সাঁঝে
ঘুম আসে না চোখে সারাটি রাতে।[৬]

---

২. আল কুরআন, ৪২ : ৪৯-৫০।
৩. আল কুরআন, ১৮ : ৪৬।
৪. আল কুরআন, ১৮ : ৭।
৫. আল কুরআন, ২৫ : ৭৪।
৬. মুহিউদ্দীন আব্দুল হামীদ, *কায়ফা নুরাব্বি আওলাদানা ইসলামিয়্যান*, জিদ্দা : মাকতাবাতুল খিদমাহ আল হাদীছাহ, ১৯৯৫ খৃ. .., পৃ. ১০৮।

অনুরূপ আল হাদীসেও শিশু সম্পর্কে অতি উচ্চাঙ্গের কথা বলা হয়েছে। যেমন,

০১. শিশুরা পৃথিবীবাসীর জন্য এক বিশেষ রহমত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 'কুঁজো বৃদ্ধ, আল্লাহভীরু যুবক, দুগ্ধপায়ী শিশু এবং বিচরণশীল পশু না থাকলে তোমাদের ওপর অনবরত আযাব নেমে আসতো'।[৭]

০২. শিশুরা হলো জান্নাতের বিহঙ্গ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশুদেরকে জান্নাতের বিহঙ্গ বলে আখ্যায়িত করেছেন। সহীহ্ হাদীসে এসেছে: খালিদ আল-আবসী রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমার এক পুত্র সন্তান মারা গেলে আমি প্রচণ্ড ব্যথিত হলাম। অতপর আমি আবু হুরায়র রা. কে বললাম: তুমি কি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমাদের মৃতদের ব্যাপারে কিছু শুনেছো, যা শুনলে আমাদের হৃদয় সান্ত্বনা পাবে। তিনি বলেন: মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি যে, 'তোমাদের শিশুরা হলো জান্নাতের বিহঙ্গ'।[৮]

০৩. শিশুর ওপর থেকে কলম তুলে নেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তিন ব্যক্তির থেকে কলম [জবাবদিহিতা] তুলে নেয়া হয়েছে, এক. ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত; দুই. শিশুবালেগ না হওয়া পর্যন্ত; তিন. পাগল সুস্থ ও জ্ঞান ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত।[৯]

ইসলাম শিশুর প্রতি এমন উন্নত ধারণা পোষণ ও তার প্রতি মায়া-মমতা, আদর-স্নেহ, ভালবাসা ও যত্ন নেয়ার কথা বলেই শেষ করেনি; বরং মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ

---

৭. আবূ ইয়া'লা আল মাওসিলী, *আল মুসনাদ*, তাহকীক : হুসাইন সালীম আসাদ, দামেশক : দারুল মাসুন লিত তুরছি, ১৪০৪হি./১৯৮৪খ্রি., খ. ১১, হাদীস নং-৬৬৩৩। হাদীসটির সনদ দুর্বল (ضعيف)

لَوْلَا شُيُوخٌ رُكَّعٌ ، وَشَبَابٌ خُشَّعٌ ، وَأَطْفَالٌ رُضَّعٌ ، وَبَهَائِمُ رُتَّعٌ لَصَبَّ عَلَيْكُمُ الْعَذَابَ صَبًّا

৮. ইমাম বুখারী, *আল আদাব আল মুফরাদ*, অধ্যায় : আত-তায়াম্মুম, অনুচ্ছেদ : ফাদলু মান মাতা লাহুল ওয়ালাদ, বৈরূত : দারুল বাশায়ের আল ইসলামিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৯ খ্রি., পৃ. ৬৩, হাদীস নং ১৪৫।

عَنْ خَالِدٍ الْعَبْسِيِّ قَالَ: مَاتَ ابْنٌ لِي، فَوَجَدْتُ عَلَيْهِ وَجْدًا شَدِيدًا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا تُسَخِّي بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا ؟ قَالَ: سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: صِغَارُكُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ

৯. ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, তাহকীক: আস সাইয়্যিদ আবুল মু'আতী আন নূরী, বৈরূত : আলিমুল কুতুব, ১৯৯৪ খ্রি., খ. ১, পৃ. ১৪০, হাদীস নং ১১৮৩।

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الطِّفْلِ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ يَعْقِلَ

গাইড লাইন হিসেবে বিশ্বের দরবারে শিশুর যথার্থ পরিচয়, শিশু প্রতিপালন পদ্ধতি ও শিশু অধিকারের নানা দিক যথার্থভাবে তুলে ধরেছে।

শিশুর পরিচয়

শিশু শব্দটি তৎসম বা সংস্কৃত। এর অর্থ: অল্প বয়স্ক বালক বা বালিকা, শাবক, বাচ্চা।[১০] শিশুর আরবী প্রতিশব্দ হলো: الطفل [তিফ্‌ল]। এর অর্থ– নবজাতক, শাবক, প্রত্যেক বস্তুর ক্ষুদ্র অংশ।[১১] শব্দটি আল কুরআনে প্রথমত: নবজাতক, সদ্যজাত,[১২] দ্বিতীয়ত: অবুঝ বাচ্চা,[১৩] তৃতীয়ত: বুঝমান নাবালেগ বালক[১৪] এ তিন অর্থে সকল মানব সন্তানকে বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

সাধারণ অর্থে আমরা অল্প বয়স্ক বালক-বালিকাকে শিশু হিসেবে বুঝি। তবে শিশুর পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে অনেকেই শিশুর বয়স ও শারীরিক বিকাশের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন :

০১. ইবনু মানযুর বলেন : "মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের ছেলে-মেয়েকে শিশু বলা হয়।"[১৫]

০২. ইন্টারনেটভিত্তিক মুক্ত বিশ্বকোষ 'উইকিপিডিয়া'তে বলা হয়েছে: "সাধারণত শিশু বলতে জন্ম থেকে কৈশোর স্তরে উন্নীত হওয়া পর্যন্ত সময়ের মানব সন্তানকে বুঝানো হয়।"[১৬]

০৩. দায়িরাতুল মাআরিফ আল-আলামিয়াহ (World Book Encyclopedia) তে উল্লেখ করা হয়েছে : "শিশু হলো সেই মানব সন্তান যে 'সান্নুর রুশ্দ' এ উপনীত হয়নি। এটি এমন বয়স, যে সময়ে অধিকাংশ মানুষের পূর্ণ শারীরিক পরিপক্কতা এসে যায়।"[১৭]

---

১০. আহমদ শরীফ, *সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯২, পৃ. ৫৯১।

১১. ইবনু মানযুর, *লিসানুল আরাব*, বৈরুত : দারু সাদর, ১৯৯০ খ্রি., খ. ৪, পৃ. ৪০১; ফিরুজাবাদী, *কামূসুল মুহীত*, সম্পাদনা: মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান আল মারা'শালী, বৈরুত : দারু ইহয়াউত তুরাছ আল 'আরাবী এবং মুয়াস্‌সাতুত তারীখ আল আরাবী, ১৯৯৭, খ. ২, পৃ. ১৩৫৫।

১২. আল কুরআন, ৪০ : ৬৭ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ; আল কুরআন, ২২ : ৫ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً

১৩. আল কুরআন, ২৪ : ৩১ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَـــاءِ

১৪. আল কুরআন, ২৪ : ৫৯ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

১৫. ইবনু মানযুর, *লিসানুল আরাব*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৪০১

১৬. দেখুন: http://en.wikipedia.org/wiki/Child

১৭. সম্পাদনা পরিষদ, *দায়িরাতুল মাআরিফ আল আলামিয়াহ*, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মালিক ফাহাদ আল-ওয়াতানিয়া, ১৯৯৬ খ্রি., খ. ১৫, পৃ. ৫৯২।

আবার অনেকে শিশুর পরিচয় দানের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক, মানসিক বিকাশ ও পরিপক্কতার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন:

০৪. শিশু গবেষক ড. তারিক আল বিকরী বলেন : "শিশু মানব জীবনের এমন একটি স্তর যা জন্মের পর থেকে শুরু হয় এবং পূর্ণ মানসিক বিকাশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দায়িত্ব পালনে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।"[১৮]

০৫. শাইখ হাসান আল-খুশুন বলেন : "শিশু বলতে বালেগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) বয়সে উপনীত হয়নি এমন মানবসন্তানকে বুঝানো হয়। আবার কখনো শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটেনি এমন ব্যক্তিকেও শিশু বলা হয়।"[১৯]

মোদ্দা কথা হলো: শিশু হলো মানব জীবনের একটি স্তর। সময়ের বিচারে এ স্তরটি মাতৃগর্ভে ভ্রূণ আসার পর থেকে ভূমিষ্ট হয়ে প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পরিব্যপ্ত। যতক্ষণ না একটি মানব সন্তানের মাঝে বুদ্ধির উন্নয়ন, শারীরিক পরিপক্কতা ও ভাল-মন্দের বিচার করার ক্ষমতা অর্জিত হয় এবং যতক্ষণ না শারয়ী বিধি-বিধান তার ওপর কার্যকর হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে শিশু হিসেবে বিবেচিত।[২০]

শিশুর বয়স কেন নির্ধারণ করা হয়?

আল্লাহ তাআলা মানুষকে বিভিন্ন স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তারই অনুগ্রহে মানব সন্তান সময়ের ব্যবধানে শৈশব-কৈশোর-যৌবন-বৃদ্ধ স্তরে পদার্পণ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন: مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا "তোমাদের কী হলো, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের পরোয়া করছো না? অথচ তিনি তোমাদেরকে নানা স্তরে সৃষ্টি করেছেন।"[২১] শৈশব বা শিশুকাল মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ স্তর শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রত্যেক মানব সন্তানের উপর শারয়ী ও সামাজিক নানা দায়-দায়িত্ব ও বিধি-বিধান আরোপিত হয়। ফলে শিশুকালের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা ও সঠিক বয়সসীমা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ ধারণা থাকা অপরিহার্য।

অন্যদিকে শিশুরা সমাজের অংশ হিসেবে আইনী ও সামাজিক সুবিচার পাওয়ার অধিকার রাখে। শিশু যেনো সুস্থ-স্বাভাবিক ও স্বাধীন মর্যাদা নিয়ে শারীরিক,

---

১৮. ড. তারিক আল বিকরী, *মাজাল্লাতুল আত্ফাল ওয়া দাওরুহা ফী বিনায়িশ শাখসিয়্যাহ আল ইসলামিয়্যাহ*, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ইমাম আওযায়ী ইউনিভার্সিটি, কুয়েত, ১৯৯৯ খ্রি., পৃ. ২৬-২৭।

১৯. শাইখ হাসান আল-খুশুন, *আত্ তুফূলাহ : মাফ্হুমুহা ওয়া মারাহিলুহা*, ইরানের গণমাধ্যম ও সংস্কৃতি অফিস থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বায়্যিনাত, সংখ্যা ২০৫, বর্ষ ২০০৭ খ্রি., পৃ. ৬।

২০. ড. তারিক আল বিকরী, *মাজাল্লাতুল আত্ফাল ওয়া দাওরুহা ফী বিনায়িশ শাখসিয়্যাহ আল ইসলামিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫; মুহাম্মদ ইবনু আলী আশ শাওকানী, *আদ দুরারী আল মুদিয়্যাহ শারহুদ দুরার আল বাহিয়্যাহ ফী মাসায়িলিল ফিক্বহিয়্যাহ*, কুয়েত : মুয়াস্সাতুর রাইয়ান, সংস্করণ-২, ১৯৯৬ খ্রি., পৃ. ৭।

২১. আল কুরআন, ৭১ : ১৩-১৪।

মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং সামাজিকভাবে পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারে– এজন্য শিশু কে বা কারা? তা চেনার সুনির্দিষ্ট আলামত বা বয়স নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা থেকেই শিশুর বয়স নির্ধারণের বিষয়টি উৎসারিত বলে প্রতিয়মান হয়।

শিশুর বয়সসীমা নির্ধারণে প্রচলিত আইনী জটিলতা

শিশুর বয়সসীমা নির্ধারণ নিয়ে মতান্তরের কোনো অন্ত নেই। দেশের প্রচলিত বিভিন্ন আইন, জাতীয় শিশুনীতি ও জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে শিশুর পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে তার বয়সসীমা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যক্ত করা হয়েছে। বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ড. শাহ্দীন মালিক বলেন: "শিশুদেরকে আলাদাভাবে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে অনেকগুলো বিধিবদ্ধ আইনে শিশু বলতে কী বোঝায় সে বিষয়টিকে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। যেমন বিভিন্ন বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে যার নিচে একজন ব্যক্তি শিশু হিসাবে বিবেচিত হবে। এই সকল ভিন্নতার অর্থ হলো, একটি আইনের অধীনে একজন ব্যক্তিকে যেভাবে শিশু হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে অন্য আইনে সেটা করা হয়েছে ভিন্নভাবে। আমরা শিশুদের বিষয়ে ৩৫টি আইন খুঁজে বের করেছি যা এই বিষয়টির জটিলতার ইঙ্গিত দেয়।"[২২]

শিশুর বয়সসীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিভিন্ন আইনে ভিন্নতা বা জটিলতা সম্পর্কে উদাহরণ স্বরূপ কিছু নমুনা পেশ করা হলো:

০১. **জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ** : এতে বলা হয়েছে শূণ্য (০) থেকে আঠার (১৮) বছর বয়সের সকল মানব সন্তানই শিশু। তবে শর্ত হলো অন্য কোনো আইনের আওতায় যদি তাকে সাবালক ঘোষণা না করা হয়। সনদটির প্রথম পর্বের Article-১ (অনুচ্ছেদ-১)-এ বলা হয়েছে: For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.[২৩] (এ সনদে ১৮ বছরের নিচে সব মানবসন্তানকে শিশু বলা হবে, যদি না শিশুর জন্য প্রযোজ্য আইনের আওতায় ১৮ বছরের আগেও শিশুকে সাবালক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।)

---

২২. শাহ্দীন মালিক, *শিশু আইন, ১৯৭৪ একটি পর্যালোচনা*, ঢাকা : সেভ দা চিলড্রেন ইউকে, ২০০৫, পৃ. ৫।

২৩. *Convention on the Rights of the Child*, General Assembly Resolution 44/25 of 20 November 1989 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Geneva, Switzerland.

সর্বাপেক্ষা ব্যাপকভাবে গৃহীত শিশু অধিকার সংক্রান্ত ৫৪ টি ধারা সম্বলিত এ সনদটি ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং ১৯৯০ সালের ২ সেপ্টেম্বর এটি আন্তর্জাতিক আইনের একটি অংশে পরিণত হয়। জাতিসংঘের সদস্য দেশের মধ্যে প্রথম যে ২২ টি দেশ সনদটি স্বাক্ষর ও অনুমোদন করে বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম। অথচ এ দেশের অন্যান্য আইনে শিশুর বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। যেমন :

০২. **চুক্তি আইন :** ১৮৭২ (১৯৭২ সনের ৯ নম্বর আইন) এর ১১ নম্বর ধারায় চুক্তির যোগ্যতা হিসেবে সাবালক ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, তবে তার সুনির্ধারিত বয়সসীমা উল্লেখ করা হয়নি।[২৪]

০৩. **সাবালকত্ব আইন :** ১৮৭৫ (১৮৭৫ সালের ৯ নম্বর আইন) এর ধারা-৩ এ শিশুর বয়সসীমা ১৮ ও ২১ দু'টি বয়সের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[২৫] বিশিষ্ট আইন বিশ্লেষক গাজী শামছুর রহমান বলেনঃ এ আইনের মতে, যার বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হয়েছে, তাকে বালেগ বলা হয়। তবে যার সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে আছে, তার বয়স ২১ বছর পূর্ণ হলে তবে তাকে বালেগ ধরা হয়।[২৬]

০৪. **রেলওয়ে আইন : ১৮৯০** (১৮৯০ সনের ৯ নম্বর আইন) এর ১২৬ থেকে ১৩০ ধারাসমূহের মতে, যার বয়স ১২ বছরের কম, সে যদি রেলপথে কোনো বাধা সৃষ্টি করে বা ক্ষতি করে বা এমন কাজ করে যাতে যাত্রীর জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, কিংবা রেলগাড়ির বা তার ইঞ্জিনের কোনো ক্ষতি করে, কিংবা এমন কাজ করে যা তার করা উচিত নয়, তবে সে অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে এবং তাকে শাস্তি দেয়া হবে।[২৭]

০৫. **দণ্ডবিধি : ১৮৬০** (১৯৬০ সনের ৪৫ নম্বর আইন) এর ৮২ ও ৮৩ ধারা মতে, ৯ থেকে ১২ বছরের কোনো শিশু না বুঝে কোনো অপরাধ করলে তা অপরাধ হিসেবে ধরা যাবে না।[২৮] তবে দণ্ডবিধির এ আইন রেলওয়ে আইনে অকার্যকর।[২৯]

---

২৪. *The Contract Act*, 1872, Act No. IX of 1872, Chapter II, Section 11.

২৫. *The Majority Act*, 1875, Act No. IX of 1875, Section 3.

২৬. গাজী শামছুর রহমান, *বাংলাদেশের আইনে শিশু প্রসঙ্গ*, ঢাকা : বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৫, পৃ. ১০২।

২৭. *The Railways Act*, 1890, Act No. IX of 1890, Chapter IX, Sections 126-130.

২৮. *The Penal Code*, 1860, Act No. XLV of 1860, Chapter IV, Section 82, Section 83, The word "nine" was substituted, for the word "seven" by section 2 of the Penal Code (Amendment) Act, 2004 (Act No. XXIV of 2004).

০৬. **ফৌজদারী কার্যবিধি** : ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এর ১৯৯ ধারায় বলা হয়েছে যে, দণ্ডবিধির ধারা ৪৯৭ অথবা ধারা ৪৯৮* এর জন্য আদালতে নালিশ, স্বামীকে বা তত্ত্বাবধায়ককে করতে হবে কিন্তু স্বামীর বয়স যদি ১৮ বছরের কম হয় তাহলে অন্য যে কোনো ব্যক্তি ফৌজদারী আদালতে নালিশ করতে পারেন তবে সেই ব্যক্তিকে আদালতের অনুমতি নিতে হবে। এ আইনে আরো বলা হয়েছে যে, জামিন অযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালত জামিন দিবে না। তবে অভিযুক্ত আসামীর বয়স যদি ১৬ বছরের কম হয়, তাহলে তাকে জামিনে মুক্তি দিবে।[৩০] অর্থাৎ এ আইনে ক্ষেত্র বিশেষ ১৮ ও ১৬ দু'টি বয়সের মানুষ শিশু হিসেবে বিবেচিত।

০৭. **খনি আইন** : ১৯২৩ (১৯২৩ সনের ৪ নম্বর আইন) এর ধারা ৩ এর (গ) 'তে বলা হয়েছে যে, 'শিশু' অর্থ যার বয়স ১৫ বছর পূর্ণ হয়নি এমন কোনো ব্যক্তি।[৩১]

০৮. **বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন** : ১৯২৯ (১৯২৯ সনের ২৯ নম্বর আইন) এর ধারা ২ এর (ক) 'তে বলা হয়েছে যে, 'শিশু' বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝায় যার বয়স পুরুষ হলে ২১ বৎসরের নিচে এবং নারী হলে ১৮ বছরের নিচে।[৩২] অর্থাৎ এ আইনে শিশুর বয়সসীমা নির্ধারণে নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে বৈষম্যনীতি অবলম্বন করা হয়েছে।

০৯. **নৈতিকতা-বিরোধী বৃত্তি দমন আইন** : ১৯৩৩ (১৯৩৩ সনের ৬ নম্বর আইন) এ আইনের ধারা-৩ এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, ১৮ বছর বয়সের কম বালিকাকে বেশ্যাগৃহে পাওয়া গেলে তাকে অনৈতিক উদ্দেশে আনা হয়েছে বলে অনুমান করা যাবে। এ আইনের ধারা ১১ মতে, যে মেয়ের বয়স ১৮ বছরের কম, তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো গৃহাঙ্গনে আটকে রাখা বা পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগের ইচ্ছায়

---

২৯. গাজী শামছুর রহমান, *বাংলাদেশের আইনে শিশু প্রসঙ্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭।

* দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সালের ৪৫ নম্বর আইন) এর ধারা ৪৯৭'তে বলা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো লোকের স্ত্রীর সাথে তার স্বামীর সম্মতি বা নীরব সমর্থন ছাড়া যদি যৌন সংগম করে তবে সেই ব্যক্তি ব্যভিচারের অপরাধে দোষী হবে এবং তাকে শাস্তি পেতে হবে। এবং ধারা ৪৯৮'তে বলা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির স্ত্রীকে যদি যৌন কাজের উদ্দেশে অপহরণ বা প্রলুব্ধ করে নিয়ে যায় বা আটক রাখে বা তার অবস্থিতি গোপন করে তবে সে দোষী হবে এবং তাকে শাস্তি পেতে হবে। --- দেখুন: *The Penal Code*, 1860 (Act No. XLV of 1860), Chapter XX, Section 497, Section 498.

৩০. *The Code of Criminal Procedure*, 1898 (Act No. V of 1898), Part VI, Chapter XV, Section 199.

৩১. *The Mines Act*, 1923 (Act No. IV of 1923), Chapter 1, Section 3(c).

৩২. *The Child Marriage Restraint Act*, 1929 (Act No. XIX of 1929), Section 2(a).

পতিতালয়ে রাখা আইনের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এবং ধারা ১২ মতে, ১৮ বছরের কম বয়সের মেয়ের অভিভাবক, পতিতাবৃত্তি গ্রহণের জন্য যদি তাকে উৎসাহিত বা সহায়তা করে, তবে সে অপরাধী।[৩৩]

১০. **মুসলিম বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন** : ১৯৩৯ (১৯৩৯ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা-২ এর (ঋ) মতে, ইসলামী আইনের অধীনে বিবাহিত কোনো মহিলা তার বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তাকে তার পিতা বা অন্য কোনো অভিভাবক বিবাহ দিলে এবং বিবাহে যৌন মিলন না হলে তার বয়স ১৯ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যদি তিনি বিবাহ অস্বীকার করেন, তাহলে তিনি এই কারণে আদালতের মাধ্যমে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য ডিক্রী লাভের অধিকারী হবেন।[৩৪]

১১. **ভবঘুরে আইন** : ১৯৪৩ (১৯৪৩ সনের ৭ নম্বর বেঙ্গল আইন) এর ধারা-২(৩)-এ শিশুর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, 'শিশু' অর্থ ১৪ বছরের কম বয়স্ক কোনো ব্যক্তি।[৩৫]

১২. **শিশু আইন** : ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৩৯ নম্বর আইন) বা এর ধারা-২(চ)'তে বলা হয়েছে যে, 'শিশু' অর্থ ১৬ বছরের কম বয়স্ক কোনো ব্যক্তি।[৩৬]

১৩. **জাতীয় শিশুনীতি ১৯৯৪ এ বলা হয়েছে** : "বাংলাদেশের বিভিন্ন আইনে শিশুর বয়সসীমা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে ১৪ বছর পূর্ণ হয়নি এমন ছেলেমেয়েদের শিশু হিসেবে গণ্য করা হবে।"[৩৭] আবার 'জাতীয় শিশুনীতি ২০১১' তে বলা হয়েছে: "শিশু বলতে আঠারো বছরের কম বয়সী বাংলাদেশের সকল ব্যক্তিকে বুঝাবে। দেশের প্রচলিত কোনো আইনে এর ভিন্নতা থাকলে এই নীতির আলোকে প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার।"[৩৮]

---

৩৩. *The Suppression of Iimmoral Traffic Act*, 1933 (Act No. VI of 1933), Section 3, 11, 12; এ আইনের ধারা ১১ অনুযায়ী অপরাধী তিন বছর পর্যন্ত করাদণ্ডে অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং ধারা ১২ অনুযায়ী অপরাধী দুই বছর পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড কিংবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডণীয় হবেন; তিনি পুরুষ হলে বেত্রদণ্ডেও দণ্ডনীয় হবেন।

৩৪. *The Dissolution of Muslim Marriages Act*, 1939 (Act No. VIII of 1939), Section 2(vii).

৩৫. *The Vagrancy Act,* 1943, Bengal Act No. VII of 1943, Section, 2(3).

৩৬. *The Children Act*, 1974 (Act No. XXXIX of 1974), Part I, Section 2(f)

৩৭. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'জাতীয় শিশুনীতি, ১৯৯৪খ্রি.'।

৩৮. দেখুন: www. mowca.gov.bd/?page_id=36

এভাবে দেশের শিশু নীতিমালা ও বিভিন্ন আইনে শিশুর পরিচয়দানের ক্ষেত্রে যে বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে তা একটি অন্যটির সাথে সামঞ্জস্যহীন ও সাংঘর্ষিক। শিশুর জন্য রচিত এসব আইন ও নীতিমালা দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে প্রণয়ন করা হলেও মূলত এসব নীতিমালা ও আইনে শিশুর পরিচয়দানের ক্ষেত্রে বিপরীতমুখী ও নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে বৈষম্যনীতি অবলম্বন করা হয়েছে। একমাত্র ইসলাম এ ক্ষেত্রে শিশুর যথার্থ পরিচয় ও যৌক্তিক বয়সসীমা তুলে ধরেছে।

শিশুর বয়সসীমা নির্ধারণে প্রচলিত আইনী জটিলতার ইসলামী সমাধান

শিশুর পরিচয়দানের ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যার সমাধানকল্পে ইসলাম বয়ঃসন্ধি বা সাবালকত্বের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। তাই ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে বালেগ বা সাবালক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত একজন পুরুষ ও নারী শিশু হিসেবে বিবেচিত হয় এবং সাবালক তথা বয়ঃসন্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েদের শিশুত্বের সমাপ্তি ঘটে আর তখনই প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ হিসেবে তার উপর শরয়ী বিধি-বিধান কার্যকর হয়। তবে কোনো বালক-বালিকার মধ্যে সাবালক হওয়ার কোনো লক্ষণ যদি আদৌ প্রকাশ না পায়, সেক্ষেত্রে বয়স ১৫ বছর পূর্ণ হলে তাকে সাবালক হিসেবে ধরা হবে।[৩৯]

ইসলাম বয়ঃসন্ধির সাথে শিশুর পরিচয় নির্ধারণ করায় বিশেষজ্ঞমহল এটিকে একটি বিশ্বময় সার্বজনীন ও যথার্থ নীতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ, গবেষণায় দেখা গেছে, আর্থ-সামাজিক, পারিপার্শ্বিক ও আবহাওয়ার তারতম্যের ভিত্তিতে একেক দেশের শিশুর মাঝে একেক বয়সে বয়ঃসন্ধি ঘটে থাকে। আর বয়ঃসন্ধির ফলেই সাধারণত: একটি মানুষের মাঝে চিন্তা-চেতনা ও বিবেক-বুদ্ধির উন্মেষ ঘটে, জ্ঞানের বিশেষ দরজা খোলে এবং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তাই প্রচলিত আইন অনুযায়ী কোনো একটি সুনির্দিষ্ট বয়সের ফ্রেমে শিশুকে বেঁধে ফেলা অর্থই হলো প্রকৃতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া, যা কোনো ভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

আল কুরআনের ভাষ্য– حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ "যতক্ষণ না তারা বিয়ের বয়সে উপনীত হয়"[৪০], অপর ভাষ্য– وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ "আর তোমাদের নিজেদের সন্তানরা যখন বয়োপ্রাপ্ত হয়ে যায়"[৪১] এ আয়াতাংশদ্বয় দ্বারা ইসলামী আইন বিশারদ ও মুফাস্‌সিরগণ শিশুর শেষ সময়সীমা বালেগ বা সাবালকত্বকে নির্ধারণ করেছেন। শিশুর সাবালকত্ব নিয়ে অসংখ্য মনীষী তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। অনেকে এ ক্ষেত্রে মনগড়া মন্তব্য করতেও দ্বিধা করেন নি। সাবালকত্ব নির্ণয়ে অধিক প্রচলিত ৭টি মত পাওয়া যায়। ইমাম আবুল হাসান আল আশআরীর দৃষ্টিতে এসব মত হলো–

---

৩৯. এই প্রবন্ধের পরের দিকে এ বিষয়ে দলিল-প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হয়েছে- *লেখক*

৪০. আল কুরআন, ৪ : ৬।

৪১. আল কুরআন, ২৪ : ৫৯।

০১. শিশুর বুদ্ধির পরিপক্কতা না হওয়া পর্যন্ত সাবালক হয় না। বুদ্ধির উন্মেষের প্রমাণ হচ্ছে মানুষ ও পশুর মধ্যে ক্ষতি ও উপকারের বিষয়ে পার্থক্য বোঝা। তা ছাড়া বিদ্যা অর্জনে সামর্থ্যবান হওয়া।

০২. মনীষী মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব আল জাযায়িরী বলেন, শিশুর সাবালকত্ব হচ্ছে বুদ্ধির এমন পরিপক্কতা যার দ্বারা সে নিজেকে পাগল যা করে তা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম।

০৩. বাগদাদের তৎকালীন পণ্ডিতগণ বলেন, সুস্থ ও মুকাল্লাফ হওয়া এবং পাগলের পার্থক্য বোঝার সক্ষমতা শরীয়তে শিশুর সাবালকত্বের নিদর্শন।

০৪. আল্লামা ছুমামা ইবনু আশরাস আন-নামায়রীর মতে, মানব শিশু তখন সাবালকত্ব লাভ করে যখন সে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ সে আল্লাহ, রাসূলুল্লাহ্, কিতাব প্রভৃতি বিষয়ে বুঝতে সক্ষম হয়।

০৫. অধিকাংশ মুতাকাল্লিমীন (যুক্তিবিদগণ) এর মতে, মানব শিশুর মধ্যে বুদ্ধির পরিপূর্ণতাই হচ্ছে সাবালকত্বের প্রমাণ।

০৬. অধিকাংশ ফিক্হবিদগণের মতে, দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়ে স্বাভাবিক থাকা অবস্থায় তার স্বপ্নদোষ হওয়া শিশুর সাবালকত্বের নিদর্শন অথবা তার বয়স ১৫ বছর হওয়া। তবে কোনো কোনো ফিক্হবিদ শিশুর সাবালকত্বের বয়সসীমা ১৭ বছর মনে করেন।

০৭. কিছু সংখ্যক পণ্ডিতের মতে, তার বুদ্ধির অধিকাংশ প্রতিবন্ধকতা দূর না হওয়া পর্যন্ত বয়স ত্রিশ বছর এবং স্বপ্নদোষ হলেও শিশুত্ব হারাবে না। অর্থাৎ সাবালকত্ব লাভ করবে না।[৪২]

তবে কুরআন-হাদীসের গবেষণালব্ধ প্রকৃত ও মৌলিক কথার ভিত্তিতে উলামায়ে কেরামের মতামত হলো– ছেলে হোক বা মেয়ে হোক মানব সন্তানের মাঝে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেলে তার শিশুত্বের পরিসমাপ্তি ঘটেছে বলে ধর্তব্য হবে:

০১. ভাল-মন্দ বোঝার ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া : ফিকহের ভাষায় একে 'সানুনুর রুশ্দ' বলা হয়েছে। এটি মানব জীবনের এমন একটি স্তর, যে স্তরে পদার্পণ করার ফলে একটি শিশুর মাঝে বুদ্ধির পরিপক্কতা, শারীরিক সক্ষমতা ও ভাল-মন্দের পার্থক্য নিরূপণের জ্ঞান অর্জিত হয় এবং 'মুকাল্লাফ বিশ্ শারঈ' তথা শরীয়তের বাধ্যবাধকতার আওতাভুক্ত হয়। এ স্তরে উন্নীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মানব সন্তানকে শিশু বলা হবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

---

৪২. আবুল হাসান আলী ইবনু ইসমাঈল, *মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন ওয়া ইখতিলাফুল মুসাল্লীন*, মুহাম্মাদ মুহীউদ্দীন আব্দুল হামীদ সম্পাদিত, কায়রো : নাহদাতুল মিসরিয়্যাহ, ১৯৬৯ খ্রি., মাকালাহ বা প্রবন্ধ নং ২৩৫, পৃ. ১৭৫।

أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

"কিংবা এমন শিশু যারা নারীদের গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে কিছুই জানে না।"[৪৩] ভাল-মন্দ বোঝার ক্ষমতা অর্জন হলে, তখন আর সে শিশু হিসেবে পরিগণিত হবে না। এদিকে ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

"যদি তাদের মাঝে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখতে পাও, তবে তাদের সম্পদ তাদের কাছে ফিরিয়ে দাও।"[৪৪] ভাল-মন্দ বোঝার ক্ষমতা সাধারণত বয়ঃপ্রাপ্তির পরই এসে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন: ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ "অতঃপর আমি তোমাদেরকে একটি শিশু হিসেবে [মাতৃগর্ভ থেকে] বের করে আনি, অতঃপর তোমরা তোমাদের পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করো।"[৪৫]

তবে কারো মাঝে ভাল-মন্দ বোঝার ক্ষমতা না থাকলেও যদি সে সুস্থ ও বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী না হয়, তাহলে মুকাল্লাফ বিশ শারঈ হিসেবে তাকে ১০ বছর বয়স থেকে বাধ্যতামূলক সালাত আদায় করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "তোমাদের সন্তানরা সাত বছর বয়সে পদার্পণ করলে তাদেরকে সালাতের আদেশ দাও। আর দশ বছরে পদার্পণ করে সালাত আদায় না করলে তাদেরকে প্রহার করো এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।"[৪৬] এ হাদীসের উপর ভিত্তি করে শিশুর বয়স ১০ বছর হলে শিশুত্বের পরিসমাপ্তি হয়েছে বলে, তার উপর 'হদ্দ' বা দণ্ডবিধি বা সাজা জারি করা যাবে না। কারণ, হাদীসটির মাধ্যমে শুধুমাত্র সালাতের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতার বিধান জারি করা হয়েছে।

০২. সাবালকত্বের বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া : এ ক্ষেত্রে ছেলেদের দাঁড়ি-গোফ গজানো বা স্বপ্নদোষ হওয়া এবং মেয়েদের ঋতুস্রাব বা স্বপ্নদোষ হওয়া। মানব সন্তানের মাঝে এ ধরনের লক্ষণ প্রকাশ পেলে তার শিশুত্বের পরিসমাপ্তি ঘটার ব্যাপারে সকল ইমাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

---

৪৩. আল কুরআন, ২৪ : ৩১।

৪৪. আল কুরআন, ৪ : ৬।

৪৫. আল কুরআন, ২২ : ৫।

৪৬. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আস-সালাম, অনুচ্ছেদ : মাতা ইউমারুল গুলামু বিস-সালাত, বৈরূত : দারুল কিতবিল আরাবিয়্যি, তা.বি., খ. ১, পৃ. ১৮৫, হাদীস নং-৪৯৫। আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী এর মতে হাদীসটির সনদ হাসান সহীহ (حسن صحيح) *সহীহ আবু দাউদ*, হাদীস নং-৪৬৬।

مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا ، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

"আর তোমাদের নিজেদের সন্তানরা যখন বয়োপ্রাপ্ত হয়ে যায়, তখন তারা যেনো [তোমাদের কামরায় প্রবেশের আগে] সেভাবেই অনুমতি নেয়, যেভাবে তাদের আগে [বড়রা] অনুমতি নিতো।"[৪৭] এ আয়াতে 'হুল্‌ম' বলতে ইহতেলাম বা স্বপ্নদোষ বা সাবালকত্বের নিদর্শনকে বুঝানো হয়েছে। বিখ্যাত ফিক্‌হ বিশ্বকোষ 'আল মাওসু'আহ আল ফিকহিয়্যাহ'তে বলা হয়েছে: হুল্‌ম বা ইহতেলাম বলতে স্বপ্নে বা জাগ্রত অবস্থায় নারী বা পুরুষের 'মনি' বা বীর্য বের হওয়াকে বুঝায়।[৪৮] সাধারণত এ বিশেষ লক্ষণ একটি শিশুর ভিতর ৯ বছর পরে-ই প্রকাশ পেয়ে থাকে। ঘটনাচক্রে যদি নয় বছরের পূর্বে কোনো মেয়ে শিশুর ঋতুস্রাব হয়, তাহলে তা হায়েয বা সাবালকত্বের লক্ষণ হিসেবে গণ্য হবে না।[৪৯]

০৩. বিয়ের বয়সে উপনীত হওয়া : কিছু কিছু বিজ্ঞপণ্ডিতের মতে, বিয়ের একটা স্বাভাবিক ও বাস্তবিক পর্যায় রয়েছে, আর তা হলো শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপরীত লিঙ্গের মানুষের সাথে বৈবাহিক জীবন যাপনে সক্ষম হওয়া। তারা বলেন: মানব সন্তানের মাঝে বুদ্ধির উন্মেষ ঘটার পর, সে যদি শারীরিকভাবে বিয়ের বয়সে পদার্পণ করার যোগ্যতা অর্জন করে, তাহলে তার শিশুত্বের পরিসমাপ্তি ঘটেছে বলে ধরতে হবে। তাদের দলীল হলো– আল্লাহ তাআলার বাণী, حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ "যতক্ষণ না তারা বিয়ের বয়সে উপনীত হয়"[৫০] আয়াতাংশে ইয়াতীম ও শিশুর শেষ সময়সীমা বলতে বিবাহের বয়সে উপনীত হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। তারা এ আয়াত ও 'খিয়ারুল বুলুগ'[৫১] এর উপর ভিত্তি করে বলেন, একটি মানব সন্তান বিয়ের

---

৪৭. আল কুরআন, ২৪ : ৫৯।

৪৮. সম্পাদনা পরিষদ, *আল মাউসুআহ আল ফিকহিয়্যাহ*, কুয়েত : আওকাফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯৩ খ্রি., খ. ৮, পৃ. ১৮৮।

৪৯. সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতাওয়া আলমগীরী*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তা.বি., খ. ১, পৃ. ৩৬।

৫০. আল কুরআন, ৪ : ৬।

৫১. নাবালেগ অবস্থায় অভিভাবক বিয়ে দিলে, বালেগ হবার পর প্রত্যেক মুসলিমের ঐ বিয়ে নাকচ করার অধিকার রয়েছে। ইসলামী আইনের পরিভাষায় একে বলা হয় খিয়ারুল বুলুগ। হাদীছে এসেছে :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ : أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন বালিকা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে বললো যে, তার পিতা তাকে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিয়ে দিয়েছে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বিয়ে ছিন্ন করার স্বাধীনতা দিলেন। — দেখুন: ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আন-নিকাহ, অনুচ্ছেদ : ফিল বিকরি ইউযাওয়িযুহা আবুহা ওয়ালা ইয়াসতা মিরুহা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৯৫, হাদীস নং-২০৯৮; আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী এর মতে হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح) সহীহ আবু দাউদ, হাদীস নং-১৮৪৫।

স্বাভাবিক ও বাস্তবিক পর্যায়ে পদার্পণ করেছে কি–না, তা তার শৈশবত্ব পরিমাপের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ তাদের মতে, একটি শিশুর সাবালকত্ব নির্ণয়ের অন্যতম পন্থা হলো– তার বিয়ের বয়সে উপনীত হওয়া।

প্রকৃত পক্ষে বর্ণিত আয়াতটির পূর্বাপর আলোচনা ও ব্যাখ্যার ভিত্তিতে বিয়ের সাথে শিশুত্বের পরিসমাপ্তি ঘটার বিষয়টি অযৌক্তিক ও অ-দালিলিক। কারণ, একটি শিশু বিয়ের বয়সে পদার্পণ করেছে কি–না, তা জানতে হলে প্রয়োজন তার সাবালকত্ব নির্ণয় করা। অপরদিকে 'বিয়ের বয়সে উপনীত হওয়া' এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় প্রায় সকল বিখ্যাত তাফসীরে সাবালকত্ব বা বালেগ হওয়াকে বুঝানো হয়েছে।[৫২] কাজেই 'বিয়ের বয়সে উপনীত হওয়া' আর সাবালকত্বে পদার্পণ করা একই বিষয়। শিশুর শৈশবত্বের মেয়াদ জানার জন্য বিয়ের বয়সে উপনীত হওয়াকে আলাদা করে দেখার সুযোগ নেই।

প্রসঙ্গত এখানে আয়িশা রা.-এর উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বিয়ে করেন, যখন আমার বয়স মাত্র ছয় বছর। আর তিনি আমাকে নিয়ে ঘর বাঁধেন যখন আমি নয় বছরের মেয়ে।[৫৩] এ হাদীস ও দলীল-প্রমাণাদির ভিত্তিতে ফিক্‌হবিদ ও মুজতাহিদগণ বলেন: বিয়ে যে কোনো বয়সে হতে পারে। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ড. মুস্তফা আস সিবায়ী বলেন: "চারটি মাযহাবসহ অন্যান্য মাযহাবের ইজতিহাদী রায় হচ্ছে– বালেগ [সাবালক] হয়নি, এমন ছোট ছেলে-মেয়ের বিয়ে শুদ্ধ ও বৈধ।"[৫৪] অতএব বলা যায় যে, বিয়ের সাথে শিশুত্বের পরিসমাপ্তি ঘটার পক্ষাবলম্বনকারীদের মতামতটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

এখন কথা হলো– কোনো বালক-বালিকার মধ্যে সাবালক হওয়ার বর্ণিত কোনো লক্ষণ যদি আদৌ প্রকাশ না পায়, সেক্ষেত্রে ইসলামের দিক-নির্দেশনা কী? সংক্ষেপে এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, এ ক্ষেত্রে ইসলামের বিশুদ্ধ তথ্যমতে ইজতিহাদী রায় হলো– শিশুর বয়স ১৫ বছর পূর্ণ হলে তাকে সাবালক হিসেবে গণ্য করা হবে।[৫৫] আর তার দলিল-প্রমাণ হলো:

---

৫২. আবু বাকর আল জাযায়েরী তাঁর *আইসারুত তাফাসীর* গ্রন্থে সূরা আন নিসার এ (৬ নম্বর) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : بَلَغُوا النِّكَاحَ أي سِنَّ الزَّوَاجِ وَهِيَ الْبُلُوغُ বালাগুন নিকাহ অর্থাৎ বিবাহের বয়সে উপনীত হওয়া আর তা হলো সাবালকত্ব অর্জন করা। অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে– *তাফসীর আল কুরতুবী, তাফসীর আত তাবারী, আত তাফসীরুল ওয়াসীত, তাফসীরুল কাত্তান, আওযাহুত তাফাসীর* প্রভৃতি তাফসীর গ্রন্থে।

৫৩. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ মুসলিম*, বৈরুত : দারুল জীল ও দারুল আফাক আল জাদীদাহ, তা.বি., খ. ৪, পৃ. ১৪২, হাদিস নং ৩৫৪৫।

عن عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين وبنى بي وأنا بنت تسعة سنين

৫৪. ড. মুস্তফা আস-সিবায়ী, *আল মারআতু বায়নাল ফিকহি ওয়াল কানূন*, প্রকাবি, তা.বি., পৃ. ৫৭।

৫৫. মুফতী মুহাম্মাদ শফী, *তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন*, অনুবাদ : মুহীউদ্দীন খান, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪ খ্রি., খ. ২, পৃ. ২৮৭; গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামে নারী ও শিশু প্রসঙ্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯।

০১. আব্দুলাহ ইবনে উমর রাযিয়ালাহু আনহু উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে অনুমতি চাইলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন না। তখন তার বয়স ছিল ১৪ বছর। পরের বছর খন্দকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য অনুমতি চাইলে তাকে যুদ্ধে যাবার অনুমতি দেয়া হয় যখন তার বয়স ছিল ১৫ বছর। হাদিসের রাবী নাফি' বলেন, এ ঘটনা উমর ইবনু আব্দুল আজীজ শুনে মন্তব্য করলেন: 'এটাই হলো শিশু ও বয়স্কদের বয়সসীমা,'[৫৬]

০২. সুফিয়ান ছাওরী, ইবনুল মুবারক, শাফিয়ী, আহমাদ, ইসহাক প্রমুখ ইমামগণ বলেন: "শিশুর বয়স ১৫ বছর পূর্ণ হলেই সে পরিপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হবে। যদি ১৫ বছরের পূর্বেই স্বপ্নদোষ হয় তাহলেও সে পরিপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য।"[৫৭]

০৩. ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর বিশেষ মত হলো: "১৫ বছর পূর্ণ হওয়ার পর শরীরে বয়ঃপ্রাপ্তির লক্ষণ প্রকাশ না পেলেও বালক ও বালিকা উভয়কেই শরীয়তের দৃষ্টিতে বালেগ বলে গণ্য করতে হবে। অর্থাৎ ইসলামে অনধিক ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত একজন বালক-বালিকা শিশু হিসেবে বিবেচিত হয়।"[৫৮]

০৪. শারহুল আকীদাহ আত তাহাবিয়্যাহতে উল্লেখ করা হয়েছে: "যখন কোনো শিশুর মাঝে বালেগের আলামত পশম গজায় বা স্বপ্নদোষ হয় কিংবা ১৫ বছর বয়সে উপনীত হয়, তাহলে সে সাবালক হিসেবে গণ্য হবে।"[৫৯]

---

৫৬. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আশ-শাহাদাত, অনুচ্ছেদ : বুলুগুস সিবইয়ান ওয়া শাহাদাতিহিম, বৈরূত : দারু ইবনু কাছীর, ১৪০৭হি./১৯৮৭খ্রি., খ. ২, হাদীস নং-২৫২১; ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ইমারাহ, অনুচ্ছেদ : বায়ানু সিন্নুল বুলুগ, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৯, হাদীস নং-৪৯৪৪।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ عَرَضَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِى وَعَرَضَنِى يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِى. قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

৫৭. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আহকাম, অনুচ্ছেদ : মা জাআ ফী হদ্দি বুলুগির রজুলি ওয়াল মারআতি, বৈরূত : দারু ইহইয়াই তুরাছিল আরাবিয়্যি, খ. ৩, হাদীস নং-১৩৬১।

سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِىُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ يَرَوْنَ أَنَّ الْغُلاَمَ إِذَا اسْتَكْمَلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرِّجَالِ وَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرِّجَالِ. وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ الْبُلُوغُ ثَلاَثَةُ مَنَازِلَ بُلُوغُ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ الاِحْتِلاَمُ فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ سِنُّهُ وَلاَ احْتِلاَمُهُ فَالإِنْبَاتُ يَعْنِى الْعَانَةَ.

৫৮. মুফতী মুহাম্মদ শফী , *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭

৫৯. ড. সাফর ইবনু আব্দুর রহমান আল হাওয়ালী, *শারহুল 'আকীদাহ আত্ তাহবিয়্যাহ*, সফট্ওয়্যার: আল মাকতাবাহ আশ শামিলাহ, ৩য় সংস্করণ, তা.বি., খ. ২, পৃ. ১৩৮১

إذا رأى الطفل علامة البلوغ من شعر أو احتلام أو بلغ سنة الخامسة عشر أصبح من البالغين

শিশুর বয়স সাবালকত্ব ও অনধিক ১৫ বছর নির্ধারণের তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইসলামের দৃষ্টিতে একটি শিশুর মাঝে সাবালকত্ব বা বয়ঃসন্ধি ঘটলে ধরে নিতে হবে যে, তার শিশুত্বের পরিসমাপ্তি হয়েছে। তবে কারো মাঝে বয়ঃসন্ধির লক্ষণ আদৌ পাওয়া না গেলে তার বয়স ১৫ বছর পূর্ণ হলে তাকে পূর্ণ মানব হিসেবে গণ্য করা হবে এবং এ সময় থেকে তাকে ইসলামের সকল অনুশাসন মেনে চলতে হবে। শিশুর বয়স সাবালকত্ব এবং বয়সের বিচারে অনধিক ১৫ বছর উল্লেখ করার পিছনে নানা যৌক্তিক কারণ রয়েছে বলে আমরা মনে করি।

প্রথমত : অবাধ তথ্য-প্রযুক্তি, স্যাটেলাইট ও ডিজিটালের এ যুগে দেখা যাচ্ছে যে, পনের বছর পূর্ণ হতে না হতেই তারা সাবালকত্ব অর্জন করছে এবং বুদ্ধির বিকাশের দিক থেকে পূর্ণ মানবে পদার্পণ করছে। এ বয়সের ছেলে-মেয়েরা যেনো শারয়ী বিধি-বিধান পালনে যত্নবান হয় এবং শরীয়তের বিরুদ্ধে অবস্থান না নেয়, সে জন্য ইসলাম ৫ বছর বয়সী মানব সন্তানকে পূর্ণ মানব হিসেবে মর্যাদা দিয়েছে। অন্যদিকে এ বয়সের ছেলে-মেয়েরা যেনো ভবিষ্যৎ জীবন গড়ার ব্যাপারে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে; ইসলাম এটাই কামনা করে। এখানে একটি বিষয় স্মরণযোগ্য যে, অধিকাংশ আইনে শিশু বলতে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সময়ের মানব সন্তানকে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো– তাহলে কি ইসলাম ১৫ থেকে ১৮ এ তিন বছর শিশুকে 'শিশু অধিকার' থেকে বঞ্চিত করলো? এর উত্তরে বলা যায় ১৫ থেকে ১৮, এ তিন বছরসহ পরবর্তী জীবনে নারী হোক আর পুরুষ হোক প্রত্যেকেই ইসলামের দৃষ্টিতে প্রাপ্তবয়স্ক মানব সন্তান হিসেবে 'মানবাধিকার'-এর সকল সুযোগ-সুবিধা পাবেন। শিশু হিসেবে নয়। এভাবে ইসলাম শিশুর পরিচয় ও তার বয়সসীমা নির্ধারণ করে শিশু অধিকার ও মানবাধিকারকে পৃথক করেছে বলেও মন্তব্য করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত : জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ এর স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে শিশুর বয়সসীমা ১৮ বছর নির্ধারণ করতে আমরা বাধ্য– এ ধারণাটি সঠিক নয়। কারণ, জাতিসংঘের CRC (Convention on the Rights of the Child) এর Article 1 এ বলা হয়েছে যে,

"For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier."[৬০]

অর্থাৎ বর্তমান কনভেনশনের লক্ষ্য অনুযায়ী শিশু বলতে বুঝায় ১৮ বছর বয়সের প্রতিটি মানুষ। যদি না তার উপরে প্রযোজ্য আইন মোতাবেক সে আরো কম বয়সে প্রাপ্তবয়স্ক বলে বিবেচিত হয়।

---

৬০. *Convention on the Rights of the Child*, General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Geneva, Switzerland.

কোনো দেশে ১৫ বছর পূর্ণ বয়সী মানব সন্তানকে শিশু ধরা হলে CRC আইন হিসেবে সে শিশু হিসেবে বিবেচিত। এ প্রসঙ্গে নাইজেরিয়ার প্রখ্যাত গবেষক মূসা উছমান আবূ বকর তার একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে,

McGoldrick rightly opines that Article 1, does not establish 18 years as standard age but allows state party to provide in its national law an age lower than 18 years as age of majority.[৬১]

অর্থাৎ ম্যাকগোল্ডরিক যথার্থই বলেছেন যে, অনুচ্ছেদ ১-এ ১৮ বছরকে আবশ্যিক/একমাত্র গ্রহণযোগ্য বয়স হিসেবে চাপিয়ে দেয় না বরং রাষ্ট্রপক্ষকে এর চেয়ে কম বয়সকে 'শিশু বয়স' হিসেবে জাতীয় আইন প্রণয়নের বৈধতা ও অনুমতি দেয়।

তৃতীয়ত : অনেক সাংবাদিক, সুশীল সমাজ ও সমাজ সচেতন নাগরিক এ মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, প্রচলিত বিভিন্ন আইনে ১৬ থেকে ১৮ বছরের মানব সন্তানকে শিশু হিসেবে বিবেচনা করায় অনেক ক্ষেত্রে শিশু-কিশোর অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে। পত্র-পত্রিকা, বেতার-টেলিভিশন, ইন্টারনেট খুললেই চোখে পড়ে বয়োপ্রাপ্ত পাকা বুদ্ধির এ বয়সের শিশুরা বয়সের সুযোগ নিয়ে আইনের চোখে আঙ্গুল দিয়ে নানা অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ছে এবং অন্যের দ্বারা বিভিন্ন অসামাজিক ও বেআইনী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বাস্তবতা হলো ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সের কিশোররা শুধুমাত্র আমাদের দেশেই নয়; ইউরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ও রাজ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং লুটতরাজের মতো ঘটনায়ও জড়িয়ে পড়ছে। আমাদের দেশে এ বয়সের কিশোররা গ্রুপ বা বাহিনী গড়ে সন্ত্রাসী, মাস্তানী, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, জায়গা-জমি দখল-বেদখলে সহযোগিতা এবং আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে নানা দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে যাচ্ছে। কেউ কেউ মাদক সেবনের মতো মরণ নেশায় জড়ানোর পাশা পাশি মাদকদ্রব্য আনা নেয়া ও বেচা-কেনার কাজও চালাচ্ছে। বিভিন্ন এলাকায় একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, এ বয়সের কিশোররা পান থেকে চুন খসলেই দলবদ্ধভাবে লাঠি-সোঠাসহ নানা রকম আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিপক্ষের উপর। হত্যা ও ধর্ষণের মতো জঘণ্য কাজে কিশোরদের সম্পৃক্ততা বিশ্ববিবেককে অবাক করে দিচ্ছে।[৬২]

---

৬১. Musa Usman Abubakar, *Child's Rights Act : Critical Analysis From the Islamic Perspective,* বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন : http://www.gamji.com/article4000/NEWS4861.htm

৬২. সামাজিক ও নৈতিক এমন অধঃপতন থেকে সন্তানকে রক্ষা করার জন্য প্রথমে মা-বাবাকেই দায়িত্ব নিতে হবে। প্রতিদিন অন্তত কিছুটা সময় সন্তানকে দিতে হবে। তার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে। খোঁজ-খবর রাখতে হবে সন্তান কোথায় যাচ্ছে, কী করছে ইত্যাদি

সম্প্রতি ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে গণধর্ষণের শিকার হয়ে এক ছাত্রীর মৃত্যুর ঘটনায় জড়িত একজনের বয়স ১৭ বছর হওয়ায় শিশুর বয়সসীমা ১৮ থেকে কমিয়ে আনার জোর দাবি ওঠেছে। এ তিক্ত বাস্তবতা উপলব্ধি করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারতের সব রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের এক বৈঠকে নাবালকত্বের বয়সসীমা দুই বছর কমিয়ে ১৮ থেকে ১৬ বছর করার প্রস্তাব উত্থাপন করে। এ প্রস্তাবকে সমর্থন জানায় তামিলনাড়ু ও উত্তরপ্রদেশ সরকার। বৈঠকে এ প্রস্তাবের সঙ্গে অন্যরাও সহমত পোষণ করেন।[৬৩] এ বিষয়টি শিশুর বয়সসীমা ১৫ বছর নির্ধারণ করার বাস্তব যৌক্তিকতাকে আরো শক্তিশালী করেছে।

উপসংহার

ইসলাম শিশুর পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে সাবলকত্ব বা বয়ঃসন্ধির উপর গুরুত্ব দেয়ায় সকল শ্রেণির বিজ্ঞমহলে এটি একটি যুক্তি-সঙ্গত, গ্রহণযোগ্য ও সার্বজনীন বিধান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। কারণ, একটি শিশুর মাঝে বয়ঃসন্ধি হয় সম্পূর্ণ প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। আর প্রাকৃতিক নিয়ম গ্রহণের মাঝেই রয়েছে প্রভূতকল্যাণ। কেননা, একটি শিশুর পরিচয় তার সাবলকত্ব তথা প্রাকৃতিক নিয়মের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় অভিভাবক ও পরিবারকে তার উপর বাড়তি নজর বা গুরুত্ব দিতে হয়; কখন তার সাবালকত্ব আসে, কখন তার শিশুত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে।

অতএব একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ইসলামে 'শিশুর পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রে সাবলকত্ব বা বয়ঃসন্ধির উপর গুরুত্ব দেয়া এবং বয়সের বিচারে অনধিক ১৫ বছর নির্ধারণ করা' একটি প্রকৃতিসম্মত, যুক্তিসঙ্গত এবং বিজ্ঞানসম্মত গ্রহণযোগ্য বিধান হিসেবে স্বীকৃত। কাজেই কুরআন, হাদীস ও ফকীহদের ইজতিহাদী রায়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে এবং বর্তমান যুগের শিশুর শারীরিক ও মানসিক পরিপক্কতার প্রেক্ষিতে ১৫ বছর পূর্ণ হয়েছে এমন মানব সন্তানকে পূর্ণবয়স্ক মানুষ হিসেবে গণ্য করা অধিক যুক্তিযুক্ত।

বিষয়ে। একইভাবে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক তাদের সচেতন করার লক্ষ্যে সমাজের নানা খারাপ দিকগুলো কেনো খারাপ, তা নিয়েও দিক-নির্দেশনা দেয়ার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

৬৩. *দৈনিক প্রথম আলো*, তারিখ ০৬.০১.২০১৩।

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৯ সংখ্যা : ৩৫
জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১৩

বাংলাদেশে ইসলামী বীমার সমস্যা ও সম্ভাবনা : প্রেক্ষিত বীমা আইন-২০১০

মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন*

[**সারসংক্ষেপ :** *বিপদ-আপদ ও ঝুঁকি মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ বিপদ-আপদ ও ঝুঁকির মাধ্যমেই মহান আল্লাহ মানুষদের পরীক্ষা করেন। পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য যেমন আবশ্যক আল্লাহর উপর ভরসা করা ঠিক তেমনি আবশ্যক প্রয়োজনীয় পূর্বপ্রস্তুতী গ্রহণ। ইসলাম এমনই এক জীবনব্যবস্থা দিয়েছে যেখানে সুষম ও সুষ্ঠু অর্থনৈতিক বন্টনব্যবস্থা রয়েছে। তাই জীবনের অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য ইসলাম যাকাত সদকাহসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। এবং এমন কিছু মূলনীতি প্রদান করেছে, যার ওপর ভিত্তি করে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা উত্তরণের পথ ও পদ্ধতি নির্ধারণ করা যায়। তেমনই একটি পদ্ধতি হচ্ছে বীমা ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার উদ্ভবকাল থেকে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত সুদই ছিলো এর প্রধান ভিত্তি। কিন্তু কালক্রমে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আলোকে বিশ্লেষণ ও প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে ইসলামী বীমা ব্যবস্থা মুসলিম দেশসমূহে চালু হচ্ছে। অন্যতম বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসাবে বাংলাদেশেও ইসলামী বীমা ব্যবস্থা চালু হয়েছে। তবে এ দেশের অর্থব্যবস্থা কেন্দ্রীয়ভাবে পুঁজিবাদী ও সুদভিত্তিক হওয়ার কারণে এ ব্যবস্থাটি পদে পদে বহুমুখী বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। সম্প্রতি বাংলাদেশে সাধারণ বীমা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইটির বেশ কিছু ধারা-উপধারা ইসলামী বীমা ব্যবস্থার সাথে সাংঘর্ষিক। তাছাড়া বাংলাদেশে অন্যান্য কিছু ক্ষেত্রেও ইসলামী বীমা ব্যবস্থা বিভিন্ন সমস্যার মোকাবেলা করছে। তবে এতো সমস্যার পরও এখাতে কিছু সম্ভাবনাও রয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশে বীমা ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত আইনী ইতিহাস, বীমা আইন ২০১০-এর প্রেক্ষিতে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। সাথে সাথে বাংলাদেশে ইসলামী বীমার সম্ভাবনা সম্পর্কে কিছু সুপারিশসহ আলোচনা করা হয়েছে।*]

বাংলাদেশের বীমা ব্যবস্থার আইনী ভিত্তি অতীত ও বর্তমান

ইসলামী বীমা ব্যবস্থার উন্নতিতে যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল, সঠিক আইনী ব্যবস্থা, কিন্তু ব্রিটিশ শাসন আমল থেকে অদ্যাবধি এ দেশে কোন পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বীমা আইন প্রণীত হয়নি। সর্বপ্রথম ১৯৩২ সালে বৃটিশ সরকার উপমহাদেশে বীমা আইন প্রণয়ন করে।[১] পরবর্তীতে ১৯৩৮ সালে The Insurance Act 1938

---

* শিক্ষার্থী, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১. কাজী মো: মোরতুজা আলী, *ইসলামী জীবনবীমা : বর্তমান প্রেক্ষিত*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০৯, পৃ.৩৯

নামে একটি পূর্ণাঙ্গ বীমা আইন প্রণয়ন করে, যা ইন্ডিয়ান ইন্সুরেন্স এ্যাক্ট ১৯৩৮ নামে বৃটিশ পার্লামেন্টে পাশ হয়।[২] দেশবিভাগের পর Pakistan Insurance Act 1952 এবং Pakistan Insurance Act 1958 প্রণীত হয়েছিল, যা পরবর্তীতে The Bangladesh Insurance (Nationalization) order 1972.[3] President's order No. 161, 30th Dec. 1972 জারির মাধ্যমে বাতিল হয়।[৪] পরবর্তীতে Insurance Corporation Act 1973 প্রণীত হয়,[৫] এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ The Insurance (Amendment) Ordinance, 11 August 1984 প্রণয়ন করেন।[৬] বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ১৩ অক্টোবর ২০০৮ বীমা অধ্যাদেশ, ২০০৮[৭] ও বীমা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ ২০০৮[৮] প্রণীত হয়। সর্বশেষ ১৮ মার্চ ২০১০ (বীমা আইন-২০১০, ২০১০ সনের ১৩ নং আইন) প্রণীত হয়।[৯] বাস্তবিক অর্থে এসব আইনের ফলে ইসলামী বীমা ব্যবসা আইনী স্বীকৃতি লাভ করেছে কিন্তু 'ইসলামাইজেশন অব ইন্স্যুরেন্স'-এর কোন মূলনীতি এবং ইসলামী বীমা ব্যবস্থার রূপরেখা প্রচলিত বীমা আইনে নেই। ফলে আইনী দিকনির্দেশনা না থাকায় কেবল নাম পরিবর্তন করেই ইসলামী বীমা ব্যবসায় পরিচালিত হচ্ছে।

বীমা আইন ২০১০ অনুসারে ইসলামী বীমার সমস্যাগুলো হলো :

১. শরীয়া আইন বাস্তবায়নে বাধ্যবাধকতা না থাকা

বীমা আইন ২০১০ এ ইসলামী বীমার পরিচয় দেয়া হয়েছে, কিন্তু ইসলামী বীমার শরয়ী রূপরেখা অথবা শরীয়া আইন লঙ্ঘন করলে শাস্তির বিধান কী হবে, সে সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। এতদসম্পর্কিত আইনের ধারাগুলো হলো:

---

[২] এ জেড এম শামসুল আলম, *ইসলামী ইন্সুরেন্স (তাকাফুল)*, ঢাকা : মাম্মী প্রকাশনী, ২০০১, পৃ. ১২৫; এই আইনে পাঁচটি অধ্যায়ে মোট ১২৩টি ধারা রয়েছে। উক্ত আইনটি বেশ কয়টি সংশোধনীর মাধ্যমে বর্তমানেও প্রচলিত [বীমা অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৪৭ নং অধ্যাদেশ)

[৩] PRESIDENT'S ORDER NO. 95 OF 1972. এ আইনের ৪৪টি ধারা রয়েছে

[৪] M N Mihsra, *Principles and practive thoroughly Revised Edition 2003 and 2004 Magazine and reports*. outline "Insurance".

[৫] এ জেড এম শামসুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯।

[৬] এ জেড এম শামসুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০।

[৭] Insurance Act, 1938 (Act IV of 1938) বাতিলক্রমে কতিপয় সংশোধনীসহ তা পুনঃপ্রণয়ন ও সংহত করার উদ্দেশে প্রণীত বীমা অধ্যাদেশ ২০০৮।

[৮] বীমা শিল্প ব্যবসার তত্ত্বাবধান, বীমা পলিসি গ্রাহক ও পলিসির অধীনে উপকারভোগীদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং বীমা শিল্পের নিয়মতান্ত্রিক উন্নয়নের নিমিত্ত একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত অধ্যাদেশ।

[৯] যেহেতু, Insurance Act, 1938 (Act IV of 1938) রহিতপূর্বক তা পুনঃপ্রণয়ন ও সংহত করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হল। উক্ত আইনে ৭টি অধ্যায়ে মোট ১৬২টি ধারা রয়েছে।

'ইসলামী বীমা ব্যবসা' অর্থ: ইসলামী শরীয়া অনুযায়ী পরিচালিত বীমা ব্যবস্থা।[১০] *উপধারা : ৭ (১) এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে Insurance Act, 1938-এর অধীন নিবন্ধিত যেই সকল বীমাকারী ইসলামী বীমা ব্যবসা পরিচালনা করিত, সেই সকল বীমাকারী এবং ইসলামী বীমা ব্যবসা পরিচালনায় আগ্রহী যে কোন ব্যক্তি, এই আইনের অন্যান্য বিধান এবং কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনুমতি প্রাপ্তিসাপেক্ষে, যে কোন শ্রেণীর বা উপ-শ্রেণীর বীমা ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারিবে : তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি বা কোম্পানী একই সঙ্গে প্রচলিত নন লাইফ বীমা ব্যবসা এবং ইসলামী বীমা ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারিবে না। (২) এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে যে সকল বীমাকারী প্রচলিত নন লাইফ বীমা ব্যবসার সহিত একই সঙ্গে ইসলামী বীমা ব্যবসা পরিচালনা করিত, সেই সকল বীমাকারী এই আইন কার্যকর হইবার পর প্রচলিত বীমা ব্যবসা এবং ইসলামী বীমা ব্যবসা এর মধ্য হইতে যে কোন এক ধরনের বীমা ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারিবে : তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবার অনধিক ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে উক্তরূপ বীমাকারী কোন ধরনের বীমা ব্যবসা করিতে আগ্রহী তাহা লিখিতভাবে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে। (৩) উপ-ধারা (২) এর শর্তাংশের অধীন কোন বীমাকারী যে ধরনের বীমা ব্যবসা পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছে, কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে, সেই ধরনের বীমা ব্যবসা অব্যাহত রাখিতে পারিবে এবং উহা ব্যতীত অন্য ধরনের বীমা ব্যবসা অব্যাহত রাখিতে পারিবে না : তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত অন্য ধরনের বীমা ব্যবসার আওতায় ইতিপূর্বে ইস্যুকৃত বীমা পলিসিসমূহ দাবী পরিশোধ না হওয়া বা মেয়াদ অবসান না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।*[১১]

প্রকৃত অর্থে ইসলামী ব্যবস্থায় শরীয়াহ বাস্তবায়নের নীতিমালা ও শরীয়াহ আইন লঙ্ঘনের শাস্তির বিধান বর্ণনা না করায় ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলো যথাযথভাবে শরয়ী আইন পালন করছে না। আবার কতিপয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ও বীমা কোম্পানী 'ইসলাম' আর 'হালাল' শব্দ ব্যবহার করে সাধারণ মুসলিমদের প্রতারিত করছে যা বাংলাদেশে ইসলামী বীমার বিকাশে প্রতিবন্ধক। অথচ মালয়েশিয়াতে শরয়ী বিধানভঙ্গের শাস্তি নিম্নরূপ: "যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর এ মর্মে নিশ্চিত হন যে, এই কোম্পানীটি এমন কর্মকাণ্ডে জড়িত যা শরীয়া সমর্থিত নয়, তবে তিনি উক্ত কোম্পানীর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করতে আদেশ দিবেন।"[১২]

---

১০. *বীমা আইন-২০১০*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অধ্যায়-১ ধারা-২ উপধারা-৭।

১১. *বীমা আইন-২০১০*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়-২ ধারা-৭ উপধারা-১,২,৩।

১২. Mohd. Masum Billah, LEGAL CAPACITY TO CONTRACT OF TAKAFUL : An Islamic Jurisprudential Consideration; *International*

২. বীমা ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরে সুদের সংশ্রব থাকা

বীমা আইন ২০১০ অনুসারে বীমা ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্তরে সুদের সংশ্রব রয়েছে এবং মুনাফার হার নির্ধারণের আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই যা ইসলামী বীমা বিকাশে প্রতিবন্ধক।

ক. সুদমুক্ত জামানত ব্যবস্থার অভাব

বীমা আইন ২০১০ মোতাবেক যে কোন বীমাকারী নিবন্ধনের আবেদন করার সময়ে নির্দিষ্ট অংকের অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কোম্পানিকে উক্ত জমাকৃত অর্থের সুদও প্রদান করবে। এতদসম্পর্কিত আইনের ধারাগুলো হলো:

(১) কোন বীমাকারী এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে নিবন্ধিত হইয়া থাকিলে বা, এই আইনের অধীন নিবন্ধনের আবেদন করার সময়ে তফসিল-১ এ বিধৃত অংকের অর্থ নগদে বা জমার তারিখে বাজার দর অনুযায়ী প্রাক্কলিত মূল্যে, অনুমোদিত সিকিউরিটিজে বা আংশিক নগদে ও আংশিক অনুরূপ প্রাক্কলিত অনুমোদিত সিকিউরিটিজে বাংলাদেশ ব্যাংকে জামানত হিসাবে জমা করিবে এবং রাখিবে। (২)উপ-ধারা (১) এর অধীন জামানতের অর্থ বীমাকারীর অনুকূলে জমা রাখা হইবে এবং বীমাকারী বরাবরে উক্ত অর্থ ফেরত প্রদানযোগ্য হইলে নগদ অর্থের যে পরিমাণ অংশ বীমাকারীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করা হইয়াছে উক্ত অংশ ব্যতীত বাকী অংশ বীমাকারী প্রাপ্য হইবে এবং জমাকৃত সিকিউরিটিজের উপর অর্জিত সুদও বীমাকারী প্রাপ্য হইবে : তবে শর্ত থাকে যে, সিকিউরিটিজের উপর সুদ সংগ্রহ করিবার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময়ে সময়ে, ধার্যকৃত কমিশন কর্তনযোগ্য হইবে।[১৩] *"ন্যূনতম ৩০ (ত্রিশ) কোটি টাকা, যাহার ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ জনসাধারণ কর্তৃক প্রদানার্থে উন্মুক্ত থাকিবে" বাংলাদেশ ব্যাংকে জামানত হিসাবে জমা করিবে এবং জমাকৃত সিকিউরিটিজের উপর অর্জিত সুদ বীমাকারী প্রাপ্য হইবে।*[১৪]

খ. প্রিমিয়াম ও কমিশন হারে গৃহীত মুনাফার হার নির্ধারণের আইনী বিধি না থাকা

বীমা আইন ২০১০ অনুসারে বীমা কোম্পানিসমূহ তাদের গ্রাহকদের নিকট থেকে সুদসহ কী পরিমাণ প্রিমিয়াম ও কমিশন আদায় করবে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে; কিন্তু প্রিমিয়াম আদায়ে সম্ভাব্য মুনাফার ও কমিশন প্রদানে সুদের স্থলে মুনাফার হার নির্ধারণের কোন বিধি-বিধান রাখা হয়নি। এতদসম্পর্কিত বীমা আইনের ধারা হলো:

১৬. (৬) কর্তৃপক্ষ প্রিমিয়াম হারে ব্যবহৃত সর্বোচ্চ সুদ হার এবং কমিশন হার নির্ধারণ করিতে পারিবে।[১৫]

Journal of Islamic Financial Services, India : International Institution of Islamic Business and Finance, Vol-4, Number-1, April-June2002,(http://www.iiibf.org/journals/journal13/vol4no1art2.pdf)}

১৩. *বীমা আইন ২০১০*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়-২ ধারা-২৩ উপধারা-১,২

১৪. *বীমা আইন ২০১০*, প্রাগুক্ত, তফসিল-১ ধারা-১ (ক,খ)

১৫. *বীমা আইন ২০১০*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়-২ ধারা-১৬ উপধারা-৬

গ. এজেন্টকে পারিশ্রমিক প্রদানের ক্ষেত্রে মুনাফার হার নির্ধারণের আইনী বিধি না থাকা

বীমা আইন ২০১০ অনুসারে বীমা এজেন্ট এর পারিশ্রমিক প্রদানের ক্ষেত্রে শতকরা হার নির্ধারণ করা হয়েছে যা ইসলামী বীমার বিকাশে প্রতিবন্ধক। এতদসম্পর্কিত বীমা আইনের ধারা হলো:

(৩) কোন বীমা এজেন্টকে লাইফ ইন্স্যুরেন্স এর ক্ষেত্রে, তাহার সংগৃহীত কোন পলিসির বা পলিসিসমূহের ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত সীমার অধিক কমিশন বা অন্য কোন প্রকার পারিশ্রমিক পরিশোধ করা বা পরিশোধ করিবার উদ্দেশে কোন চুক্তি করা যাইবে না, যথা: (ক) প্রথম বৎসরের প্রিমিয়ামের শতকরা ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) ভাগ; (খ) দ্বিতীয় বৎসরের নবায়ন প্রিমিয়ামের শতকরা ১০ (দশ) ভাগ; এবং (গ) পরবর্তী বৎসরসমূহে নবায়ন প্রিমিয়ামের শতকরা ৫ (পাঁচ) ভাগ: তবে শর্ত থাকে যে, লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংক্রান্ত বীমাকারীগণ তাহাদের ব্যবসায়ের প্রথম ১০ (দশ) বৎসর তাহাদের বীমা এজেন্টকে তাহাদের মাধ্যমে সংগৃহীত পলিসির বা পলিসি সমূহের প্রথম বৎসরের প্রিমিয়ামের শতকরা ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) ভাগ, দ্বিতীয় বৎসরের নবায়ন প্রিমিয়ামের শতকরা ১২ (বার) ভাগ এবং পরবর্তী বৎসরসমূহে নবায়ন প্রিমিয়ামের শতকরা ৬ (ছয়) ভাগ কমিশন প্রদান করিতে পারিবে।[১৬]

ঘ. শতকরা হারের কম অর্থ বন্টন না করার বাধ্যবাধকতা

যদিও ইসলামী দৃষ্টিকোণে যেকোনো অংশীদারি ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে গ্রাহক ও মালিক লাভ-ক্ষতির অংশ গ্রহণে বাধ্য থাকে, বীমা আইন ২০১০ অনুসারে বীমাকারী (মালিক) গ্রাহককে উদ্বৃত্তের শতকরা হারের কম অর্থ প্রদান না করতে বলা হয়েছে; কিন্তু ক্ষতির ক্ষেত্রে বিনিময় হারের কথা উল্লেখ করা হয়নি, এর দ্বারা গ্রাহক কর্তৃক ক্ষতি বহনের বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এতদসম্পর্কিত আইনের ধারা হলো:

"বীমাকারীর সংঘস্মারক বা সংঘবিধি বা অন্য কোন দলিলে ব্যত্যয়ী যাহা কিছুই থাকুক না কেন লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা পরিচালনার কোন বীমাকারী বীমা পলিসি গ্রাহকদের সুবিধার্থে উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত অনুরূপ উদ্বৃত্তের শতকরা হারের কম অর্থ বন্টন করিবে না।[১৭]

উপর্যুক্ত ক, খ, গ ও ঘ পয়েন্টে নির্দেশিত ধারাগুলোতে সুদের সংশ্রব ফুটে ওঠেছে; অথচ সুদ ইসলামী বীমার সাথে সাংঘর্ষিক। কেননা এটা ইসলামী শরীয়ত অনুমোদিত নয়।"[১৮]

---

১৬. *বীমা আইন ২০১০*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়-২ ধারা-৫৮ উপধারা-৩

১৭. *বীমা আইন ২০১০*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়-২, ধারা নং-৮৩

১৮. সুদকে হারাম বলে মহান আল্লাহর বাণী- وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا 'আল্লাহ ব্যবসাকে করেছেন হালাল আর সুদকে করেছেন হারাম।' (আল কুরআন ২ : ২৭৫)।

৩. প্রতিবেদন ও সংক্ষিপ্তসার

বীমা আইন ২০১০ মোতাবেক যে কোনো বীমা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান তাঁর কোম্পানীর কার্যক্রম নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময়ান্তে প্রতিবেদন প্রদান করিবেন। এতদসম্পর্কিত আইনের ধারা হলো:

"লাইফ ইন্সুরেন্স ব্যবসা পরিচালনাকারী প্রত্যেক বীমাকারী বৎসরে অন্তত একবার প্রবিধানে নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহার দায়সমূহ মূল্যায়নসহ তৎকর্তৃক পরিচালিত লাইফ ইন্সুরেন্স ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা একজন একচ্যুয়ারী দ্বারা অনুসন্ধান করাবে এবং অনুসন্ধান কার্য সম্পর্কে প্রবিধানে নির্ধারিত ছক এবং পদ্ধতিতে একচ্যুয়ারী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদনের একটি সংক্ষিপ্তসার প্রণয়ন করাবে।"[১৯]

কিন্তু ইসলামী বীমার জন্য সমস্যার বিষয় হল: এই প্রতিবিধানের নির্ধারিত ছকে মুদারাবা, তাবাররু, যাকাত, সাদকাহ ইত্যাদি শরীয়তসম্মত শিরোনামে হিসাব দেখাবার সুযোগ নেই। ফলে বাধ্য হয়েই ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলোকে রীতি অনুযায়ী ছক পূরণ করতে হচ্ছে। অনেক সময় এই মুনাফাকে সুদের ছকে লিখায় গ্রাহক ও কোম্পানীর মাঝে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়।

৪. বীমা কোম্পানির পরিচালক হওয়ার ক্ষেত্রে শরীয়তবিরোধী আইনগত বাধ্যবাধকতা

বীমা আইন ২০১০ মোতাবেক বীমাকারীর কোন বীমা এজেন্ট অথবা এজেন্ট নিয়োগকারী কোম্পানির পরিচালক হতে পারবে না, অথবা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক থাকলে আরেকটি বীমা কোম্পানির পরিচালক হতে পারবে না যা ইসলামী বীমা আইনের জন্য একটি শরীয়তবিরোধী আইনগত বাধ্যবাধকতা। এতদসম্পর্কিত আইনের ধারাগুলো হলো:

(১) "লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংক্রান্ত বীমাকারীর কোন বীমা এজেন্ট এবং এজেন্ট নিয়োগকারী কোন লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংক্রান্ত বীমাকারীর পরিচালক হবার বা থাকবার যোগ্য হবেন না। (২) নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংক্রান্ত বীমাকারীর কোন বীমা এজেন্ট, জরিপকারী এবং বীমা ব্রোকার কোন নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংক্রান্ত বীমাকারীর পরিচালক হবার বা থাকিবার যোগ্য হবেন না। (৩) কোন বীমা এজেন্ট বা এজেন্ট নিয়োগকারী বা জরিপকারী অথবা বীমা ব্রোকার উপ-ধারা (১) এবং (২) এর বিধান লঙ্ঘন করলে তিনি পরিচালক থাকবেন না এবং এর অতিরিক্ত এজেন্ট বা বীমা ব্রোকার হিসাবে তার লাইসেন্স অথবা এজেন্ট নিয়োগকারী বা জরিপকারী হিসাবে তাহার সনদপত্র, যা প্রযোজ্য, বাতিল যোগ্য হবে।"[২০]

৭৫. "আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, কোন বীমাকারীর পরিচালক একই শ্রেণীর বীমা ব্যবসার জন্য নিবন্ধীকৃত অন্য কোন

---

১৯. *বীমা আইন ২০১০*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়-২, ধারা নং-৩০, উপধারা-১

২০. *বীমা আইন ২০১০*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়-২, ধারা নং-৭৪, উপধারা-১,২,৩

বীমাকারীর বা কোন ব্যাংক-কোম্পানীর বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হতে পারবে না।" ব্যাখ্যা– এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ব্যাংক-কোম্পানী বলতে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এ সংজ্ঞায়িত ব্যাংক কোম্পানী এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এ সংজ্ঞায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে।[২১]

কিন্তু ইসলামী দৃষ্টিকোণে সমস্ত সম্পদের প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহ, তবে বান্দা নিজ যোগ্যতাবলে যে কোনো কিছুর মালিক হতে পারবে।[২২]

৫. পলিসি বাজেয়াপ্তকরণ

বীমা আইন ২০১০ মোতাবেক বীমা গ্রাহক ২ (দুই) বৎসরের কম সময় বীমার প্রিমিয়াম (কিস্তি) জমা দেয় তবে বিশেষ কারণে তার বীমা পলিসি বাজেয়াপ্ত করা যাবে। এতদসম্পর্কিত আইনের ধারা হলো:

(১) *কোন পলিসি শুধুমাত্র বকেয়া প্রিমিয়াম (ওভারডিউ প্রিমিয়াম) প্রদান না করিবার কারণে বাজেয়াপ্ত হইবে না, যদি- (ক) পলিসি কমপক্ষে ২ (দুই) বৎসর যাবৎ বলবৎ থাকে; এবং (খ) পলিসির প্রত্যর্পণ মূল্য ওভারডিউ প্রিমিয়াম এবং পলিসির অধীন বা পলিসির জামানতে গৃহীত সকল ঋণের যোগফলের অধিক হয়।*[২৩]

প্রকৃত অর্থে পলিসি বাজেয়াপ্তকরণ ইসলামী শরীয়ার সাথে সাংঘর্ষিক এবং এটা শরয়ী আইনের আলোকে জুলুমের পর্যায়ে পড়ে। মহান আল্লাহর বাণী:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ গ্রাস করবে না।"[২৪]

৬. উত্তরাধিকার মনোনয়ন

ইসলামী বীমাকে মূলত আকি'লার বিধান দ্বারা কিয়াস করে বৈধতা দেয়া হয়, যার অর্থ মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ প্রাপ্ত হয়, যা কুরআনের মীরাসী আইন দ্বারা স্বীকৃত। অপরপক্ষে বীমা আইন ২০১০ মোতাবেক বীমা পলিসি গ্রাহক তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই নোমিনী (উত্তরাধিকার) মনোনয়ন করতে পারবেন। এতদসম্পর্কিত আইনের ধারা হলো:

---

[২১] *বীমা আইন ২০১০*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়-২, ধারা নং-৭৫

[২২] ইসলাম হালাল সম্পদ অর্জনে কারো উপর কোন প্রকার বাধা-নিষেধ আরোপ করে না; এক্ষেত্রে সকলে সমান এবং যে কেউ যে কোন ধরনের হালাল সম্পদ স্বাধীনভাবে অর্জন করতে পারবে। মহান আল্লাহ বলেন, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ "যখন সালাত শেষ হয়ে যায় তখন ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিযিক) অনুসন্ধান কর।" (আল-কুরআন, ৬২ : ১০) মহান আল্লাহ আরো বলেন, هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ "তিনিই তোমাদের যমীনকে কর্ষণযোগ্য করে দিয়েছেন, অতএব তোমরা তার দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড় এবং তার দেয়া আহার্য গ্রহণ কর।" (আল-কুরআন, ৬৭ : ১৫)

[২৩] *বীমা আইন ২০১০*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়-২ ধারা-৯২ উপধারা-১: (ক,খ)

[২৪] আল কুরআন ৪ : ২৯।

বীমা পলিসি গ্রাহক নিজ জীবনের উপর পলিসি গ্রহণকালে বা পলিসি মেয়াদ পূর্তি পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে যে কোন সময়, তাহার মৃত্যুতে পলিসি দ্বারা নিশ্চিত অর্থ গ্রহণের জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনীত করতে পারবেন।[২৫]

বাস্তবিক অর্থে এ আইন শরীয়তের মীরাসী আইনের সাথে সাংঘর্ষিক। মহান আল্লাহর বাণী–

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

"আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু কন্যাই হয় দু-এর অধিক তবে তাদের জন্য ঐ সম্পদের তিন ভাগের দুই ভাগ যা মৃত ব্যক্তি ত্যাগ করে এবং যদি একজনই হয় তবে তার জন্য ১/২ অংশ। যদি মৃতের পিতা-মাতার মধ্যে থেকে প্রত্যেকের জন্য ত্যাজ্য সম্পত্তির ১/৬। মৃতের পুত্র থাকে। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিস হয় তবে মাতা পাবে ১/৩ অংশ। অতঃপর মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে তবে তার মাতা পাবে ১/৬ অংশ অছিয়তের পর অথবা ঋণ পরিশোধের পর।"[২৬]

অন্যান্য ক্ষেত্রের কিছু সমস্যা

০১. ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়হীনতা

ইসলামী বীমার আরেকটি প্রকট সমস্যা হল ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতার অভাব, বিদেশী বীমা কোম্পানীসমূহের যেমন মালয়েশিয়া, সুদান, ইন্দোনেশিয়ার কৌশল গ্রহণে অনীহা, বহুমুখী বীমাপত্রের অভাব, গ্রাহক সেবার নিম্নমুখী মান, বিক্রয়োত্তর সেবা ইত্যাদি বিষয়ে বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যর্থতার কারণে ইসলামী বীমা ব্যবস্থা কাঙ্ক্ষিত সফলতার মুখ দেখছে না।

০২. দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবলের অভাব

ইসলামী বীমা হল ইসলামী অর্থনীতিতে এক নতুন আবিস্কার। তাই এ ব্যাপারে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত লোক ছাড়া কাজ চালালে হিতে বিপরীত হতে পারে। সুতরাং বীমা প্রতিনিধি, বীমা পরিচালকদের যেমনি প্রশিক্ষণের প্রয়োজন তেমনি মাঠ কর্মীদেরও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। অথচ এদেশে বীমা বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নেই।

---

২৫. *বীমা আইন-২০১০*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়-২ ধারা-৫৭ উপধারা-১।

২৬. আল কুরআন ৪ : ১১।

০৩. প্রচার-প্রচারণার অভাব

ইসলামী বীমা বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রচারণার অভাবে গ্রাহকদের মাঝে বীমা প্রশ্নে মতানৈক্য থাকায় ইসলামী বীমাশিল্প বাধার সম্মুখীন। তাই পর্যাপ্ত সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, দেয়াল লিখন, পোস্টার ইত্যাদির পাশাপাশি স্কুল, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপকভাবে ইসলামী বীমা পঠন-পাঠনের ব্যবস্থাকরণ জরুরী।

০৪. হালাল-হারাম প্রশ্নে মতানৈক্য

ইসলাম সম্পর্কে এদেশের মানুষের শ্রদ্ধামিশ্রিত আবেগ ও ভালোবাসার দরুণ হালাল জিনিসের প্রতি মানুষের যেমন রয়েছে আগ্রহ তেমনি হারাম জিনিসের প্রতি রয়েছে ঘৃণা। বীমা প্রশ্নে দেশের আলিম সমাজের হালাল-হারাম মতানৈক্য ইসলামী বীমা বিকাশে প্রতিবন্ধক। সুতরাং আলিম সমাজ একমত হয়ে বীমা ব্যবস্থাকে হালাল স্বীকৃতি দিয়ে তার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা জনসম্মুখে প্রচার করা জরুরী।

০৫. সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা

ইসলামী বীমার আরেকটি বড় সমস্যা হল দেশের অশিক্ষিত, দরিদ্র, ধর্মপ্রাণ, বিভিন্ন পেশার মানুষের বীমা সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। যেমন অনেকের ধারণা, "বীমা দ্বারা সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয়", অনেকের ধারণা, "বীমা ব্যবস্থা তো দরিদ্রদের শোষণের অভিনব কৌশল মাত্র"। আবার অনেকের ধারণা, "ইসলামী বীমা আর সাধারণ বীমা সবই সুদের আশ্রয়ে লালিত"। তাই ইসলামী বীমার সফলতার লক্ষ্যে জনসমাজের অজ্ঞতা দূর করা প্রয়োজন।

০৬. ইসলামী অর্থব্যবস্থা না থাকা

ইসলামী বীমা মূলত ইসলামী অর্থব্যবস্থার একটি অংশ, তাই পূর্ণাঙ্গ ইসলামী অর্থব্যবস্থা ছাড়া এটি পুরোপুরি সফল হতে পারে না। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সংকুচিত বিনিয়োগ ক্ষেত্র, সহায়ক ইসলামী প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা, ইসলামিক মানি মার্কেটের অভাব, ইসলামী মুদ্রাবাজার ও অর্থবাজারের অভাব ইসলামী বীমার বিকাশে অন্যতম প্রতিবন্ধক।

০৭. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা

ইসলামী বীমার আরেকটি সমস্যা হলো, সাধারণ মানুষের শরীয়ত সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকার দরুণ ও শিক্ষিত সমাজের ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গির দরুণ ইসলামী বীমা দ্বারা সমাজকল্যাণ সম্ভব তা বিশ্বাস না করা এবং বীমা ব্যবসাকে সম্মানজনক পেশা হিসেবে মেনে না নেয়া। অপরদিকে সর্বসাধারণের মাঝে ইসলামী বীমার ধারণাগত ও পদ্ধতিগত রূপরেখা সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারণে এনজিওগুলোর ইসলামবিরোধী ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছে ইসলামী বীমা শিল্প।

০৮. নতুন পণ্য না থাকা

বীমা ব্যবস্থাপনায় নতুন পণ্য তথা নতুন বীমা পলিসি না থাকা ইসলামী বীমা সম্প্রসারণের পথে বড় বাধা। এ প্রসঙ্গে বলা হয়, গতিশীল বীমা ব্যবসায় প্রত্যেকেই চায় কিছু নতুন পণ্য, কিন্তু আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের বীমা ব্যবসায় আকর্ষণীয় তেমন কোন নতুন পণ্য লক্ষ্য করা যায়নি।[২৭]

০৯. পুনঃবীমার ব্যবস্থা না থাকা

ইসলামী বীমা শিল্পের একটি অবহেলিত দিক হল পুনঃবীমা, কারণ বর্তমানে বিশ্বব্যাপী মাত্র দুটি ইসলামী বীমা কোম্পানী পুনবীমা প্রকল্প চালু করেছে।[২৮] বাংলাদেশে ইসলামী বীমা কোম্পানী সমূহ পুনবীমা প্রকল্প চালু না করায় এ দেশের মানুষ ইসলামী বীমা শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে না। অবশ্য বর্তমানে তাকাফুল ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স পুনবীমা প্রকল্প পরিচালনা করছে।

১০. সমস্যাসমূহ তালিকাভুক্তিকরণের ও সমাধানের উদ্যোগ না থাকা

বাংলাদেশে ইসলামী বীমার সমস্যার সর্বশেষ দিক হলো : সমস্যাসমূহ তালিকাভুক্তিকরণ ও সমাধানে ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলোর সদিচ্ছার অভাব। এ প্রসঙ্গে আতাউর রহমান বলেন, "বীমা বাজারে যারা উদ্যোক্তা, ব্যবস্থাপক, ভোক্তা এবং সংশ্লিষ্ট সবার স্বার্থে বীমার সমস্যাসমূহ সমাধানের পদ্ধতি নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য প্রথমে সমস্যাসমূহ চিহ্নিত, তালিকাভুক্ত ও শ্রেণী বিন্যাস করা প্রয়োজন। প্রাথমিকভাবে যে সব সমস্যা সর্বজনবিদিত সে সব সমস্যাকে সমাধান করা প্রয়োজন। এবং সমস্যা সমাধানে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা দরকার।"[২৯]

বাংলাদেশে ইসলামী বীমার সম্ভাবনা

বীমা আইনের সংশোধন

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে পরিপূর্ণ ইসলামী বীমা আইন প্রণয়ন সম্ভব না হলেও প্রচলিত বীমা আইনের সংশোধনের মাধ্যমে এদেশে ইসলামী বীমা সম্প্রসারণের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে বীমা আইন ২০১০-এর কতিপয় ধারায় সংশোধনী

---

[২৭] HHp://wik: answer. com/a/problem and prospect of insurance in Bangladesh.d-12.2.2012.

[২৮] Philip More, *Islamic Finance*, Dubai : Euromoney Publication, 1997, p. 59-65.

[২৯] আতাউর রহমান, *বীমা শিল্পে সমস্যা সমাধানের পথ ও পদ্ধতি : একটি বিশ্লেষণ*, দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ২৮ নভেম্বর, ২০১১।

আনা খুবই প্রয়োজন সেগুলো হলোঃ ধারা নং-৭ (বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন), ধারা নং-১৬.৬ (সুদমুক্ত ইসলামী বীমার মান অনুসারে সম্ভাব্য মুনাফার পরিমাণ নির্ধারণ করা যেতে পারে), ধারা নং-৫৮.৩ (শরীয়তসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ), ধারা নং-৭৪ (সকলের সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ), ধারা নং-৮৩ (লাভ-ক্ষতি সমহারে বণ্টনযোগ্য), তফসিল-১ ধারা নং-১,২,৩,৪,৫,৬ (শরীয়তসম্মত পরিমাণ নির্ধারণ)।

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা

এদেশের বীমা শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা মোতাবেক বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই আইনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন-২০১০ এর শুরুতে বলা হয়েছে :

বীমা শিল্প ব্যবসার তত্ত্বাবধান, বীমা পলিসি গ্রাহক ও পলিসির অধীনে উপকারভোগীদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং বীমা শিল্পের নিয়মতান্ত্রিক উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন। যেহেতু বীমা শিল্প ব্যবসার তত্ত্বাবধান, বীমা পলিসি গ্রাহক ও পলিসির অধীনে উপকারভোগীদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং বীমা শিল্পের নিয়মতান্ত্রিক উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হল।[৩০]

এর আগে বীমা অধিদপ্তর নামে একটি অধিদপ্তর অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল যা উক্ত আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এতদসম্পর্কিত আইনের ধারা হলোঃ

(১) এই আইনের অধীন কর্তৃপক্ষ গঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে- (ক) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বীমা অধিদপ্তর, অতঃপর "বিলুপ্ত অধিদপ্তর" বলে উল্লিখিত, বিলুপ্ত হবে[৩১]

বীমা আইন ২০১০ প্রবর্তিত হওয়ার ফলে ইসলামী বীমা ব্যবসা স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং এতদউদ্দেশ্যে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার একটি সফল রূপায়ণ। বর্তমানে ইসলামী বীমা রুল্‌স প্রণয়নের কাজ চলছে। মূলত এ সকল পদক্ষেপগুলো এদেশের ইসলামী বীমা শিল্প বিকাশের সম্ভাবনার দিক।

---

৩০. *বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন-২০১০*, ২০১০ সনের ১২ নং আইন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মার্চ-১৮, ২০১০ খ্রি. ।

৩১. *বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন-২০১০*, ২০১০ সনের ১২ নং আইন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মার্চ-১৮, ২০১০ খ্রি., ধারা-৩৪ উপধারা-১:ক।

দেশীয় ইসলামী বীমা কোম্পানীসমূহের ক্রমোন্নতি

বাংলাদেশে ছয়টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বীমা কোম্পানীর ক্রমোন্নতি এদেশে ইসলামী বীমার সম্ভাবনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিঃ ১৯৯৯ সালে ১৫০ মিলিয়ন টাকা নিয়ে যাত্রা শুরু করে ২০০৪ সালে যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১৩১ মিলিয়ন টাকায়, কিন্তু ২০০৮ সালে ৮১% উন্নতিতে যা দাঁড়ায় ২৩৮ মিলিয়ন টাকায়। ইসলামী কমার্সিয়াল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী ২০০০ সালে ৬০ মিলিয়ন টাকা নিয়ে যাত্রা শুরু করে ২০০৪ সালে যা দাঁড়ায় ৯৬ মিলিয়ন টাকায় পরবর্তীকালে ২০০৮ সালে ১১০% উন্নতিতে যা দাঁড়ায় ২০১ মিলিয়ন টাকায়। ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স ২০০০ সালে ২৮১ মিলিয়ন টাকা নিয়ে যাত্রা শুরু করে ২০০৪ সালে যা দাঁড়ায় ১০৯১ মিলিয়ন টাকায়, ২০০৮ সালে ৪৯২% উন্নতিতে যা দাঁড়ায় ৬৪৫১ মিলিয়ন টাকায়। প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স ২০০০ সালে ১৫৮ মিলিয়ন টাকা নিয়ে যাত্রা শুরু করে ২০০৪ সালে যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১৩৭ মিলিয়ন টাকায়, কিন্তু ২০০৮ সালে ১০৪৬% উন্নতিতে যা দাঁড়ায় ১৫৬৮ মিলিয়ন টাকায়। পদ্মা ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স ২০০০ সালে ৭৫ মিলিয়ন টাকা নিয়ে যাত্রা শুরু করে ২০০৪ সালে যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১৩১ মিলিয়ন টাকায়, কিন্তু ২০০৮ সালে ৫৬২% উন্নতিতে যা দাঁড়ায় ৮৬৮ মিলিয়ন টাকায়। তাকাফুল ইসলামী ইন্স্যুরেন্স ২০০১ সালে ১৭৩ মিলিয়ন টাকা নিয়ে যাত্রা শুরু করে ২০০৪ সালে যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১১৮ মিলিয়ন টাকায়, কিন্তু ২০০৮ সালে ১৮৮% উন্নতিতে যা দাঁড়ায় ৩৪২ মিলিয়ন টাকায়। ২০০৪ সালে ছয়টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বীমার প্রিমিয়াম আয় ছিল ১৩৭৭ মিলিয়ন টাকা, যা ২০০৮ সালে ৩১৪% উন্নতিতে দাঁড়ায় ৫৭০৩ মিলিয়ন টাকায়।[৩২]

বিশ্বব্যাপী ইসলামী বীমার বিস্তৃতি ও প্রসারের প্রভাব

১৯৭৯ সালে সুদানে প্রথম ইসলামী বীমা কোম্পানী চালু হবার পর বিগত তিন দশক যাবৎ পৃথিবীর প্রায় পঁচিশটি দেশে ৭০টির অধিক ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে।[৩৩] আফ্রিকার সুদানে ইসলামী বীমার প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক সূত্রপাত হলেও বর্তমানে এশিয়া মহাদেশে ইসলামী বীমার ব্যাপক বিস্তৃতি ও প্রসার ঘটেছে। বাংলাদেশ পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসাবে ইসলামী বীমার প্রচার, প্রসার ও ব্যাপকতার সম্ভাবনা এদেশে অনেক বেশী।[৩৪]

---

৩২. Kazi Mohd Mortuza Ali, *Takaful in Bangladesh : Achievements and obstacles.* www. meinsurancereview.com, December-2010.

৩৩. Mohd Tarmidzi bin Ahmad Nordin, *Reflections on Three Decades of Takaful Provision*, London : International Takaful Summit 2010, 14th July 2010, mohdtarmidzi@gmail.com, p.04.

৩৪. কাজী মোঃ মোরতুজা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১।

বীমা কোম্পানীর জনশক্তির প্রশিক্ষণ

দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল বীমা ব্যবস্থার সফলতার অন্যতম পূর্বশর্ত। ইতোমধ্যে বেশকিছু বীমা কোম্পানী তাদের জনশক্তিকে ইসলামী বীমার উপর নানামুখী প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এমনকি বেশ কিছু কোম্পানী জনশক্তি নিয়োগের ক্ষেত্রে শরী'য়া আইন সম্পর্কে দক্ষ লোকদের নিয়োগ দিচ্ছে। ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিঃ এর শরীয় কাউন্সিলের বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১০ এ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নিকট শরীয়াহ কাউন্সিল এর অন্যতম পরামর্শ হল: "অত্র কোম্পানীর সকল স্তরের জনশক্তিকে ইসলামী বীমা সম্পর্কে জ্ঞান দান এবং শরীয়া বিষয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলা।"[৩৫]

ইসলামী ব্যাংকের সফলতাকে মডেল হিসেবে গ্রহণ

বর্তমান বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি দ্রুতঅগ্রসরমান। সমগ্র পৃথিবীতে ৪০ টিরও অধিক মুসলিম রাষ্ট্রে এবং ১৫ টি অমুসলিম দেশে ইসলামী ব্যাংক কাজ করে যাচ্ছে।[৩৬] এমনকি বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের প্রায় ২০০টি শাখার মাধ্যমে সারা দেশে প্রায় দশ লক্ষাধিক গ্রাহকের সেবায় নিয়োজিত। ইসলামী বীমা ইসলামী ব্যাংকের এই সফলতাকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করে কাজ করতে পারে।[৩৭]

ইসলামী শরীয়তসম্মত প্রোডাক্ট উদ্ভাবন

বাংলাদেশের ৯০% মুসলিমের হৃদয়ে শরীয়ত সম্পর্কে যে শ্রদ্ধা রয়েছে তাকে পুঁজি হিসেবে নিয়ে শরীয়তসম্মত বিভিন্ন প্রোডাক্ট উদ্ভাবন করলে ইসলামী বীমার সফলতার সম্ভাবনা ব্যাপক হবে। বর্তমানে প্রচলিত কতিপয় বীমা পলিসি হলঃ ১. ইসলামী মোহরানা বীমা, ২. ইসলামী মেয়াদী সঞ্চয় বীমা, ৩. ইসলামী তিন কিস্তি বীমা, ৪. ইসলামী পাঁচ কিস্তি বীমা, ৫. ইসলামী হজ্জ বীমা[৩৮] এ সকল চলমান পলিসিসমূহ ব্যতীত নতুন নতুন শরীয়তসম্মত বীমা পলিসি উদ্ভাবনের মাধ্যমে ইসলামী বীমা সম্প্রসারণের পথে রয়েছে ব্যাপক সম্ভাবনা।

---

৩৫. *Annual Report 2010 : Islami Insurance Bangladesh Limited*, Dhaka : 6th july, 2011, p.12.

৩৬. Omar Fisher and Dawood Taylor, *Prospects for Evolution of Takaful in the 1st qntury*, U.SA : Havard University. Aprl-2000.

৩৭. কাজী মো : মোরতূজা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২।

৩৮. *ইসলামী জীবন বীমা (তাকাফুল) প্রকল্প*, ঢাকা : সন্ধানী লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিঃ, জানুয়ারি ২০১১ খ্রি., পৃ.৮

প্রিমিয়াম ব্যয় কম হওয়া

বাংলাদেশে ইসলামী বীমার অমিত সম্ভাবনার আরেকটি দিক হল: প্রতিবেশী দেশসমূহ যেমন ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকার তুলনায় আমাদের প্রিমিয়াম ব্যয় কম। ভারতে জনপ্রতি বার্ষিক জীবনবীমার প্রিমিয়াম ব্যয় ছয় ডলারের বেশী কিন্তু বাংলাদেশে তা এক ডলারের কম।[৩৯]

সাধারণ বীমা কোম্পানীসমূহের তাকাফুল প্রকল্প চালুকরণ

ইতোমধ্যে বাংলাদেশে প্রচলিত অনেকগুলো সাধারণ বীমা কোম্পানী তাকাফুল প্রকল্প চালু করেছে। যেমন হোমল্যান্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স ও সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্স। বর্তমানে প্রায় ১৪টি সনাতন জীবন বীমা কোম্পানী এক থেকে চার/পাঁচটি ইসলামী বীমার প্রকল্প চালু করেছে এবং ৬০টির অধিক প্রস্তাবিত জীবনবীমা কোম্পানী ইসলামী বীমা কোম্পানী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার জন্য ইতোমধ্যে বীমা অধিদপ্তরে আবেদন করেছে যা বাংলাদেশে ইসলামী বীমার বিকাশে অপার সম্ভাবনার দিক।[৪০]

ডি-৮ ভুক্ত দেশ হওয়ায় মালয়েশিয়ার তাকাফুলের মডেল অনুসরণ

বাংলাদেশ ডি-৮ এর অন্যতম দেশ হওয়ায় মালয়েশিয়ার তাকাফুল ব্যবস্থাপনাকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মডেল হিসেবে গ্রহণ করলে ইসলামী বীমা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। ডি-৮ ভুক্ত দেশসমূহের মাঝে সেমিনার, ট্রেনিং ইত্যাদিতে বাংলাদেশের অংশগ্রহণে এদেশের বীমা পরিচালক ও কর্মীদের দক্ষ করে তুলবে। উদাহরণ স্বরূপ-ঢাকা ডিক্লারেশন এর ২৯ নং ঘোষণা উল্লেখ করা যেতে পারে।[৪১]

---

৩৯. কাজী মোঃ মোরতুজা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫।

৪০. কাজী মোঃ মোরতুজা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৬ ।

৪১. 29. We endorsed the proposal to enhance the capacity of an existing re-takaful company to meet the needs of the D-8 member countries. In this connection, we welcomed the Malaysia's offer to convene a workshop in June this year in Kuala Lumpur to draw up the modus operandi and to formulate appropriate strategies to promote takaful and re-takaful. In respect of training, we further welcomed the Malaysia's offer to conduct courses in conventional insurance and takaful as well as to conduct training programmes, seminar and attachment programmes in Islamic banking and finance, to enhance cooperation amongst the member countries. *Dhaka Declaration 1999,*Dhaka : 1-2 March 1999.

ক্ষুদ্র বীমার সফলতা অনুসরণ

১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ডেল্টা লাইফ ইন্সুরেন্স এদেশে সর্বপ্রথম দু'টি ক্ষুদ্রবীমার প্রচলন করে (১. গ্রামীণবীমা, ২. জনবীমা) এবং ব্যাপক সফলতা অর্জন করে।[৪২] ইন্সুরেন্স এ্যাক্ট ১৯৩৮ এবং রুলস ১৯৫৮ এর অধীনে কোম্পানীটি সাধারণ জীবন বীমা, গণবীমা এবং গ্রামীণ বীমা ব্যবসায়ে নিয়োজিত। এটি ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গ্রামীণ বীমা এবং ১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে গণবীমা চালু করে। ২০০০ সালে গ্রামীণ বীমা খাতে ২,৪৬,৪৭০টি পলিসির বিপরীতে মোট ১৮৮.৬০ মিলিয়ন টাকা প্রিমিয়াম সংগ্রহ করে। অপরদিকে গণবীমা খাতে ৩,৮৫,১১৪টি পলিসির বিপরীতে ঝুঁকি অবলিখন করে মোট ৪,৭১৯.৮৯ মিলিয়ন টাকা। বর্তমানে (৩১ই ডিসেম্বর ২০০০ পর্যন্ত) কোম্পানীটির পঞ্চান্নটি গণবীমার ও পঁচিশটি গ্রামীণবীমার কার্যালয় রয়েছে।[৪৩] মেঘনা লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিঃ ১৯৯৮ সালে পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের লোকদের বীমাসেবার আওতায় আনার লক্ষ্যে লোক বীমা প্রকল্প চালু করে এবং উক্ত প্রকল্পের অধীনে ঐ বছর ২২,০৮৩টি পলিসির বিপরীতে ২৬৫ মিলিয়ন টাকার বীমা করে, যা ১৯৯৯ সালে হয় ৩৮,৯১৪টি পলিসির বিপরীতে ৪৫৫.২০ মিলিয়ন টাকা।[৪৪] বর্তমানে অনেকগুলো সাধারণ বীমা কোম্পানী ক্ষুদ্রবীমা প্রকল্প চালু করেছে। সুতরাং ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলো ক্ষুদ্রবীমা প্রকল্প চালু করলে সফলতার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

সরকারি ব্যবস্থাপনাধীন জীবন বীমা ও সাধারণ বীমার ব্যর্থতা

বাংলাদেশে ইসলামী বীমা বিকাশের সম্ভাবনার আরেকটি দিক হলো সরকারী ব্যবস্থাপনাধীন জীবন বীমা ও সাধারণ বীমার ব্যর্থতা। ফলে সাধারণ মানুষ এখন প্রাইভেট কোম্পানীগুলোর উপর আস্থাশীল হয়েছে। ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলো যদি সরকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতার দিকগুলো সমাধান করে পর্যাপ্ত সেবা প্রদান করতে পারে তাহলে ইসলামী বীমার বিকাশ সম্ভব হবে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়- বীমাগ্রহিতাগণের জীবন বীমা কর্পোরেশন ও সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর প্রতি অসন্তোষ এবং দুর্বল ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমান্বয়ে মার্কেট হারাচ্ছে। সুতরাং প্রাইভেট কোম্পানীগুলো সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তাদের অবস্থার উন্নতি করতে পারবে।[৪৫]

---

৪২. http://deltalife.org/about.html.

৪৩. http://deltalife.org/about.html.

৪৪. http://meghnalife.com.bd/about_us.htm.

৪৫. HHp://wik: answer. com/a/problem and prospect of insurance in Bangladesh.d-12.2.2012.

উপসংহার

বর্তমান বিশ্বে ইসলামী বীমার ক্রম সম্প্রসারণ ঘটছে। তারই সাথে সাথে বাংলাদেশেও ইসলামী বীমার অগ্রগতি ঘটছে। এখন প্রয়োজন দলমত নির্বিশেষে বীমা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া। বাংলাদেশের প্রায় ১৫ কোটি মুসলমানের হৃদয় জয় করেই সম্ভব ইসলামী বীমার সম্প্রসারণ। এ জন্য প্রয়োজন বীমা ব্যবস্থাপনায় পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামী শরীয়া অনুসরণ, বীমা কর্মীদের নৈতিক মান উন্নয়ন, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় ন্যায়-নীতি গ্রহণ। বীমা গ্রাহকদের শরীয়তের জ্ঞান প্রদান। সর্বোপরি প্রয়োজন দেশের আলিম সমাজের বীমা প্রসঙ্গে বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে ইসলামী অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়নে প্রচার-প্রচারণায় অংশগ্রহণ। প্রকৃত অর্থে পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রব্যবস্থা না থাকলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলামী অর্থনীতি, ব্যাংক, বীমা বাধার সম্মুখীন হবে। তাই এ সকল সমস্যা ক্রমান্বয়ে সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করলে এমন এক সময় আসবে যেদিন বাংলাদেশ বীমা ক্ষেত্রে অন্যান্য মুসলিম দেশের মডেল হতে পারবে।

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার নিয়মাবলি

(১) ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত রেজি: নং (DA-6000) বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর একটি ত্রৈমাসিক একাডেমিক রিসার্চ জার্নাল। এটি প্রতি তিন মাস অন্তর, (জানুয়ারী-মার্চ, এপ্রিল-জুন, জুলাই-সেপ্টেম্বর, অক্টোবর-ডিসেম্বর) নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

(২) এ জার্নালে ইসলামের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইনতত্ত্ব, বিচারব্যবস্থা, ব্যাংক, বীমা, শেয়ার ব্যবসা, আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্য, ফিকহশাস্ত্র, ইসলামী আইন, মুসলিম শাসকদের বিচারব্যবস্থা, মুসলিম সমাজ ও বিশ্বের সমসাময়িক সমস্যা ও এর ইসলামী সমাধান এবং তুলনামূলক আইনী ও ফিকহী পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধ স্থান পায়।

(৩) জমাকৃত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য দু'জন বিশেষজ্ঞ দ্বারা রিভিউ করানো হয়। রিভিউ রিপোর্ট এবং সম্পাদনা পরিষদের মতামতের ভিত্তিতে তা প্রকাশের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।

(৪) জার্নালে সর্বোচ্চ ১৫০০ শব্দে গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টারি গ্রন্থ পর্যালোচনা প্রকাশ করা হয়। এ ক্ষেত্রে ইসলামী আইন ও বিচার বিষয়ক গ্রন্থ অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

লেখকদের প্রতি নির্দেশনা

১. প্রবন্ধ নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে সব বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়

ক. ইসলামী আইন ও বিচার সম্পর্কে জনমনে আগ্রহ/চাহিদা সৃষ্টি করা ও গণসচেতনতা তৈরি করা;

খ. ইসলামী আইন ও বিচার সম্পর্কে পুঞ্জিভূত বিভ্রান্তি দূর করা;

গ. মুসলিম শাসনামলের ইসলামী আইন ও বিচারের প্রায়োগিক চিত্র তুলে ধরা।

২. প্রবন্ধ জমাদান প্রক্রিয়া

পাণ্ডুলিপি অবশ্যই লেখকের মৌলিক গবেষণা (Original Research) হতে হবে। প্রবন্ধ 'ইসলামী আইন ও বিচার'-এ জমা দেয়ার পূর্বে কোথাও কোনো আকারে বা ভাষায় প্রকাশিত বা একই সময়ে অন্যত্র প্রকাশের জন্য বিবেচনাধীন হতে পারবে না। এ শর্ত নিশ্চিত করার জন্যে প্রবন্ধের সাথে লেখককে/দের এ মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে যে,

(ক) জমাদানকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি/তারা;

(খ) প্রবন্ধটি ইতঃপূর্বে অন্য কোথাও কোনো আকারে বা ভাষায় মুদ্রিত/প্রকাশিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য অন্য কোথাও জমা দেয়া হয় নি;

(গ) এ জার্নালে প্রবন্ধটি প্রকাশ হওয়ার পর সম্পাদকের মতামত ব্যতীত অন্যত্র প্রকাশের জন্য জমা দেয়া হবে না;

(ঘ) প্রবন্ধে প্রকাশিত/বিবৃত তথ্য ও তত্ত্বের সকল দায়-দায়িত্ব লেখক/গবেষকগণ বহন করবেন। প্রতিষ্ঠান এবং জার্নালের সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ এর কোনো প্রকার দায়-দায়িত্ব বহন করবে না।

৪. প্রেরিত প্রবন্ধের প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় যা থাকতে হবে

লেখকের পূর্ণ নাম, প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি, ফোন/মোবাইল নাম্বার, ই-মেইল ও ডাক ঠিকানা।

৫. সারসংক্ষেপ

প্রবন্ধের শুরুতে ২০০-২৫০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ (Abstract) থাকতে হবে। এ সারসংক্ষেপে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, প্রবন্ধে ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণান্তে প্রাপ্ত ফল সম্পর্কে ধারণা থাকবে।

৬. পাণ্ডুলিপি তৈরি

(ক) প্রবন্ধের শব্দসংখ্যা সর্বনিম্ন ৩০০০ (তিন হাজার) এবং সর্বোচ্চ ৫০০০ (পাঁচ হাজার) হতে হবে।

(খ) পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার কম্পোজ করে দুই কপি (হার্ড কপি) পত্রিকা অফিসে জমা দিতে হবে এবং প্রবন্ধের সফট কপি সেন্টার-এর ই-মেইল (e-mail) ঠিকানায় (islamiclaw_bd@yahoo.com) পাঠাতে হবে।

(গ) কম্পিউটার কম্পোজ করার জন্য বাংলা বিজয় কিবোর্ড ব্যবহার করে (Microsoft Windows XP, Microsoft office 2000, এবং MS-word- SutonnyMJ ফন্ট ব্যবহার করে ১৩ পয়েন্টে (ফন্ট সাইজ) পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে হবে। লাইন ও প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে ডবল স্পেস হবে।

(ঘ) A4 সাইজ কাগজে প্রতি পৃষ্ঠায় উপরে ২ ইঞ্চি, নিচে ২ ইঞ্চি, ডানে ১.৫ ইঞ্চি, বামে ১.৬ ইঞ্চি মার্জিন রাখতে হবে।

(ঙ) প্রবন্ধে ব্যবহৃত ইংরেজি উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে Times New Roman ফন্ট এবং আরবী উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে Simplified Arabic/Traditional Arabic ফন্ট ব্যবহার করতে হবে।

(চ) প্রবন্ধে ব্যবহৃত সকল তথ্যের পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক সূত্র (Primary Source) উল্লেখ করতে হবে।

(ছ) আল-কুরআন এর TEXT অনুবাদসহ মূল প্রবন্ধে এবং হাদীসের আরবী TEXT প্রতি পৃষ্ঠার নিচে ফুটনোটে এবং অনুবাদ মূল লেখার সাথে দিতে হবে।

(জ) কুরআন ও হাদীসের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত অনুবাদ অনুসরণ করে চলিত রীতিতে রূপান্তর করতে হবে।

(ঝ) উদ্ধৃতি উল্লেখের ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থের (আরবী, উর্দু, ইংরেজি যে ভাষায় হোক তা অপরিবর্তিত রেখে) TEXT দিতে হবে। মাধ্যমিক সূত্র (Secondary Source) বর্জনীয়। কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতিতে অবশ্যই হরকত দিতে হবে।

(ঞ) প্রবন্ধ বাংলা একাডেমী প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসরণে রচিত হতে হবে, তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

(ট) উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না, তবে লেখক কোনো বিশেষ বানান বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেষ্ট হলে তা অক্ষুণ্ন রাখা হবে।

(ঠ) তথ্যনির্দেশ ও টীকার জন্য শব্দের উপর অধিলিপিতে (Superscipt) সংখ্যা (যেমন : আল-ফিকহ[১]) ব্যবহার করতে হবে। তথ্যসূত্র সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার নিচে উল্লেখ করতে হবে।

(ড) মূল পাঠের মধ্যে উদ্ধৃতি ৩০ শব্দের বেশি হলে পৃথক অনুচ্ছেদে তা উল্লেখ করতে হবে।

(ঢ) ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ দিতে হবে।

(ণ) হাদীস উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে রেফারেন্সে উদ্ধৃত হাদীসের সংক্ষিপ্ত তাহকীক, বিশেষ করে হাদীসটির শুদ্ধতা বা গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কিত মূল্যায়ন দিতে হবে। তাহকীক এর ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়মে সূত্র উল্লেখ করতে হবে।

(ত) প্রবন্ধে দলীল হিসাবে জাল/বানোয়াট হাদীস অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

তথ্যসূত্র যে ভাবে উল্লেখ করতে হবে

(১) **কুরআন থেকে :** আল-কুরআন, ২ : ১৫।

(২) **হাদীস থেকে :** লেখক/সংকলকের নাম, গ্রন্থের নাম (ইটালিক হবে), অধ্যায় (ابواب-كتاب) : ..., অনুচ্ছেদ (باب) : ..., প্রকাশ স্থান : প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, প্রকাশকাল, খ....., পৃ....., হাদীস নং-...।

যেমন : ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আস-সালাত, অনুচ্ছেদ : আস-সালাতু ফিল-খিফাফ, আল-কাহেরা : দারুত তাকওয়া, ২০০১, খ. ১, পৃ. ১০৩, হাদীস নং-৩৭৫।

(৩) **অন্যান্য গ্রন্থ থেকে :** লেখকের নাম, গ্রন্থের নাম (ইটালিক হবে), প্রকাশ স্থান: প্রকাশনা সংস্থা, প্রকাশকাল, সংস্করণ নং (যদি থাকে), খ...., পৃ....।

যেমন : মোহাম্মদ আলী মনসুর, *বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১০, পৃ. ২১।

(৪) **জার্নাল/প্রবন্ধ থেকে :** প্রবন্ধকারের নাম, প্রবন্ধের শিরোনাম, জার্নালের নাম (ইটালিক হবে), প্রকাশনা সংস্থা/প্রতিষ্ঠান, বর্ষ : ..., সংখ্যা :..., (প্রকাশ কাল), পৃ.... ।
যেমন : ড. আ ক ম আবদুল কাদের, মদীনা সনদ : বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান, *ইসলামী আইন ও বিচার*, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, বর্ষ : ৮, সংখ্যা : ৩১, জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০১২, পৃ. ১৩।

(৫) **দৈনিক পত্রিকা থেকে**
নিবন্ধ থেকে হলে : লেখকের নাম, নিবন্ধের শিরোনাম, পত্রিকার নাম (ইটালিক হবে), তারিখ ও সাল, পৃ.... ।
যেমন : মোহাম্মদ আবদুল গফুর, রিমান্ডে দৈহিক নির্যাতনের মাধ্যমে স্বীকারোক্তি আদায় প্রসঙ্গ, *দৈনিক ইনকিলাব*, ৬ জুন, ২০১৩, পৃ. ১১।
রিপোর্ট বা অন্য কোনো তথ্য হলে : পত্রিকার নাম, তারিখ ও সাল, পৃ.... ।
যেমন : দৈনিক ইনকিলাব, ৬ জুন, ২০১৩, পৃ. ৬।

(৬) **ইন্টারনেট থেকে :** ইন্টারনেট থেকে তথ্য গ্রহণ করা হলে বিস্তারিত তথ্যসূত্র উল্লেখপূর্বক গ্রহণের তারিখ ও সময় উল্লেখ করতে হবে।
যেমন www.ilrcbd.org/islami_ain_o_bechar_article.php

অন্যান্য জ্ঞাতব্য

(১) প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোনো পাণ্ডুলিপি ফেরত দেয়া হয় না।

(২) প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক/গণ জার্নালের ২ (দুই) কপি এবং প্রবন্ধের ৫ (পাঁচ) কপি অফপ্রিন্ট বিনামূল্যে পাবেন।

(৩) প্রকাশিত প্রবন্ধের ব্যাপারে কারো ভিন্নমত থাকলে এবং তা যুক্তিযুক্ত, প্রামাণ্য ও বস্তুনিষ্ঠ মনে করা হলে উক্ত সমালোচনা জার্নালে প্রকাশ করা হয়।

(৪) প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য প্রাথমিকভাবে গৃহিত হলে সম্পাদক ও রিভিউয়ারের নির্দেশনা অনুযায়ী লেখককে প্রবন্ধ সংশোধন করে পুনরায় জমা দিতে হবে, অন্যথায় তা প্রকাশ করা হবে না।

(৫) জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধের কপিরাইট সেন্টার সংরক্ষণ করবে। প্রবন্ধের লেখক তার প্রকাশিত প্রবন্ধ অন্য কোথাও প্রকাশ করতে চাইলে সম্পাদক-এর নিকট থেকে লিখিত অনুমতি নিতে হবে।

(৬) সম্পাদক/সম্পাদনা পরিষদ প্রবন্ধে যে কোন প্রকার পরিবর্তন, পরিমার্জন করার অধিকার রাখেন।

(৭) জার্নালে প্রকাশের জন্য কোনো প্রবন্ধ প্রেরণের পূর্বে লেখার নিয়ম অনুসরণ পূর্বক তা সাজাতে হবে। অন্যথায় তা বাছাই পর্বেই বাদ যাবে।

(৮) প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য লেখককে কোনো সম্মানী প্রদান করা হয় না।

REG. NO. DA-6100 :: ISLAMI AIN O BICHAR :: JULY - SEPTEMBER 2013